১ম খণ্ড

ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ



ভূমিকা : ড. রাগিব সারজানি
অনুবাদ : আবু মুসআব ওসমান

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে
নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হউন ~

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

ইসলামি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড)
প্রথম প্রকাশ : মুহাররম-১৪৪২/সেপ্টেম্বর-২০২০
গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল হাসান
গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স
৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০
মুদ্রণ : শাহরিয়ার প্রিন্টার্স, ৪/১ পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা
অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com - niyamahshop.com - wafilife.com
ISBN : 978-984-8012-60-4
Web: maktabatulhasan.com

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

মূল্য : ৩১০০/- টাকা মাত্র [৫ খণ্ড একত্রে]

Islami Itihash Sonkhipto Bissokssh (1st Part)
Published by : Maktabatul Hasan. Bangladesh
E-mail: rakib1203@gmail.com Facebook/maktabahasan

ইসলামি ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ

[ইসলামপূর্ব যুগ থেকে নিকট অতীত]

প্রথম খণ্ড

প্রাককথন
সিরাতুন নবী
খোলাফায়ে রাশিদিন

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

ভূমিকা
ড. রাগিব সারজানি

অনুবাদ
আবু মুসআব ওসমান

মাকতাবাতুল হাসান

ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে বইয়ের পিডিএফ পেতে
নিচের লিংকে ক্লিক করে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হউন ~

https://t.me/Islaminbangla2017/2668

* * *

ليس بإنسان ولا عالم من لا يعي التاريخ في صدره

ومن درى أخبار من قبله أضاف أعمارًا إلى عمره

ইতিহাস অধ্যয়নে, অতীত-জ্ঞানে ব্যক্তি হবে জ্ঞানী-গুণী
ক্ষণিকের এক জীবনে ধারণ হবে লক্ষ-নিযুত প্রাণের ধ্বনি।
ইতিহাস ছাড়াই যারা ফেলছে সাড়া জ্ঞানমহলে হঠাৎ শুনি
জ্ঞানী তারে বলবে কবে, অদ্যাবধি মানবখাতায় নাম ওঠেনি!

* * *

সতর্কীকরণ!

এ গ্রন্থ ইতিহাসের সাধারণ পাঠকের জন্য

প্রিয় পাঠক,

আপনি যদি হয়ে থাকেন ইতিহাস-গবেষক কিংবা ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণ জানতে আগ্রহী নিবিষ্ট একজন পাঠক, তাহলে এ গ্রন্থ আপনার জন্য নয়! আপনার চাহিদা পূরণে ইসলামি গ্রন্থজগতে বৃহৎ কলেবরের বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ রয়েছে।

আমাদের এই কর্মপ্রচেষ্টা কেবল সেসব পাঠকের জন্য, যারা নবীজির আবির্ভাবকাল হতে আমাদের যাপিত কাল পর্যন্ত পুরো সময়ের ইসলামি ইতিহাসের এমন সব ঘটনা সম্পর্কে সহজ ও সুসংক্ষিপ্ত ধারণা পেতে চান, যা প্রতিটি মুসলমানের জানা উচিত।

—— সংক্ষিপ্ত সূচি ——

প্রাককথন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব আরব

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব অবশিষ্ট বিশ্ব

প্রথম অধ্যায়

সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেন আরব উপদ্বীপে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব থেকে নবুওয়ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওয়ত থেকে হিজরত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিজরত থেকে ওফাত

দ্বিতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশিদিন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফত

সূ চি প ত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশকের কথা ২৩

ইতিহাস কী ও কেন..... ৩১

ড. রাগিব সারজানির ভূমিকা..... ৩৩

প্রাককথন

প্রথম পরিচ্ছেদ-৪৯

ইসলামপূর্ব আরব

ভৌগোলিক অবস্থান ৪৯

প্রাচীন কালে আরব..... ৫১

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরব ভূখণ্ড ৫২

ক. রাজনৈতিক পরিস্থিতি..... ৫২

খ. অর্থনৈতিক পরিস্থিতি..... ৫২

গ. সামাজিক পরিস্থিতি..... ৫৩

ঘ. ধর্মীয় পরিস্থিতি ৫৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-৫৭

ইসলামপূর্ব অবশিষ্ট বিশ্ব

সাসানি সাম্রাজ্য ৫৭

রোমান সাম্রাজ্য ৫৮

ভারতবর্ষ..... ৬০

ইহুদিসমাজ..... ৬০

প্রথম অধ্যায়

সিরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রথম পরিচ্ছেদ-৬৫

কেন আরব উপদ্বীপে!

১. স্বভাব স্বচ্ছতা, হৃদয় নির্মলতা..... ৬৫
২. সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, প্রবাদতুল্য বীরত্ব..... ৬৬
৩. মুক্ত চিন্তা, স্বাধীন চেতনা..... ৬৭
৪. অত্যুচ্চ বংশমর্যাদা, চারিত্রিক উদারতা..... ৬৮
৫. ভৌগোলিক অবস্থান, বাইতুল্লাহর উপস্থিতি..... ৬৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-৭১

আবির্ভাব থেকে নবুওয়ত

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশপরম্পরা ৭১
নবীজির শুভজন্ম..... ৭১
বক্ষবিদারণের ঘটনা ৭২
মাতৃবিয়োগ ও পিতামহের দায়িত্বগ্রহণ ৭৩
আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু ও পিতৃব্য আবু তালিবের দায়িত্বগ্রহণ ৭৩

নবুওয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা

নবীজির মেষচারণ..... ৭৩
বালক নবীর সঙ্গে পাদরি বাহিরার সাক্ষাৎ..... ৭৩
ফিজারের যুদ্ধ ৭৪
হিলফুল ফুজুল..... ৭৫
খাদিজার বাণিজ্য-ভার গ্রহণ এবং পাণিগ্রহণ ৭৫
কাবা পুনর্নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন..... ৭৬

বিষয় পৃষ্ঠা

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-৭৭
নবুওয়ত থেকে হিজরত

ওহি অবতরণ ৭৭
দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রবর্তীদের ইসলামগ্রহণ ৭৭
নির্যাতন-নিপীড়নের অধ্যায় ৭৯
হাবশায় প্রথম হিজরত ৮০
মুহাজিরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন ৮১
হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত ৮১
মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে মক্কার মুশরিকদের ষড়যন্ত্র ৮২
প্রথমে হামজা ও তারপর উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলামগ্রহণ ৮২
দ্রষ্টব্য : হজরত উমর রাযি.-কে 'আল-ফারুক' নামকরণের কারণ ৮৩
সমঝোতা ও দরকষাকষির পথে ৮৪
অবরোধ ও বয়কট ৮৪
শোকের বছর : আবু তালিব ও খাদিজা রাযি.-এর পরলোকগমন .. ৮৫
সাওদা বিনতে যামআ রাযি. ও আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ ৮৬
নবীজির তায়েফ গমন ৮৬
মিরাজের সফর ৮৮
ইয়াসরিববাসীর ইসলামগ্রহণের সূচনা ৯০
আকাবার প্রথম বায়আত ৯০
আকাবার দ্বিতীয় বায়আত ৯২
দ্রষ্টব্য : দ্বীনের পথে আনসারি সাহাবিগণের ত্যাগ ও নিষ্ঠা ৯২

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-৯৫

হিজরত থেকে ওফাত

মদিনায় হিজরত..... ৯৫
হিজরতের জন্য নবীজির সুদৃঢ় পরিকল্পনা..... ৯৭
নবীন ইসলামি রাষ্ট্রের বিনির্মাণে নবীজির কর্মধারা..... ৯৮
১. মসজিদ নির্মাণ..... ৯৮
২. মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্বস্থাপন..... ৯৯
৩. মুসলিম-ইহুদি মৈত্রীচুক্তি..... ৯৯

গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহের বিবরণ

জিহাদের অনুমতিদান..... ১০০
বদর যুদ্ধের পূর্বের অভিযানসমূহ..... ১০২
কিবলা পরিবর্তন এবং এর সূক্ষ্ম তাৎপর্য..... ১০৪

বদর যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট..... ১০৫
আবু সুফিয়ানের মক্কায় সংবাদ প্রেরণ..... ১০৫
বণিক-কাফেলার নিরাপদ প্রস্থান..... ১০৬
সাহাবিদের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ..... ১০৬
হুবাব ইবনুল মুনযির রাযি.-এর পরামর্শ..... ১০৮
উভয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও সেনাবিন্যাস..... ১০৯
সাদ বিন মুআযের প্রস্তাব..... ১১০
যুদ্ধপূর্ব রজনীতে..... ১১০
যুদ্ধের সূচনা ও মুশরিকদের পরাজয়..... ১১১
যুদ্ধবন্দি বিষয়ে সাহাবিদের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ..... ১১১
মুশরিকদের শবদেহ পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ..... ১১২
মদিনায় বিজয়-সংবাদ..... ১১২

বনু কায়নুকার যুদ্ধ

দ্বিতীয় হিজরির উল্লেখযোগ্য আরও কিছু ঘটনা..... ১১৪

উহুদ যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট..... ১১৬

যুদ্ধের সূচনা..... ১১৮

রণাঙ্গনের পট পরিবর্তন, নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তর..... ১১৯

হামরাউল আসাদের অভিযান..... ১২০

বনু নাযিরের বিরুদ্ধে অভিযান

অভিযানের প্রেক্ষাপট..... ১২১

গাযওয়ায়ে খন্দক

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট..... ১২৩

শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও নেতৃত্ব..... ১২৪

অটল-অবিচল মুসলিম বাহিনীর জন্য গায়বি সাহায্য..... ১২৬

দ্রষ্টব্য : একটি সুসংক্ষিপ্ত দোয়া..... ১২৭

শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে হুযায়ফা রাযি..... ১২৯

বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক অভিযান..... ১২৯

বিশ্বাসঘাতকদের বিষয়ে সাদ বিন মুআয রাযি.-এর ফয়সালা..... ১৩০

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিজওয়ান

নবীজির দরবারে কুরাইশ দূতদের আগমন..... ১৩২

মুসলমানদের দূত হিসেবে উসমান রাযি.-এর মক্কায় গমন..... ১৩৩

আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের শেষ ঘাঁটি খায়বার বিজয়

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট..... ১৩৫

মুতার যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট..... ১৩৭

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও সেনাপতি নির্বাচন..... ১৩৭

বিষয় পৃষ্ঠা

'মহাবিজয়' মক্কাবিজয়

মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপট ১৪০

কৃতকর্মের জন্য কুরাইশদের অনুতাপ..... ১৪১

দ্রষ্টব্য : বদরি সাহাবিগণের অত্যুচ্চ মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য..... ১৪১

হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান

অভিযানের প্রেক্ষাপট ১৪৪

তায়েফ অবরোধ ১৪৫

দ্রষ্টব্য : নবীজির আনসারপ্রীতি..... ১৪৭

তাবুক অভিযান

অভিযানের প্রেক্ষাপট ১৪৯

নবম হিজরিতে আবু বকর রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ সম্পাদন..... ১৫০

আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলামগ্রহণ ১৫১

বিদায় হজ ১৫২

নবীজির শেষ পদক্ষেপ

উসামা বিন যায়দ রাযি.-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ..... ১৫৩

নবীজির ইন্তেকাল, পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে গমন..... ১৫৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশিদিন

প্রথম পরিচ্ছেদ-১৬১

হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত

খলিফা হজরত আবু বকর রাযি.-এর বংশপরিচয় ১৬১

কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য..... ১৬২

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর নির্বাচন..... ১৬২

ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ফিতনা..... ১৬৬

উসামা রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ..... ১৬৬

আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে কুরআনের প্রথম সংকলন.... ১৭৫

ইসলামি বিজয়াভিযানের সূচনা

[এক] (পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত) ইরাক অঞ্চলে বিজয়াভিযান

পারস্য সাম্রাজ্য ও ইরাক পরিচিতি..... ১৭৯

বিজয়াভিযানের সূচনা ১৮৩

ইরাকে পরিচালিত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর অভিযানসমূহ

১. শিকলের যুদ্ধ..... ১৮৫

২. মাযারের যুদ্ধ..... ১৮৬

৩. ওয়ালাজার যুদ্ধ..... ১৮৭

৪. উল্লায়স (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধ ১৮৮

৫. হিরা বিজয়..... ১৯০

দ্রষ্টব্য : মুসলমানদের চারিত্রিক মহত্ত্ব, উদারতা ও সম্পদ-বিরাগ.. ১৯২

৬. আনবার বিজয় (চোখের যুদ্ধ) ১৯৩

বিষয় পৃষ্ঠা
৭. আইনুত তামারের অভিযান ১৯৪
৮. দুমাতুল জানদালের অভিযান ১৯৫
৯. হুসায়দের যুদ্ধ ১৯৭
১০. মুছাইয়াখের যুদ্ধ ১৯৭
১১. ফিরাযের যুদ্ধ ১৯৮
[দুই] (রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত) শাম অঞ্চলে বিজয়াভিযান
রোমান সাম্রাজ্য ও শাম পরিচিতি ২০০
বিজয়াভিযানের সূচনা ২০৫
দ্রষ্টব্য : সাহাবায়ে কেরামের সৈনিকসুলভ মনোভাব ২০৬
শামে প্রাথমিক অভিযান ২০৭
বুছরা বিজয় ২০৮
আজনাদাইনের যুদ্ধ ২০৯
ইয়াকুছা ও মারজুস সুফফার-এর যুদ্ধ ২১০
খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর ইন্তেকাল ২১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-২১৫
হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর বংশপরিচয় ২১৫
কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য ২১৫
হজরত উমর রাযি.-কে খলিফা নির্বাচন ২১৬
[এক] রোমান সাম্রাজ্যে চলমান বিজয়াভিযান
খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হতে অব্যাহতিদান ২১৯
ফিহল (বায়সান)-এর অভিযান ২২৪
দামেশক বিজয় ২২৯
ইয়ারমুকের যুদ্ধ ২৩২

বিষয় পৃষ্ঠা
দ্রষ্টব্য : সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি.-এর অপূর্ব মহৎ আচরণ ২৩৪
জনৈক রোমান সেনাপতির ইসলামগ্রহণ ২৩৭
ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীরত্ব ও ত্যাগের কিছু খণ্ডচিত্র..... ২৪১
দ্রষ্টব্য : রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয়ের মূল কার্যকারণ ২৪২
আজনাদাইন-বিজয়..... ২৪৩
আমর ইবনুল আস রাযি.-এর চতুরতা ও বিচক্ষণতা..... ২৪৫
ইলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) বিজয় ২৪৬
একটি ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র..... ২৪৯
জাযিরা অঞ্চল বিজয় ২৫১
মিশর-বিজয় ২৫৩
আলেকজান্দ্রিয়া-বিজয় ২৬৩
[দুই] পারস্য সাম্রাজ্যে চলমান বিজয়াভিযান
খলিফা কর্তৃক জনসাধারণকে পারস্য অভিযানে যোগ দিতে আহ্বান..... ২৭১
দ্রষ্টব্য : দ্বীনি খেদমতের অঙ্গনে পদ কখনোই মুখ্য নয় ২৭৩
নামারিকের যুদ্ধ ২৭৩
সেতুর যুদ্ধ : উহুদের পর মুসলমানদের প্রথম পরাজয়..... ২৭৩
উল্লায়সের খণ্ডযুদ্ধ : আহত সিংহের প্রতিশোধ..... ২৭৭
বুওয়াইবের যুদ্ধ ২৭৮
নতুন পরিকল্পনা..... ২৮২
কাদিসিয়া-অভিযান : ইসলামি ইতিহাসের এক নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ.. ২৮৪
মুসলমানদের মোকাবিলায় পারসিক সেনাপতি রুস্তমের শৈথিল্য ও অনাগ্রহ..... ২৮৭
রুস্তমের সামনে মুসলমানদের প্রথম প্রতিনিধি ২৯৩
কাদিসিয়ার যুদ্ধের প্রাত্যহিক বিবরণ..... ২৯৭
প্রথম দিন : আরমাছ দিবস..... ২৯৭

বিষয় পৃষ্ঠা

খানাসা রাযি.-এর আপন পুত্রদেরকে কৃত অসিয়ত ২৯৯
দ্বিতীয় দিন : আগওয়াছ দিবস ৩০০
শাম থেকে সহায়ক বাহিনীর আগমন ৩০০
তৃতীয় দিন : আম্মাস দিবস ৩০১
চতুর্থ দিন : কাদিসিয়া দিবস ৩০৩
একটি চমকপ্রদ ঘটনা ৩০৫
অশ্বপৃষ্ঠে দজলা পাড়ি! ৩০৬
জালুলা ও হুলওয়ান বিজয় ৩১০
রামাহুরমুয বিজয় ৩১২
সুসতারের যুদ্ধ ৩১৩
বান্দা, বলো—তোমার চাওয়া কী! ৩১৪
অনন্যসাধারণ বীরত্ব ৩১৫
এক ওয়াক্ত ফজর নামাজ! ৩১৮
দ্রষ্টব্য : মহত্ত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য ৩১৯
সেনাপতি সাদ রাযি.-এর বিরুদ্ধে কুফাবাসীর অভিযোগ ৩২১
কুফার গভর্নর-পদ হতে সাদ রাযি.-কে অব্যাহতিদান ৩২৩
নিহাবন্দের যুদ্ধ ৩২৩
আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন! ... ৩২৬
শেষ পারসিক সম্রাট ইয়াযদিগার্দের পতন : আল্লাহর জমিনে খোদাদ্রোহীদের চূড়ান্ত লাঞ্ছনাবরণ ৩২৯
খলিফা উমর রাযি.-এর স্মরণীয় দুটি ঘটনা ৩৩২
আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর উদ্দেশে উমর রাযি.-এর একটি পত্র ৩৩৫
খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর শাহাদাত ৩৩৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ-৩৪৫

হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত

তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর বংশপরিচয় ৩৪৫
উসমান রাযি.-এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য ৩৪৫
দায়িত্বগ্রহণের পর খলিফা উসমান রাযি.-এর প্রথম ভাষণ ৩৪৭
প্রথম ইসলামি নৌবহর প্রতিষ্ঠা ৩৪৯
সাইপ্রাস বিজয় ৩৫০
পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন ৩৫৩
ফিতনার প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ ৩৫৫
দ্রষ্টব্য : একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ৩৬৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ-৩৬৭

হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফত

চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি.-এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য ৩৬৭
খলিফা হিসেবে আলি রাযি.-এর দায়িত্বগ্রহণ ৩৬৯
ফিতনা ও ষড়যন্ত্র এবার নতুন রূপে ৩৭০
উটের যুদ্ধ ৩৭২
সিফফিনের যুদ্ধ ৩৭৩
সালিশ ও মধ্যস্থতা ৩৭৪
খারিজি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ ৩৭৬
দ্রষ্টব্য : সাহাবা-অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি ৩৭৯
সাহাবা অন্তর্বিরোধ বিষয়ে ইতিহাস অধ্যয়নের মূলনীতি ৩৮৫

মানচিত্র-সূচি

মানচিত্র নং-১
শাম অঞ্চলে অব্যাহত বিজয়াভিযান ২৪৪
মানচিত্র নং-২
মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ২৫৮
মানচিত্র নং-৩
কাদিসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র ২৮৬
মানচিত্র নং-৪
২২ হিজরি পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যে মুসলমানদের বিজয়াভিযান..... ৩২৮

দ্রষ্টব্য-সূচি

হজরত উমর রাযি.-কে 'আল-ফারুক' নামকরণের কারণ..... ৮৩
দ্বীনের পথে আনসারি সাহাবিগণের ত্যাগ ও নিষ্ঠা ৯২
একটি সুসংক্ষিপ্ত দোয়া ১২৭
বদরি সাহাবিগণের অত্যুচ্চ মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য..... ১৪১
নবীজির আনসারপ্রীতি..... ১৪৭
মুসলমানদের চারিত্রিক মহত্ত্ব, উদারতা ও সম্পদ-বিরাগ ১৯২
সাহাবায়ে কেরামের সৈনিকসুলভ মনোভাব ২০৬
সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি.-এর অপূর্ব মহৎ আচরণ ২৩৪
রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয়ের মূল কার্যকারণ..... ২৪২
দ্বীনি খেদমতের অঙ্গনে পদ কখনোই মুখ্য নয় ২৭৩
মহত্ত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য ৩১৯
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর ৩৬৪
সাহাবা-অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি..... ৩৭৯

প্রকাশকের কথা

সচেতন পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, ইতিহাস নিছক কিছু ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, নয় কেবল বিগত ঘটনাপ্রবাহের সংরক্ষণ; ইতিহাস হলো শিক্ষা ও উপদেশ এবং দীক্ষা ও পরিচর্যার এক চিরন্তন পাঠশালা। ইতিহাসের শিক্ষা ও উপদেশ শাশ্বত, সদা কার্যকর। ইতিহাস একদিকে যেমন একটি জাতির জাগরণ ও উত্তরণের সোপান, অন্যদিকে জাতিগত অবক্ষয় হতে নিষ্কৃতির অন্যতম হাতিয়ারও বটে। ইতিহাস হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়—কীভাবে একটি জাতি জেগে ওঠে কিংবা ঘুমিয়ে পড়ে; কীভাবে একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে ওঠে কিংবা ধসে পড়ে; কীভাবে একটি সভ্যতা নির্মিত হয় কিংবা ভেঙে পড়ে এবং কীভাবে একটি বিপ্লব পূর্ণতায় পৌঁছায় কিংবা মুখ থুবড়ে পড়ে।

বিশেষত ইসলামি ইতিহাস তো মানবজাতির জন্য এক অনন্য-অমূল্য উপহার। ইসলামি ইতিহাস কেবল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির কর্মবিবরণই নয়; বরং একদিকে সুন্নাতুল্লাহ ও ভূপৃষ্ঠে সদা কার্যকর খোদায়ি রীতির ভাবসম্প্রসারণ, অপরদিকে আগামীর প্রতিটি পদক্ষেপে সফলতা অর্জনের কার্যকারণ। ইসলামি ইতিহাস তাই কেবল মুসলিম উম্মাহর নয়; মানবজাতির প্রতিটি সদস্য ও সমাজের অনিবার্য প্রয়োজন।

পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। প্রতিটি জাতির কাছে এ উপলব্ধি আছে যে, ইতিহাস জাতিপরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন ভাষায় ইতিহাসের ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে, অতীত ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় জাদুঘর-মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রনায়ক থেকে শুরু করে সাধারণ জনগণ সকলেই ইতিহাসের প্রতি অনুরাগী হচ্ছে। দৈনন্দিন পাঠতালিকায় ইতিহাস উঠে আসছে শীর্ষ কাতারে। সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের তালিকায় ইতিহাসগ্রন্থ স্থান পাচ্ছে সবার ওপরে। ইতিহাস-অনুরাগ এখন বিভিন্ন জাতির জাতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু এটি মুদ্রার এক পিঠের গল্প। অপর পিঠের গল্প বড় হতাশাজনক। পশ্চিমা বিশ্বে যখন চলছে ইতিহাসের রেনেসাঁস ও নবজাগরণ, মুসলিম বিশ্বে তখন আয়েশ ও দিবানিদ্রার আয়োজন! ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাসের প্রতি আমাদের যাপিত সময়ের মুসলমানদের আচরণ মোটেও সুখকর নয়। আর এ কারণেই কেবল সাধারণ ইতিহাস নয়, ইসলামি ইতিহাস জানতেও আমাদের কড়া নাড়তে হয় অমুসলিম লেখকদের দ্বারে-দ্বারে!

আজ আমাদের ইতিহাস-বিমুখতাকে পুঁজি করেই শত্রুপক্ষ তাদের সবচেয়ে সফল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহ-বিরোধী অপপ্রচারকে। জ্ঞানপাপী শত্রুরা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে, ইসলাম ও ইসলামের নবীর ইতিহাস-জীবনেতিহাস বিকৃত করে তুলে ধরছে আর আমরা গোগ্রাসে তা-ই গিলছি! আমরা বিশ্বাস করছি—ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে তির-তরবারির জোরে! মুসলিম জাতি সন্ত্রাসী জাতি! আরও কত কী!

আজকের পৃথিবীতে মুসলিম উম্মাহর যে নিম্নগামিতা ও অধঃপতন, নিজেদের অতীত-বিস্মৃতি তার অন্যতম কারণ। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস একটি জাতির শেকড়ের ন্যায়; আর ইতিহাস-বিমুখতা তাই শেকড়চ্যুত হওয়ারই নামান্তর। বলতে দ্বিধা নেই, ইতিহাস-অধ্যয়নই পারে আমাদেরকে শেকড়ের সঙ্গে যুক্ত করতে এবং অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল ও সুমজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের নিশ্চয়তা দিতে। ইতিহাস-গ্রন্থ তাই হওয়া উচিত আমাদের দৈনন্দিন পাঠাভ্যাসের নিয়মিত অংশ।

অন্যদের কথা বাদই দিলাম, আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী, আমাদের পাঠ্যতালিকায়ও ইতিহাস ও ইসলামি ইতিহাস পরম আরাধ্য কোনো বিষয় নয়। বাঙালির পড়ার টেবিলে ইসলামি ইতিহাস এখনো সগৌরবে স্থান করে নিতে পারেনি। পাশাপাশি এটিও অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, পাঠকের চাহিদা পূরণ করার মতো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ এখনো বাংলাভাষায় হয়নি। এই অকপট স্বীকৃতি জাতি হিসেবে আমাদের জন্য কেবল পীড়াদায়কই নয়; আশঙ্কারও কারণ।

মূলত এই বাস্তবতাবোধেই **মাকতাবাতুল হাসান** প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ইসলামি ইতিহাসকে আপন কর্মতালিকার প্রথম স্থানে রেখেছে। **মাকতাবাতুল হাসান** অনেকটা স্রোতের বিপরীতে গিয়েই ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক বই প্রকাশ শুরু করে। আল্লাহর শোকর! সচেতন পাঠকমহল যেমন আমাদের এই পদক্ষেপকে সাদরে গ্রহণ করেছে, বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থ প্রকাশের ধারায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়েছে। আমরা প্রত্যাশা করি—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ধীরে ধীরে আমরা ইতিহাস-সচেতন জাতিতে পরিণত হব এবং এরই ধারাবাহিকতায় ...।

ইসলামি ইতিহাস নিয়ে **মাকতাবাতুল হাসান**-এর পরিকল্পনা অনেক সুদূরপ্রসারী। আমাদের প্রকাশ-পরিকল্পনার মধ্যে আছে—

- বৃহৎ কলেবরের সমৃদ্ধ ইসলামি ইতিহাস বিশ্বকোষ।
- সাধারণ পাঠকের জন্য পাঁচ খণ্ডের সংক্ষিপ্ত কলেবরে পুরো ইসলামি ইতিহাস।
- পুরো ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণার জন্য এক মলাটে ইসলামি ইতিহাস।
- বিষয়ভিত্তিক ইতিহাস। যেমন: ইসলামের রাজনৈতিক ইতিহাস, সামরিক ইতিহাস, স্থাপত্য-ইতিহাস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস, ইসলামি সাহিত্যের ইতিহাস, হাদিস ও ফিকহ শাস্ত্রের ইতিহাস, ইসলামি স্থাপত্য ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাস ইত্যাদি।
- অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস। যেমন: মক্কা-মদিনার ইতিহাস, ইরাকভূমির ইতিহাস, ফিলিস্তিনের ইতিহাস, মাগরিবের ইতিহাস, আন্দালুসের ইতিহাস, মধ্য এশিয়ার ইতিহাস, ভারতবর্ষে ইসলামের ইতিহাস, বাংলাদেশে ইসলামের ইতিহাস ইত্যাদি।
- রাজপরিবার-কেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: উমাইয়া সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আব্বাসি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, উসমানি সাম্রাজ্যের ইতিহাস, সেলজুক সালতানাতের ইতিহাস, শিয়া ফাতিমি

সাম্রাজ্যের ইতিহাস, আইয়ুবি সালতানাতের ইতিহাস, ভারতবর্ষের মোঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাস, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস ইত্যাদি।

- জীবনীকেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: সিরাতে নববি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশিদিনের ইতিহাস, ইমামদের জীবনী ও মহান মনীষীগণের জীবনী।

- জাতি-দল-শ্রেণিকেন্দ্রিক ইতিহাস। যেমন: তুর্কি জাতির ইতিহাস, উইঘুর জাতির ইতিহাস, শিয়াদের ইতিহাস, তাতারিদের ইতিহাস, লা-মাযহাবিদের ইতিহাস ইত্যাদি।

- স্থাপনা-প্রতিষ্ঠাননির্ভর ইতিহাস। যেমন: কাবাঘরের ইতিহাস, মসজিদে নববির ইতিহাস, মসজিদুল আকসার ইতিহাস, বাবরি মসজিদের ইতিহাস, জামে আযহারের ইতিহাস, দারুল উলুম দেওবন্দের ইতিহাস ইত্যাদি।

- ইসলামি ইতিহাসের বিশেষ ঘটনানির্ভর গ্রন্থ। যেমন: ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস, বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের ইতিহাস, ভারতবিজয়ের ইতিহাস ইত্যাদি।

- শিশুতোষ ইতিহাসগ্রন্থ।

- ইতিহাসনির্ভর মানচিত্র, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি ইত্যাদি।

আমরা জানি—স্বপ্নের পরিধি সুদূর বিস্তৃত হলেও আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য অতি সামান্য। কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্যের জোরে পৃথিবীতে কবে কোন কাজ হয়েছে বলুন?! আমরা বিশ্বাস করি—'তিনি' যদি চান, তাহলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়; যদি 'তিনি' না চান, অতিসম্ভবও সম্ভব নয়। পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী সকলের কাছে আমরা দোয়াপ্রার্থী—আল্লাহ পাক যেন আমাদের স্বপ্ন পূরণ করেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার তাওফিক দান করেন এবং যা কিছু কল্যাণকর—তার সঙ্গে জুড়ে রাখেন।

ভুলে গেলে চলবে না—আজ আমরা যা-কিছুর মাঝে জীবনযাপন করছি, একদিন তা-ও স্বপ্ন ও কল্পনা ছিল। ঠিক তেমনই আজ যা স্বপ্ন ও কল্পনা, আগামী দিন তা-ই হবে চাক্ষুষ বাস্তব, ইনশাআল্লাহ!

বৃহৎ এই কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতিমধ্যে **মাকতাবাতুল হাসান** থেকে *তাতারিদের ইতিহাস*, *আন্দালুসের ইতিহাস*, *তিউনিসিয়ার ইতিহাস*, *ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাস*, *সবুজ পৃথিবী ও মুসলমানদের অবদান*-সহ বেশকিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। আরও কিছু বই ছাপা-উপযুক্ত হয়ে প্রকাশের প্রহর গুনছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইসলামি ইতিহাসের পাঠকদের জন্য আমাদের এবারের উপহার পাঁচ খণ্ডে সংক্ষিপ্ত ইসলামি ইতিহাসকোষ। বাংলা ভাষাভাষী পাঠকবৃন্দ যেন সংক্ষিপ্ত কলেবরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবপূর্ব সময় হতে আমাদের যাপিত কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ পনেরো শতাব্দীর পুরো ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করতে পারেন, এ লক্ষ্যেই আমাদের এই আয়োজন।

* * *

এবার বক্ষ্যমাণ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু কথা। সংক্ষিপ্ত কলেবরে ইসলামি ইতিহাসকোষ প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর আমরা এ বিষয়ে আরববিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত গ্রন্থ "الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي" (ইসলামি ইতিহাসের সুলভ বিশ্বকোষ) গ্রন্থটি নির্বাচন করি। দুই খণ্ডের এই গ্রন্থটি মিশরের দুই প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও ইসলামি স্কলার কাসিম আবদুল্লাহ ইবরাহিম ও মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ সালিহ-এর তত্ত্বাবধানে মিশরকেন্দ্রিক ফরিকুল বুহুস ওয়াদ দিরাসাতিল ইসলামিয়া (ইসলামি গবেষণা ও অধ্যয়ন পরিষদ) হতে প্রকাশিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে চল্লিশবারের অধিক পুনঃমুদ্রিত হয়েছে। গ্রন্থটির মান ও গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে এতটুকু তথ্যই আশা করি যথেষ্ট বিবেচিত হবে যে, ইসলামি ইতিহাস বিষয়ক সর্ববৃহৎ ওয়েবসাইট www.islamstory.com-এর তত্ত্বাবধায়ক ও প্রখ্যাত ইতিহাস-লেখক ড. রাগিব সারজানি গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শুভ আবির্ভাব হতে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়কালের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনার পাশাপাশি ইতিহাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের বিশ্লেষণও করা হয়েছে।

গ্রন্থ নির্বাচনের পর দ্রুততম সময়ে অনুবাদ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে **মাকতাবাতুল হাসান** একটি অনুবাদপর্ষদ গঠন করে। যেসব সম্মানিত

লেখক-অনুবাদক আমাদের এই ইসলামি ইতিহাসকোষের অনুবাদপর্ষদে ছিলেন, তারা হলেন—

- মাওলানা আবু মুসআব ওসমান : ১ম ও ২য় খণ্ড
- মাওলানা মাহদি হাসান : ৩য় খণ্ড
- মাওলানা আতাউল কারিম মাকসুদ : ৪র্থ খণ্ড ০১-২৪০ পৃষ্ঠা
- ড. মো. মনিরুজ্জামান : ৪র্থ খণ্ড ২৪১-৩২৩ পৃষ্ঠা
- মাওলানা আবু তালহা সাজিদ : ৪র্থ খণ্ড ৩২৫-৩৩১, ৫ম খণ্ড ০১-১১২ পৃষ্ঠা
- মাওলানা শিহাবুদ্দীন খান : ৫ম খণ্ড ১১৩-২৫২পৃষ্ঠা

এবং গ্রন্থটির সম্পাদনা পর্ষদে ছিলেন :

৩য় খণ্ড

- মাওলানা আবু মুসআব ওসমান

৪র্থ ও ৫ম খণ্ড

- মুফতি তারেকুজ্জামান
- মাওলানা ইমরান রাইহান
- মাওলানা মোহাম্মদ নোমান আল-আজহারী
- মাওলানা আব্দুর রহীম আল-আজহারী
- মাওলানা সদরুল আমীন সাকিব
- মাওলানা মাসুম বিল্লাহ

সম্পাদনাপর্ব চলাকালে ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কলেবরের আরেকটি চমৎকার গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়। التاريخ الإسلامي من الخلافة الراشدة حتى العصر الحديث (ইসলামি ইতিহাস : খিলাফতে রাশেদা হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত) নামক দুই খণ্ডের আরবি গ্রন্থটির সংকলক মিশরের প্রখ্যাত গবেষক-লেখক প্রফেসর ইবরাহিম মাহমুদ আবদুর রাজি। প্রথম গ্রন্থটির মতো এ গ্রন্থটিরও ভূমিকা লিখেছেন ড. রাগিব সারজানি। আমাদের অনূদিত এ গ্রন্থকে আরও সমৃদ্ধ করার মানসে আমরা উক্ত গ্রন্থটিকেও আমাদের কর্মপরিকল্পনায় যুক্ত করেছি এবং উক্ত গ্রন্থটির যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রথমোক্ত গ্রন্থে আসেনি, তাও আমাদের অনূদিত গ্রন্থে যুক্ত

করে দিয়েছি। এ ছাড়া বিজ্ঞ সম্পাদকগণ নিজেরাও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংযোজন করেছেন। গ্রন্থটির সিংহভাগ টীকা সম্পাদকবৃন্দ কর্তৃক সংযোজিত। সবমিলিয়ে আমরা আশাবাদী—আমাদের অন্যান্য কাজের ন্যায় বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিও পাঠকবৃন্দের কাছে সাদরে গৃহীত হবে।

* * *

মাকতাবাতুল হাসান তার প্রতিটি বই প্রকাশের ক্ষেত্রে বইয়ের ভাষাগত ও তথ্যগত বিশুদ্ধতার পাশাপাশি কাগজ, ছাপা ও বাঁধাইয়ের মান রক্ষার ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকে। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটির ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। অনুবাদ, সম্পাদনা, বানান সমন্বয় ও পৃষ্ঠাসজ্জাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা সচেতন ও রুচিশীল পাঠকের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করেছি। গ্রন্থটির মান ও সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি করতে আমরা বিভিন্ন স্থানে ছক, তালিকা ও বংশলতিকা যোগ করার পাশাপাশি বিভিন্ন মানচিত্রও যুক্ত করেছি।

তারপরও তুলনামূলক বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া একেবারেই স্বাভাবিক। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ যদি গ্রন্থটি সম্পর্কে নিজেদের পরামর্শ, মন্তব্য ও ভালো-মন্দ আমাদেরকে জানান, ইনশাআল্লাহ আমরা তা গ্রহণ করব এবং পরবর্তী সংস্করণে আরও সমৃদ্ধরূপে গ্রন্থটি প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনা-দুর্ঘটনার তারিখ-সন নির্ণয়ে প্রাচীন উৎসগ্রন্থসমূহের বর্ণনায়ও বিরোধ রয়েছে। কাজেই বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে উল্লেখিত তারিখ-সন কিছু গ্রন্থের বর্ণনার সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। পাশাপাশি এ তথ্যটিও পাঠকবৃন্দকে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করছি যে, অনেক ঘটনাবর্ণনার সঙ্গেই মূল গ্রন্থে তারিখ ও সন উল্লেখ ছিল না। আমরা নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থ ঘেঁটে তা যুক্ত করে দিয়েছি। আর খ্রিষ্টাব্দ বা ঈসায়ি সন-তারিখ সম্পূর্ণই আমাদের পক্ষ থেকে যুক্ত করা।

শেষ কথা—সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবগাহন করুন ইসলামি ইতিহাসের গৌরবময় অঙ্গনে।

বিনীত

২০ মুহাররম ১৪৪২ হিজরি
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

মো. রাকিবুল হাসান খান
মাকতাবাতুল হাসান
rakib1203@gmail.com

ইতিহাস কী ও কেন

❝ ইতিহাসকে তুলনা করা যেতে পারে একজন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির সঙ্গে। ব্যক্তিজীবনে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তির যে ভূমিকা, ঠিক একই ভূমিকা জাতীয় জীবনে ইতিহাসের। ইতিহাসের মাধ্যমেই জাতি আপন অতীতকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করতে পারে এবং ভবিষ্যৎকে অনুমান করতে পারে।

❝ স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলা একজন মানুষের কথা কল্পনা করুন। যেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক শিশু! ভালো-মন্দের উপলব্ধিবোধ নেই, চারপাশের ঘটনা-দুর্ঘটনায় কোনো প্রতিক্রিয়া নেই; বর্তমানের অনুভূতি নেই, ভবিষ্যতের চিন্তা-ভাবনাও নেই। ইতিহাস হারিয়ে ফেলা একটি জাতির অবস্থাও একই রকম। জাতি যখন আপন ইতিহাসশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং জাতির সন্তানদের চিন্তা-চেতনা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, তখন জাতি হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত ও পথহারা; যারা যেভাবে যে পথে ইচ্ছা, জাতিকে পরিচালিত করতে পারে।

❝ সুতরাং ইতিহাস অতীত-জ্ঞানের নাম নয়; প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যতের বাস্তবজ্ঞান। আর তাই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে সে জাতিই সগৌরবে টিকে থাকতে পারে, যার আছে অতীতকে উপলব্ধি করার, বর্তমানকে বিশ্লেষণ করার এবং ভবিষ্যৎকে অনুমান করার ইতিহাস-অনুভূতি।

❝ ইতিহাস মুসলমানের সামনে সুবিস্তৃত জ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচিত করে; জাতিসমূহের অবস্থা, মনীষীগণের কীর্তিনামা এবং জাতি ও ব্যক্তির সংস্পর্শে ঘটা কালের আবর্তন-বিবর্তন সম্পর্কে অবহিত করে। ইতিহাস-পাঠক সুস্পষ্ট দেখতে পায়—'সুন্নাতুল্লাহ' কীভাবে যুগে যুগে ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি সমাজে কার্যকর হয় এবং শাশ্বত কুদরতি রীতি কীভাবে রাগ ও অনুরাগ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ সযত্নে এড়িয়ে চলে। কীভাবে একটি জাতির উত্থান ঘটে এবং কীভাবে পতন ঘটে। কীভাবে

একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কীভাবে অস্তিত্ব হারায়। কীভাবে একটি আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করে এবং কীভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। কীভাবে সভ্যতা জীবনী-শক্তি লাভ করে এবং কীভাবে নির্জীব-নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে। কীভাবে জাতির পরিচালকগণ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে এবং কীভাবে কক্ষপথ হতে ছিটকে পড়ে। কীভাবে জনসাধারণ চেতনায় উজ্জীবিত হয় এবং কীভাবে উদাসীনতায় ঘুমিয়ে পড়ে।

❝ ইতিহাস অনেক সময় চলমান বাস্তবতার রূপ ও স্বরূপ উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। যাপিত বর্তমান ও বিগত ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতি, অনুঘটক ও কার্যকারণ যদি সাদৃশ্যপূর্ণ হয়, তাহলে অনুমান করা যায়—কী হচ্ছে এবং কী হতে চলেছে। এ কারণেই অতীতের আরবরা বলত—'কত মিল যুগের সঙ্গে যুগের! কত সাদৃশ্য আজ রাত ও গতরাতের!' আর পশ্চিমারা বলত—'ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে!'

❝ ইতিহাস শুধু কিছু ঘটনার ধারাবিবরণ নয়, নয় কেবল বিগত ঘটনাপ্রবাহের সংরক্ষণ; ইতিহাস হলো শিক্ষা ও উপদেশ; দীক্ষা ও পরিচর্যার পাঠ। ইতিহাসের শিক্ষা ও উপদেশ শাশ্বত, সদা কার্যকর। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—'তাদেরকে শোনাতে থাকুন এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে।' আর তাই ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জাতি ইতিহাস অধ্যয়নকে জাতিগঠনের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসেবে গণ্য করে। এ কারণেই প্রত্যেক জাতি আপন ইতিহাস এমনভাবে রূপায়ণ ও সংরক্ষণ করে, যাতে ইতিহাস জাতিজীবনে দীক্ষা ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালন করতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, পাঠকহৃদয়ে সুনির্দিষ্ট একটি ভাব ও প্রভাব সৃষ্টি করতে ইসলামি ইতিহাসকে সত্য-অসত্যের মিশেলে অবাস্তব রূপ দান করা হবে; মুসলমানদের বিচ্যুতি ও স্খলনের বিবরণ উপেক্ষা করে কেবল বীরত্ব ও গৌরবের দাস্তানই তুলে ধরা হবে। এটি ইতিহাসশাস্ত্রের উদ্দেশ্য নয়। ইতিহাসের চাওয়া ও লক্ষ্য হলো—পাঠক যেন ইতিহাস অধ্যয়ন করে এই সুমহান শিক্ষা অর্জন করতে পারে যে, মুসলিম উম্মাহর উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি এমন কিছু চিরন্তন ও শাশ্বত কুদরতি নীতির বশীভূত, যা কারও পক্ষপাতিত্ব করে না এবং কারও স্বার্থ রক্ষায় আপন কক্ষপথ থেকে বিচ্যুত হয় না।

ড. রাগিব সারজানির

ভূমিকা

হামদ ও সালাতের পর,

মোটামুটি পর্যাপ্ত ও বিস্তৃত অধ্যয়ন এবং এর মাধ্যমে অর্জিত তথ্য-জ্ঞানের ভিত্তিতে আমার সামনে এ বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে যে, ভূপৃষ্ঠে নতুন বলে কিছু নেই! বরং বিস্ময়করভাবে অতীত ইতিহাসই বারবার ফিরে আসে। আমরা মূলত অতীত ঘটনাকেই সামান্য পরিবর্তনসহ নতুন করে প্রত্যক্ষ করি। গ্রন্থের পাতায় ইতিহাস পাঠ করে আমাদের কল্পনায় ঘটনার যে রূপ ও চিত্র ফুটে ওঠে, তা-ই আবার মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের দৃষ্টিপথে। ঘটনার স্থান ও চরিত্রের নামগুলোই শুধু বদলে যায়।

আর তাই সুগভীর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে ইতিহাস অধ্যয়নকারী ব্যক্তি অনুভব করেন যে, তিনি ইতিহাসের পাতায় চলমান পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহই পাঠ করছেন। স্থান-কাল ও পরিবেশ-পরিস্থিতির ভিন্নতা, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের জটিলতা এবং ছল ও ছলনার মাধ্যম-ভিন্নতা—কোনো কিছু দ্বারাই তিনি সহজে ভ্রমের শিকার হন না। বরং তিনি অতীত ইতিহাসের গ্রন্থের পাতায়ই বর্তমানের চলমান ঘটনার পরিণতি ও ভবিষ্যৎ দেখতে পান। তিনি সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারেন—সফলতার জন্য কোথায় পা রাখতে হবে। তিনি জানেন—নিজেকে এবং সমাজ ও জাতিকে কীভাবে পরিচালিত করতে হবে। ইতিহাসের নিবিষ্ট পাঠে তিনি হয়ে ওঠেন এক দীপ্তিমান সূর্য! তার আলোয় আলোকিত পথ লাভ করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম! তার প্রদর্শিত পথ ধরে কাঙ্ক্ষিত মনজিলে পৌঁছায় হাজারো মানুষ! কারও কারও ক্ষেত্রে দান ও অবদানের এই ধারা ততদিন প্রবহমান থাকবে, যতদিন সূর্য পৃথিবীকে আলোকিত করে যাবে। আর এমনটি হবেই না-বা কেন! পূর্বেই তো বলে এসেছি—এ পৃথিবীতে নতুন বলে কিছু নেই!

পবিত্র কুরআনুল কারিমের নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশটি পাঠ করুন এবং এর হাকিকত ও নিগূঢ় রহস্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হোন। আমার বিশ্বাস—এতটুকু প্রচেষ্টাই ইতিহাসপাঠের গুরুত্ব অনুধাবনে যথেষ্ট বিবেচিত হবে।

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> সুতরাং শোনাতে থাকুন (তাদেরকে) এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এ কথা তো স্বতঃসিদ্ধ যে, ঘটনা বর্ণনা বা পাঠ করার পর যদি চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ না করা হয়, তাহলে তা নিষ্ফল কর্ম ছাড়া কিছুই নয়। আর ইতিহাস পাঠ কোনো ঐচ্ছিক বা অতিরিক্ত বিষয় নয়, ইতিহাস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য কেবলই জ্ঞানভান্ডারে নতুন কিছু তথ্য সংযোজন ও জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গকরণ নয়; প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস অধ্যয়ন সুস্থ-শক্তিশালী জাতিগঠন ও শ্রেষ্ঠ জাতিসত্তা বিনির্মাণের অন্যতম ভিত্তি-কাঠামো।

ইতিহাস অধ্যয়নে আমরা এমন অনেক বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করব, যা ব্যতীত মুসলমানদের জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। ইতিহাসের পাতায় পাতায় আমরা মুখোমুখি হব বিভিন্ন আকিদা ও বিশ্বাসগত বিষয়ের; লাভ করব ফিকহ ও জীবনবিধানের জ্ঞান, অর্জন করব আখলাক ও সুষম নৈতিক আচরণ, প্রত্যক্ষ করব মুআমালা ও লেনদেনসহ বিভিন্ন বিধি-বিধানের বাস্তব রূপায়ণ। আমরা ইতিহাসের পাতায় আরও পাব ভারসাম্যনীতি ও অগ্রাধিকারনীতির ক্ষেত্রজ্ঞান এবং যাপিত জীবনের বাস্তব জ্ঞান। বলা ভালো—ইতিহাসগ্রন্থের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে দ্বীন ও ধর্ম এবং ইসলামি জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রের প্রায়োগিক জ্ঞান।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার প্রজ্ঞাপূর্ণ গ্রন্থ আল-কুরআনেও ঘটনা-বর্ণনার শৈলীতে আমাদেরকে শিক্ষা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেছেন; ঘটনার ধারাবর্ণনার মাঝেই এমন অকাট্য দলিল তুলে ধরেছেন, যা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন প্রতিটি মানুষকে আশ্বস্ত করে; এমন সুকোমল নির্দেশনা তুলে ধরেছেন, যা প্রতিটি জীবন্ত হৃদয়কে স্পর্শ করে। ঘটনার মাঝেই আল্লাহ পাক কখনো উল্লেখ করেছেন কোনো

অকাট্য আকিদা কিংবা জীবনব্যবস্থার অপরিহার্য কোনো বিধান; এরপর অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে, ইতিহাসকে বাস্তবতার সঙ্গে এবং প্রাচীন কালকে আধুনিক কালের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন।

আর তাই ইতিহাস পাঠ করার সময় আপনি অনুভব করবেন—ইতিহাস ও অতীতের ধারাবর্ণনা যেন এক জীবন্ত আন্দোলিত সত্তা কিংবা এক সদা-মুখর বক্তা! নিজের অজান্তেই আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাতে শুরু করবে যে, ইতিহাস তো বিগত মানুষজন ও কালের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া জনপদসমূহের কাহিনি বর্ণনা করছে না; ইতিহাস আমাদেরকে শোনাচ্ছে আমাদেরই গল্প, আমাদের যাপিত জীবনেরই দাস্তান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে ইতিহাস এক অমূল্য জ্ঞানসম্পদ, এক প্রোথিত রত্নভান্ডার। একে উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন নিরলস প্রচেষ্টা ও নিরবচ্ছিন্ন সময়; প্রয়োজন মেধা ও বিবেক এবং হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের যথার্থ ব্যবহার।

* * *

ইতিহাসশাস্ত্রের এটিও একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য যে, ইতিহাস একই সঙ্গে পাঠকের জ্ঞানের তৃষ্ণা ও চিত্তের ক্ষুধা নিবারণ করে। কিছু কিছু শাস্ত্র অত্যন্ত কল্যাণকর ও তথ্যসমৃদ্ধ হলেও দুর্বোধ্য ও জটিল হওয়ায় অধিকাংশ পাঠক সেগুলো পাঠে অভ্যস্ত হতে পারে না। আবার কিছু শাস্ত্র অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও উপভোগ্য হলেও পাঠক তা থেকে আপন জীবন ও সমাজের জন্য কল্যাণকর কিছুই খুঁজে পায় না; বা অতি সামান্য কিছু লাভ করে। কিন্তু ইতিহাস এমন এক শাস্ত্র, যাতে একই সঙ্গে অত্যুচ্চ কল্যাণ ও সর্বোচ্চ উপভোগের সম্মিলন ঘটেছে। ইতিহাসের এই দুর্লভ বৈশিষ্ট্যের কারণেই আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে আত্মোন্নয়ন এবং পরিবার-সমাজ ও জাতির সংশোধনের জন্য ইতিহাস ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾

> সুতরাং শোনাতে থাকুন (তাদেরকে) এসব ঘটনা, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ : ১৭৬]

এই কুরআনি নির্দেশনা শ্রেণি ও বর্ণের বিচিত্রতা, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও জ্ঞান-অভিজ্ঞতার তারতম্য এবং উপলব্ধি ও অর্জনশক্তির বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল

মুমিন-মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। সকলেই ইতিহাস পাঠে শিক্ষার উপকরণ লাভ করে, সকলেই আগ্রহ নিয়ে ইতিহাসের ধারাবর্ণনা শুনতে চায়। প্রত্যেকের অর্জন ও উপলব্ধি হয়তো সমান হয় না, প্রত্যেকেই হয়তো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শোনার ধৈর্য রাখে না; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই কমবেশি উপকৃত হয়। এটি একমাত্র ইতিহাসশাস্ত্রেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য।

পবিত্র কুরআনে ঘটনা ও ধারাবর্ণনার আধিক্যও মূলত কল্যাণ ও উপভোগের এই সম্মিলনের কারণেই হয়েছে। এই মহাগ্রন্থের এমন একটি পৃষ্ঠাও খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে, যেখানে কোনো সমাজের ঘটনা বা কোনো জাতির ইতিহাস বর্ণিত হয়নি। কোথাও বিশদ-বিস্তারিতভাবে, কোথাও সংক্ষেপে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়ে; কোথাও স্থান-কাল-পাত্র উল্লেখ করে, আবার কোথাও অনুল্লেখের মাধ্যমে ব্যাপকতার শৈলী অবলম্বন করে। যেহেতু এই মহাগ্রন্থ সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাই তার আলোচ্য বিষয় সকলের জন্য কল্যাণকর ও চিত্তাকর্ষক হওয়াই ছিল অত্যাবশ্যক। কারও পক্ষে এই কারণ দর্শানোর সুযোগ নেই যে, সে কুরআনের বার্তা উপলব্ধি করতে পারছে না কিংবা কুরআনি বর্ণনা তার মাঝে বিরক্তি-বিতৃষ্ণা তৈরি করছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একই রীতি-শৈলী প্রয়োগ করেছেন। আর তাই আমরা দেখতে পাই, নবীজি যখন সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও নেক আমলের ওসিলাগ্রহণ শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন তাদেরকে পাহাড়ের গুহায় আটকে পড়া তিন ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছেন; যখন তাদেরকে কাফিরদের নির্যাতন-নিপীড়নের মোকাবিলায় ধৈর্য ও অবিচলতার শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন আসহাবে উখদুদ-এর[১] ঘটনা শুনিয়েছেন; যখন তাদেরকে সততার গুরুত্ব, দান-সদকার কল্যাণ ও অপরকে সহায়তার মূল্য শিক্ষা দিতে চেয়েছেন, তখন টাক, কুষ্ঠরোগী ও অন্ধ ব্যক্তির ঘটনা শুনিয়েছেন। এ ধরনের দৃষ্টান্তের সংখ্যা অনেক, এখানে কয়টির কথাই-বা বলব! বাস্তবেই নববি জবানে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনায় কল্যাণ ও উপভোগের সর্বোচ্চ সম্মিলন ঘটেছে।

* * *

১. পবিত্র কুরআনের সুরা বুরুজ দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের কল্যাণ ও উপকার তো অসংখ্য। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো—

● মুমিনদের অন্তরে শক্তি ও দৃঢ়তা জোগানো—

﴿وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِۦ فُؤَادَكَ﴾

(হে নবী,) আমি আপনাকে বিগত নবীগণের এমন সব ঘটনা শোনাচ্ছি, যা দ্বারা আমি আপনার অন্তরে শক্তি জোগাই।

[সুরা হুদ : ১২০]

● সর্বদা কার্যকর মানবজীবনের শাশ্বত রীতির বিশ্লেষণ—

﴿فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۖ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا﴾

অতএব আপনি আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবেন না এবং আল্লাহর রীতি-নীতিতে কোনো রকম বিচ্যুতিও পাবেন না।

[সুরা ফাতির : ৪৩]

● পরিণতি হতে শিক্ষাগ্রহণ—

﴿تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنۢبَآئِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَٰتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَٰفِرِينَ﴾

এই হচ্ছে সেসব জনপদ, যার ঘটনাবলি আমি আপনাকে শোনাচ্ছি। বস্তুত তাদের কাছে তাদের রাসুলগণ স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা পূর্বে যা প্রত্যাখ্যান করেছিল, তাতে ঈমান আনার জন্য কখনো প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আল্লাহ কাফিরদের অন্তরে মোহর এঁটে দেন। [সুরা আরাফ : ১০১]

● শিক্ষাদান ও সতর্কীকরণ—

﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ﴾

(হে নবী,) আমি ওহি মারফত এই যে কুরআন আপনার কাছে পাঠিয়েছি, এর মাধ্যমে আপনাকে এক উৎকৃষ্টতম ঘটনা শোনাচ্ছি; যদিও আপনি পূর্বে এ সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন।

[সুরা ইউসুফ : ০৩]

● প্রমাণ প্রতিষ্ঠাকরণ—

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

নিশ্চয়ই তাদের ঘটনায় বোধসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য শিক্ষাগ্রহণের উপাদান আছে। এটা কোনো মনগড়া বাণী নয়। বরং এটা এর পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সমর্থক, সবকিছুর বিশদ বিবরণ এবং যারা ঈমান আনে, তাদের জন্য হিদায়াত ও রহমতের উপকরণ।

[সুরা ইউসুফ : ১১১]

* * *

মানবজাতি ইতিহাসশাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। পৃথিবীর প্রতিটি জাতির কাছে এ উপলব্ধি আছে যে, আপন ইতিহাস তাদের জাতিগত পরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর তাই ইতিহাসের ছোট-বড় প্রতিটি ঘটনার বিশ্লেষণ করে প্রচুর গ্রন্থ রচিত হয়েছে, পূর্ববর্তীদের বিভিন্ন ঐতিহ্য ও নিদর্শন সংরক্ষণ করার জন্য বড় বড় জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে রাষ্ট্রনায়ক, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ জ্ঞানীসমাজ পূর্ববর্তীদের রেখে যাওয়া প্রতিটি জ্ঞানসম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান হচ্ছে। ইতিহাসসংশ্লিষ্ট প্রতিটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণেই পুরোনো একটি ভাঙা বোতল, ছিন্ন পরিচ্ছদ বা অচল পয়সাও অমূল্য সম্পদে পরিণত হচ্ছে। কয়েক শতাব্দী পূর্বের কোনো পাণ্ডুলিপি এমন অমূল্য বিবেচিত হচ্ছে যে, শুধু জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীগণ নয়; বড় বড় রাষ্ট্রও ঐতিহাসিক মূল্যমানের কারণে তা কেনার জন্য প্রতিযোগিতা করছে; এমনকি চুরি করে হলেও তার মালিক হওয়ার চেষ্টা করছে!

এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ, চিন্তাবিদ ও জ্ঞানীমহলের পাশাপাশি সাধারণ জনগণও ইতিহাসের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ও মনোযোগী। অথচ তাদের অধিকাংশই বাহ্যত ইতিহাসসংশ্লিষ্ট কোনো অঙ্গনের সঙ্গে জড়িত নয়। জার্মানির এক সফরে আমি সেখানকার একটি লাইব্রেরিতে আগের মাসে ইউরোপে সর্বোচ্চ বিক্রিত বইয়ের তালিকা দেখতে পেলাম। এক নম্বরে যে বইটির নাম ছিল, সেটি ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাস নিয়ে লেখা। তালিকায় চার নম্বরে থাকা বইটি ছিল ঐতিহাসিক সিল্ক রোডের বিবরণ সম্পর্কে। চীনের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ স্থাপনকারী এই প্রাচীন বাণিজ্যিক পথটির অতীতে গুরুত্ব থাকলেও বর্তমানে এর উল্লেখযোগ্য কোনো প্রভাব নেই। তা সত্ত্বেও সিল্ক রোড সম্পর্কে লিখিত একটি বই ইউরোপীয় জনগণের কাছে এতটা গুরুত্ব লাভ করেছে যে, বইটি সর্বোচ্চ বিক্রিত তালিকায় চার নাম্বারে আছে!

ইতিহাস-অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কৃতি। যে জাতি ইতিহাসের প্রতি মনোযোগী নয়, তারা ধীরে ধীরে অন্যান্য জাতির আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হয়। পূর্বের মানুষ যে ভুল করেছে, তারা সে ভুল বারবার করে; পূর্ববর্তীদের অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই অর্জন করতে পারে না। এ কারণেই তারা অন্যদের চেয়ে পিছিয়ে পড়ে এবং বারবার দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের শিকার হয়।

* * *

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইতিহাসের প্রতি আমাদের যাপিত সময়ের মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? নির্মম বাস্তবতা হলো, এ প্রশ্নের উত্তর বড় বেদনাদায়ক, বড় বিস্ময়কর। ইতিহাস সংরক্ষণ ও ইতিহাস অধ্যয়নের এই অত্যুচ্চ ও অনস্বীকার্য গুরুত্ব সত্ত্বেও এ অঙ্গনে মুসলমানদের বিচরণ ও কর্মজাগরণ এখনো কাঙ্ক্ষিত স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। সর্বাধিক বিক্রিত

আরবি গ্রন্থের একটি তালিকা আমি দেখেছিলাম। প্রথম দশের একটিও ইতিহাসগ্রন্থ নয়! আমাদের জাদুঘর-মিউজিয়ামের সংখ্যাও একেবারেই অল্প। তার চেয়েও নেতিবাচক বিষয় হলো, এসব জাদুঘরের মুসলিম দর্শনার্থীর সংখ্যা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য। আমি বিশ্বের সর্বাধিক দর্শনার্থীসম্পন্ন একশটি জাদুঘরের তালিকা দেখেছিলাম। তাতে কোনো মুসলিম দেশের একটি জাদুঘরও স্থান পায়নি। হ্যাঁ, এটিই তিক্ত ও নির্মম বাস্তবতা!

যদিও পবিত্র কুরআনের সূচনাই হয়েছে 'পড়ো' নির্দেশ দিয়ে; কিন্তু আমরা পড়ি খুব কম। যদিও পড়ি, অধ্যয়নসূচিতে ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ মোটেও স্থান পায় না। অথচ পবিত্র কুরআনে ইতিহাস অধ্যয়নের প্রত্যক্ষ নির্দেশ রয়েছে।

এর চেয়েও আশঙ্কাজনক বিষয় হলো, ইতিহাসের অঙ্গনে আলিম-উলামা ও লেখক-সাহিত্যিকগণের পদচারণা একেবারেই সীমিত। আমি বিগত বেশ কিছুদিন ব্যাপকভাবে উসমানি সাম্রাজ্য ও বিশেষভাবে সুলতান মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন ও গবেষণায় ব্যস্ত ছিলাম। কাজ করতে গিয়ে আমি অত্যন্ত আশঙ্কাজনক একটি চিত্র লক্ষ করলাম। উসমানি সালতানাত নিয়ে ইউরোপীয় লেখক, গবেষক ও ইতিহাসবিদদের রচনার সংখ্যা মুসলিম লেখকদের রচনার চেয়ে কেবল বেশিই নয়; বরং তুলনা করাও বেমানান! আরও আশঙ্কাজনক চিত্র হলো, ইউরোপীয় লেখকদের রচনাবলি গবেষণামূলক ও বিষয়-বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ উসমানি সাম্রাজ্যের কেবল রাজনৈতিক দিক নয়; অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় দিকেরও অতি সূক্ষ্ম ও গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ করেছেন। বিপরীতে একই বিষয়ে মুসলিম লেখকদের রচনাসম্ভার কেবল স্বল্পই নয়; অধিকাংশ রচনাই অগভীর ও অস্পষ্ট আলোচনায় ভরা এবং বিরক্তিকর বারংবারতার দোষে দুষ্ট। কিছু কিছু গ্রন্থ তো সম্পূর্ণই একটি অপরটির প্রতিলিপি; কোনো নতুনত্ব বা সৃজনশীলতা তাতে নেই!

* * *

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানবজাতি তার সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যেসব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে স্বচ্ছ ও

সমৃদ্ধ, নিখুঁত ও সুমহান ইতিহাস হলো ইসলামি ইতিহাস। ইসলামি ইতিহাসের সংকলনে পৃথিবী ও সমগ্র মানবজাতিই ধন্য হয়েছে। কারণ, এ ইতিহাস এক প্রামাণিক ও মৃত্যুঞ্জয়ী জাতির ইতিহাস, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির ইতিহাস, খোদাভীরু ও ন্যায়পরায়ণ জাতির ইতিহাস। এ ইতিহাস ন্যায়ের আহ্বানকারী ও অন্যায়ের বারণকারী জাতির ইতিহাস এবং কল্যাণের পথপ্রদর্শক ও অকল্যাণের প্রতিবাদী জাতির ইতিহাস।

ইসলামি ইতিহাস সেসব মহান ব্যক্তির ইতিহাস, যাদের জুড়ি মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তারা নিজেদের দ্বীন ও ধর্মের দাবি এবং পার্থিব জীবনের রূপ ও স্বরূপ যথার্থভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তারা যখন প্রজ্ঞার সঙ্গে পৃথিবীর নেতৃত্ব দিয়েছেন; তখনও তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পরকালের প্রতি। আর তাই তাদের মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে এক বিস্ময়কর ও সুকঠিন সমীকরণ—দুনিয়া ও আখিরাতের মর্যাদা, ইহকাল ও পরকালের গৌরব এবং উভয় জগতের রাজত্বের এক আশ্চর্য সম্মিলন।

ইসলামি ইতিহাস সেই গৌরবময় সভ্যতার ইতিহাস, যার মাঝে উন্নত-অনুপম বিন্যাসে জীবনের সকল অঙ্গনের সন্নিবেশ ঘটেছে। নিঃসন্দেহে ইসলামি সভ্যতা নৈতিকতা ও আচরণের উদারতা, রাজনীতি ও সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্পনীতি, ন্যায়বিচার ও বিনোদন, দৃঢ়তা ও শক্তি, মেধা ও কর্মপ্রচেষ্টা—যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এক সভ্যতা। ইসলামি সভ্যতা এ সবকিছুর সম্মিলন ঘটিয়েছে আকিদা ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা, ইবাদত ও উপাসনার বিশুদ্ধতা এবং লক্ষ্য ও গন্তব্যের নিষ্ঠা ও আভিজাত্যের সঙ্গে। মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

﴿ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ﴾

> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে ইসলামকে পছন্দ করলাম।
>
> [সুরা মায়িদা : ০৩]

এটিই হলো ইসলামি ইতিহাসের মূল পরিচয়-বৈশিষ্ট্য।

ইসলামের সুমহান ইতিহাসে কিছু ত্রুটি ও স্খলনের বিবরণও পাওয়া যাবে। এমন অন্যায় ও ভুলের বিবরণও পাওয়া যাবে, যা জাতিজীবনে নিয়ে এসেছিল ভয়াবহ দুর্যোগ ও বিপর্যয়। আমরা যদি দাবি করি যে, ইসলামি ইতিহাস মলিনতামুক্ত এক শুভ্র ইতিহাস এবং ত্রুটিমুক্ত এক স্বচ্ছ ইতিহাস, তাহলে তা হবে অর্থহীন দাবি। তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মুসলমানদের এসব ভুলত্রুটিকে যদি ইসলামের প্রতি সম্বন্ধ করা হয়, তাহলে তা হবে সুস্পষ্ট অবিচার। ইসলাম তো সব ধরনের ত্রুটি ও অপূর্ণতা-মুক্ত ধর্ম। ইসলাম সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। ইসলাম সেই মহান সত্তার প্রণীত দ্বীন ও জীবনবিধান, যিনি জানেন গোপন ও অতি-গোপন সবকিছুই। পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি প্রজ্ঞাময়-সর্বজ্ঞ। সুতরাং কোনো মুসলমান যদি দ্বীন ও দ্বীনের দাবির ব্যতিক্রম কিছু করে, দায়ভার তার ওপরই বর্তাবে; ইসলামের ওপর নয়।

অনেক সময় মানুষ ভুলত্রুটি করায় পতন ও স্খলনের শিকার হয়; এরপর কালবিলম্ব না করেই নতুন করে উঠে দাঁড়ায়। এমনটি তখনই হয়, যখন মানুষ সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করে, দ্বীনের দাবির প্রতি প্রত্যাগমন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা তাদের পরিবর্তে আপন দ্বীনের জন্য অটল-অবিচল ও পুণ্যবান দ্বীন-যোদ্ধাদের মনোনীত করেন।

* * *

এবার একটু বিরতি ও কিছু প্রশ্ন!

এই অমূল্য জ্ঞানসম্পদ!

এই সমৃদ্ধ রত্নভান্ডার!!

সুদীর্ঘ ইসলামি ইতিহাস!!!

ঐতিহাসিক এ সম্পদের বিষয়ে বর্তমান যুগে কাদেরকে আমরা আস্থাভাজন ভাবতে পারি?!

কাদের হাতে আমরা নিশ্চিন্তে এই প্রোথিত সম্পদের চাবিকাঠি তুলে দিয়ে বলতে পারি—আপনারা অনুসন্ধান চালান আর বের করে আনুন ইতিহাসের মণি-মুক্তা, অমূল্য জ্ঞানসম্পদ?!

কাদের কাছে আমাদের বিবেক-বুদ্ধি, হৃদয়-মন সঁপে দিয়ে মিনতি জানাতে পারি—ইসলামি ইতিহাসের খনি হতে আপনারা যেসব মর্মজ্ঞান ও বিধি-বিধান আহরণ করেছেন, তা দিয়ে আমাদেরকেও সমৃদ্ধ করুন?!

হায় আফসোস!

হায় মুসলিম উম্মাহ!!

কী চরম নির্বুদ্ধিতা! কী আশ্চর্য উদাসীনতা স্বজাতির!!

মুসলিম উম্মাহ এই অমূল্য জ্ঞানসম্পদ উদ্‌ঘাটন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আজ ছেড়ে দিয়েছে গুটিকয়েক মন্দ লোকের হাতে! একদল অমুসলিম প্রাচ্যবিদের হাতে এবং সেসব 'মুসলমানের' হাতে, যাদের মন-মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন প্রাচ্যবিদদের নীতি-আদর্শে! ইতিহাস গবেষণা ও ইতিহাস সংকলনের দায়িত্ব আজ ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর বর্ণচেনা ও বর্ণচোরা শত্রুদের হাতে!

আমরা আজ আমাদের ইতিহাস-সম্পদ এসব লোকের হাতেই সমর্পণ করেছি, যেন তারা ইতিহাসের পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা মহা মূল্যবান সবকিছু লুট করে নিয়ে যায়; তারপর আমাদের সামনে পেশ করে গৌরবময় প্রকৃত ইতিহাসের পরিবর্তে মিথ্যায় আচ্ছন্ন এক বিকৃত ইতিহাস। আর তাই ইসলামি ইতিহাসের নামে আমরা আজ যা পাচ্ছি তা হলো জাল, বানোয়াট ও বিকৃত কিছু কাহিনি। ফলে গৌরব ও মর্যাদার যে স্বর্ণশৃঙ্খলে সংযুক্ত ছিল প্রজন্মের সঙ্গে প্রজন্ম, তা আজ ছিন্ন হয়ে গেছে; বর্তমানের মুসলিম জাতি অতীতের মুসলিম উম্মাহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বরং বলা ভালো—জাতির দেহকাঠামো হতে প্রাণ ও প্রাণশক্তিই আলাদা হয়ে গেছে।

উম্মাহর তরুণ প্রজন্ম যখন নতুন করে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখে এবং আগামীর কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে নিজেদের অতীত কর্মনীতি জানতে ইতিহাস হাতে তুলে নেয়, তখন তারা কী খুঁজে পায়? তারা পায় সংঘাত ও হানাহানি, চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র, প্রতারণা ও চৌর্যবৃত্তির বিবরণে ভরপুর অন্ধকার কিছু পাতা। সামনে শুধুই অন্ধকার! যত সামনে, তত অন্ধকার! ইতিহাস হাতে নিয়ে তরুণ প্রজন্ম হতবুদ্ধি ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে আর ভাবতে থাকে—

﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾

অপমান সয়ে নিজের কাছেই রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? [সুরা নাহল: ৫৯]

যারা কোনোপ্রকার জ্ঞানের ভিত্তি ছাড়াই কেবল মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছে, ধিক তাদেরকে! শত ধিক্কার তাদের কুকর্মের প্রতি!

নামধারী যেসব মুসলিম সন্তান ধর্মহীনতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার কর্মধারায় প্রলুব্ধ ও সম্মোহিত হয়ে ইসলামি ইতিহাসকে বিকৃত, বানোয়াট ও কুৎসিত রূপ প্রদান করেছে আর উম্মাহকে বঞ্চিত করেছে দ্বীন ও ধর্মের সকল ক্ষেত্রের অনুপম প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত হতে, ধিক তাদেরকেও! শত ধিক্কার তাদের নির্বুদ্ধিতার প্রতি!

যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এই অন্যায়ের প্রতিবিধানে মনোযোগী হয়নি; ইসলামি ইতিহাসের প্রকৃত বিবরণ ও বিশ্লেষণদানের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তা করেনি এবং উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা ও দিকনির্দেশনার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দায়িত্ব পালন করেনি, ধিক তাদেরকেও! শত ধিক্কার তাদের উদাসীনতার প্রতি!

বিশিষ্ট সাহাবি জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযি. হতে বর্ণিত এক হাদিসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«إِذَا لَعَنَ آخِرُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَه عِلْمٌ فَلْيُظْهِرْهُ؛ فَإِنَّ كَاتِمَ الْعِلْمِ يَوْمَئِذٍ كَكَاتِمِ مَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».

এই উম্মাহর পরবর্তী প্রজন্ম যদি প্রথম প্রজন্মকে অভিসম্পাত করে, তাহলে তারা যেন তাদের কাছে সঞ্চিত ইলম জনসম্মুখে প্রকাশ করে। কারণ, সেদিন যারা ইলম ও জ্ঞান গোপন করবে, তারা সেসব দুর্ভাগার ন্যায় হবে, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনের ইলম গোপন করেছে।[২]

* * *

২. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৪৩০।

আমাদের সামনে বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি মূলত সেই প্রতিকারবিধানেরই মোবারক এক প্রচেষ্টার ফসল। আমাদের প্রতি ইসলামি ইতিহাসের যে দাবি রয়েছে, এই গ্রন্থে কিছুটা হলেও তা পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামি চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে ইসলামি ইতিহাসকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার। আমি মনে করি যে, এ জাতীয় কাজের প্রতি লেখক-সংকলকগণের ঝোঁক ও আগ্রহ মূলত এ বিষয়ের শুভ বার্তাবাহী নিদর্শন যে, জাতি সঠিক পথে পরিচালিত হচ্ছে। আশা করি—অত্যন্ত মূল্যবান ও সুসংক্ষিপ্ত-সুসমৃদ্ধ এই কর্মপ্রচেষ্টা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের নীতি ও মূলনীতিসমূহের সঠিক মর্ম ও তত্ত্ব অনুধাবনে সহায়তা করবে।

যদিও ইসলামি ইতিহাসের বিস্তারিত বিবরণের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে হাজারো আকর্ষণ-সৌন্দর্য; কিন্তু এ গ্রন্থ সংকলনের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলামি ইতিহাসের সুবিস্তৃত মানচিত্রের সাধারণ ব্যাখ্যাদান ও বিশ্লেষণপ্রদান, তাই স্বাভাবিকভাবেই এতে ইতিহাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিস্তারিত বিবরণের পরিবর্তে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি একত্র করার চেষ্টা করা হয়েছে। যারা ইসলামি ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত অধ্যয়ন করতে চান কিংবা ব্যাপক পরিসরে জানতে চান বিশেষ কোনো ব্যক্তি-মনীষা বা রাষ্ট্র-সাম্রাজ্য সম্পর্কে—তারা ইতিহাস ও জীবনীশাস্ত্রের বৃহৎ কলেবরের বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করতে পারেন।

শেষ কথা—মানবিক কোনো কর্মপ্রচেষ্টাই পূর্ণতার দাবি করতে পারে না। বরং প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টা প্রকৃতপক্ষে ইলমের এক বিরাট প্রাসাদ নির্মাণে সংযুক্ত একেকটি ইট। এভাবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই একদিন নির্মিত হবে স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে দোয়া করি—যারা এই সুমহান কর্ম সম্পাদন করেছেন, তিনি যেন তাদেরকে কবুল করেন, কবুল করেন আমাকে এবং তাদের সবাইকে, যারা গ্রন্থটি প্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে শরিক ছিলেন। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন আমাদের সকলের জন্য আমাদের ইতিহাস এবং বর্তমানের সঠিক ও বিশুদ্ধ মর্ম উপলব্ধি সহজ করে দেন এবং আমাদেরকে তার দ্বীনের কাজে ব্যবহার করেন। আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় কল্যাণকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও ক্ষমতাবান। তিনিই সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

﴿فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ۭ وَ اُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ﴾

শীঘ্রই তোমরা স্মরণ করবে, যা আমি তোমাদেরকে বলছি আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে ন্যস্ত করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্যক দ্রষ্টা। [সুরা মুমিন : ৪৪]

— ড. রাগিব সারজানি

প্রাককথন

* *

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব আরব

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব অবশিষ্ট বিশ্ব

ইসলামপূর্ব আরব[৩]

ভৌগোলিক অবস্থান

আরব ভূখণ্ড এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ঐতিহাসিকভাবে ভূখণ্ডটি আরব উপদ্বীপ[৪] ও আরব উপমহাদেশ নামেও খ্যাত।

আয়তনের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব বা আরব উপদ্বীপ বিশ্বের সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। আরব উপদ্বীপের আয়তন ১২,৫০,০০০ বর্গমাইল (৩২,৩৭,৫০০ বর্গকিলোমিটার)। তবে সাধারণ অনুমানে আরব উপদ্বীপের প্রায় ৯৫% এলাকা বসবাসের অনুপযুক্ত মরু অঞ্চল আর বাকি ৫% এলাকা বসবাস উপযোগী।

আরব উপদ্বীপ উত্তর-পূর্বে আরব উপসাগর, পূর্বে হরমুজ প্রণালি, পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগর, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে (ভারত মহাসাগরের অংশ) আরব সাগর, দক্ষিণে এডেন উপসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে বাব আল-মানদিব প্রণালি এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমে লোহিত সাগর দ্বারা বেষ্টিত। রাজনৈতিকভাবে অঞ্চলটির উত্তর সীমানা সুনির্দিষ্ট নয়; বরং

---

৩. প্রাককথন শিরোনামে উল্লেখিত পরিচ্ছেদ-দুটি এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ মূল গ্রন্থের অংশ নয়; বরং অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত। পরিচ্ছেদগুলো সংকলনে উল্লেখযোগ্য যেসব গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে, তা হলো—

১. *সীরাত বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

২. *নবীয়ে রহমত*, সাইয়েদ আবুল হাসান আলি মিয়া নদবি।

৩. *সীরাতুন্নবী*, সাইয়েদ সুলাইমান নদবি।

৪. *হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম : সমকালীন পরিবেশ ও জীবন*, শায়খুল হাদিস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোছাইন।

৫. উইকিপিডিয়া (মুক্ত বিশ্বকোষ)-এর বিভিন্ন নিবন্ধ।

৪. চারদিক পানি দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূখণ্ডকে 'দ্বীপ' বলে; আর তিনদিক পানি দ্বারা বেষ্টিত ও একদিক স্থল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলে 'উপদ্বীপ'। আর দুই পাশে বৃহৎ স্থলভূমিবিশিষ্ট সংকীর্ণ যে জলপ্রবাহ দুটি নদী বা সাগরকে যুক্ত করে, তাকে 'প্রণালি' বলা হয়।

ইরাক ও শামের মরুভূমি অঞ্চলের মাঝে অস্পষ্ট। কতক ভূগোলবিশারদের মতে উত্তরে আরবের সীমা ফিলিস্তিন ও ট্রান্স জর্ডান পর্যন্ত, মতান্তরে আলেপ্পো ও ফুরাত নদী পর্যন্ত।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিশারদগণ আরবকে প্রসিদ্ধ পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন।[৫]

১. তিহামা : আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত সমতল ভূমি।

২. হিজায : উপদ্বীপের পশ্চিম অংশে অবস্থিত সারাত পর্বতমালা অধ্যুষিত অঞ্চল। হিজায অঞ্চল নজদের টিলাবিশিষ্ট অঞ্চলকে তিহামা হতে পৃথক করে রেখেছে।

৩. নজদ : আরব উপদ্বীপের মধ্যভাগে অবস্থিত বিস্তৃত টিলাবিশিষ্ট অঞ্চল। পশ্চিমে হিজায হতে পূর্বে দাহনা মরুভূমি পর্যন্ত এবং দক্ষিণে হাযান থেকে উত্তরে নাফুদ মরুভূমি পর্যন্ত নজদের বিস্তৃতি।

৪. আরূদ : আরব উপদ্বীপের পূর্ব অংশ।

৫. ইয়ামেন : আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ অংশ।

দিগন্ত-বিস্তৃত বালুকারাশি আরব উপদ্বীপের দৃশ্যমান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য। একমাত্র ব্যতিক্রম উপদ্বীপটির দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল, যেখানে রয়েছে দীর্ঘ পর্বতশ্রেণি। এ ছাড়াও হাররাতুশ শাম অঞ্চলে আছে আগ্নেয়গিরি-বিশিষ্ট এলাকা, যা উপদ্বীপটির উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে জর্ডান ও দক্ষিণ শামের দিকে বিস্তৃত। সীমিত পর্বতশ্রেণি ও উচ্চভূমি ব্যতিরেকে পুরো আরব ভূখণ্ডজুড়ে আছে মরু অঞ্চল ও মরুপ্রান্তর।

আরবে এমন কোনো নদী নেই, যা সারা বছর প্রবহমান থেকে সাগরে পতিত হয়। আবহমান কাল হতে নদীপ্রবাহের বদলে সাময়িক বৃষ্টির পানি চলাচলের জন্য রয়েছে পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য উপত্যকা। আরবিতে 'ওয়াদি' নামে খ্যাত এসব উপত্যকা সাধারণভাবে শুষ্ক নদী বা নদীগাত্রের মতো দেখায়। প্রবল বৃষ্টি হলে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ ধরে এগুলোতে বন্যার পানি প্রবাহিত হতে থাকে। বছরের অন্যান্য সময়

---

৫. আরব উপদ্বীপ : আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় আরব উপদ্বীপ সাতটি রাষ্ট্রে বিভক্ত—সৌদি আরব, ইয়ামেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার ও বাহরাইন।

উপত্যকাগুলো শুষ্ক থাকে। তবে এগুলোর তলদেশে পানির স্তর বিদ্যমান থাকে, যা বিভিন্ন গভীরতায় কূপ খননের মাধ্যমে পানি আহরণ করতে সাহায্য করে। হঠাৎ কোথাও পানির আর্দ্রতা ভূগর্ভ ছাপিয়ে উপচে পড়লে সেখানে দেখা মেলে একখণ্ড সবুজ মরূদ্যানের।

প্রাচীন কালে আরব

প্রাচীন আরবদের কোনো কোনো সম্প্রদায় জ্ঞানবিজ্ঞান, অর্থসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার মানদণ্ডে অত্যুচ্চ অবস্থানে উন্নীত হয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতার প্রচণ্ড অহমিকায় অন্ধ হয়ে যখন তারা মহান আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন এবং তারা কালের গর্ভে এমনভাবে হারিয়ে যায়, যেন কোনোদিন তাদের অস্তিত্বই ছিল না।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় আরবজাতিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. আল-আরাবুল বায়িদা বা প্রাচীনতম আরব। বনু কাহতানের বহু পূর্বেই তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে।

   আদ, ছামুদ, তস্‌ম, আমালিক প্রভৃতি ইতিহাসখ্যাত গোত্র আল-আরাবুল বায়িদার অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আদ ও ছামুদ জাতির উল্লেখ আছে। হজরত নুহ আ.-এর অব্যবহিত পরেই ছিল আদ ও ছামুদ জাতির রাজত্ব ও ধ্বংসকাল।

২. আল-আরাবুল আ'রিবা। বনু কাহতান নামেও পরিচিত। ইয়ামেন ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে দীর্ঘকাল বনু কাহতানের আধিপত্য ছিল।

৩. আল-আরাবুল মুসতা'রিবা। হজরত ইসমাইল আ.-এর বংশধর। তাদেরকে বনু ইসমাইল ও বনু আদনানও বলা হয়। হিজায ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলজুড়ে ছিল আল-আরাবুল মুসতা'রিবার বসবাস।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে বনু কাহতান এবং বনু ইসমাইলই ছিল আরবের মূল অধিবাসী। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইহুদিও আরব উপদ্বীপে বসবাস করত।

আওস, খাযরাজ, খুযাআ, গাসসান, দাওস, লাখম, তাই, জুহায়না, কাল্‌ব, আসলাম, তাগলিব ইত্যাদি গোত্র ছিল বনু কাহতানের শাখা। অপরদিকে কুরাইশ, হুযায়ল, কিনানা, মুযায়না, তামিম, আদি, সালাবা,

গাতফান, হাওয়াযিন, সুলায়ম, আবস, যুবইয়ান, ছাকিফ, বনু হিলাল প্রভৃতি ছিল বনু ইসমাইলের শাখা। আরবে বসবাসকারী ইহুদিদের প্রসিদ্ধ শাখা ছিল বনু কায়নুকা, বনু নযির, বনু কুরায়যা ইত্যাদি।

বনু কাহতান ও বনু ইসমাইল ইসলামপূর্ব বিভিন্ন যুগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্র গঠন করেছিল। এসব রাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সাবায়ি রাজ্য (যা পরবর্তী সময়ে হিময়ারি রাজ্য নামেও প্রসিদ্ধি লাভ করে), মায়িনি, নাবিতি, লাখমি, গাসসানি ও কিন্দি রাজ্য।

ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বে আরব ভূখণ্ড

ক. রাজনৈতিক পরিস্থিতি

খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ঐতিহাসিক আরিম প্লাবনে সাবায়ি রাজ্য চরম ভাঙনের শিকার হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সাবায়িদের পতন ঘটে এবং ইয়ামেন অঞ্চল চলে যায় হাবশিদের অধিকারে। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক বছর পূর্বে হাবশিরা ইয়ামেন থেকে বিতাড়িত হয় এবং ইয়ামেন চলে যায় পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্যের দখলে।

অপরদিকে ইরাকের হিরা নগরীকেন্দ্রিক লাখমি রাজ্য এ সময় পুরোপুরি সাসানি সাম্রাজ্য কর্তৃক প্রভাবিত ও আশ্রিত ছিল। গাসসানিরা ছিল রোমান খ্রিষ্টানদের আশ্রিত। ইসলামের আত্মপ্রকাশের বহু পূর্বেই লাখমি ও গাসসানিদের অতীত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লোপ পেয়েছিল।

খ. অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

আরব উপদ্বীপের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যেহেতু কোথাও ছিল মরুভূমি, আবার কোথাও মরূদ্যান, তাই আরবদেশের বাসিন্দারাও দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অধিকাংশ জনসাধারণ ছিল মরুচারী বেদুইন, অন্যরা ছিল মরুদ্যানকেন্দ্রিক বিভিন্ন নগর-জনপদের স্থায়ী বাসিন্দা। বেদুইনরা যাযাবর জীবন যাপন করত এবং পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করত। অপরদিকে বিভিন্ন জনপদের স্থায়ী বাসিন্দারা কৃষিকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। পশুপালনের ক্ষেত্রে উট, ছাগল ও ভেড়াই ছিল প্রধান, তবে কোনো কোনো এলাকায় ঘোড়াপালনও জনপ্রিয় ছিল। কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে প্রধান ফসল ছিল খেজুর। এর পাশাপাশি সীমিত পরিসরে গম, ধান ও ভুট্টার চাষ হতো।

বেদুইন-জীবনের অন্যতম অবলম্বন ছিল উট। দীর্ঘদিন পানি পান না করে, লতাপাতা বা কাঁটাগাছ খেয়ে এবং কিছু না পেলে খেজুর-বিচি চিবিয়ে জীবনধারণের সক্ষমতাই উটকে মরুজীবনের অপরিহার্য বাহনরূপে উপযুক্ত করে তুলেছিল। অপরদিকে উষ্ণ মরুতে সহজে বর্ধিত হয় বলে মরূদ্যানবাসীর প্রধান সম্পদ ছিল খেজুর। খেজুর আরবদের কেবল খাদ্যপ্রয়োজনই পূরণ করত না; ঘর, বিছানা ও বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরিতে খেজুর গাছের কাণ্ড, ডাল-পাতা ইত্যাদি ব্যবহৃত হতো। যাযাবর জীবনে যেমন সম্পদের পরিমাণ পোষ্য পশুর সংখ্যা দ্বারা নির্ণীত হতো, স্থায়ী বাসিন্দাদের সম্পদ-পরিমাণ তেমনই নির্ণয় করা হতো খেজুর গাছের সংখ্যা অনুপাতে।

পানির স্বল্পতার কারণে আরব উপদ্বীপে কৃষিকর্মের সুযোগ যেহেতু নগণ্য, তাই আরববাসীর জীবিকা উপার্জনের অন্যতম প্রধান অবলম্বন ছিল ব্যবসাবাণিজ্য। যেহেতু আরব উপদ্বীপের অবস্থান ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে, তাই পূর্ব-পশ্চিমের বাণিজ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে আরব অন্যতম প্রধান সংযোগ সড়ক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। আরবের এসব পথের নানা বিন্দুতে গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন নগর-জনপদ।

গ. সামাজিক পরিস্থিতি

সমকালীন আরবের সামাজিক পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। বাধাহীন অনাচার, অত্যাচার, আত্মকলহ, ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি এবং হানাহানি-রক্তপাত ছিল তৎকালীন আরবসমাজের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। গোত্রে গোত্রে শত্রুতা, ক্ষতিসাধনের চেষ্টা এবং মারামারি-কাটাকাটি ছিল নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়।

তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে গোত্রে গোত্রে লড়াই শুরু হতো এবং বছরের পর বছর বরং কয়েক দশক ধরে তা অব্যাহত থাকত। মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তি তার আত্মীয়স্বজনকে একটা অসিয়তই করে যেত—প্রতিশোধ। প্রতিটি শিশু বাল্যকাল থেকেই প্রতিশোধ গ্রহণের জিঘাংসা লালন করে বেড়ে উঠত।

চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই-রাহাজানিও ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। এক গোত্র অপর গোত্রের ধনসম্পদ, গৃহপালিত পশু এমনকি স্ত্রী-কন্যা পর্যন্ত লুট করত এবং নারী ও শিশুদেরকে পণ্যরূপে বিক্রি করে দিত।

সমসাময়িক আরবসমাজে নারী অধিকার বলে কিছু ছিল না। নারীদেরকে পণ্য ও সম্ভোগের বস্তুর চেয়ে অধিক কিছু মনে করা হতো না। মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে নারীরা কিছু লাভ করত না। যুদ্ধ শেষে বিজয়ী পক্ষ বিজিত পক্ষের নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার চালাত। বিয়ের কোনো নিয়ন্ত্রিত সংখ্যা ছিল না। যার যত ইচ্ছা বিয়ে করতে পারত। পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাগণ পুত্রের পত্নীতে পরিণত হতো! ঋতুকালে নারীরা অস্পৃশ্য হয়ে যেত। বিধবা হলে মলিন জীর্ণ বসনে একটি সংকীর্ণ অন্ধকার কক্ষে পুরো এক বছর আবদ্ধ থাকতে হতো।

নারীদের প্রতি এই লাঞ্ছনাকর আচরণের কারণে আরবসমাজে কন্যাসন্তানকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। কারও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে পুরো বংশের কলঙ্ক মনে করা হতো। কন্যাসন্তানের পিতার মস্তক লজ্জায় অবনত হয়ে যেত। পবিত্র কুরআনে সেই বর্বর যুগের চরম নিকৃষ্ট মানসিকতাকে এভাবে চিত্রিত করা হয়েছে—

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾

> যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান (জন্মগ্রহণ)-এর সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে দুঃখ-ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সে একে মন্দ ভেবে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায়, (এবং ভাবতে থাকে) অপমান সয়ে তাকে নিজের কাছেই রেখে দেবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে? [সুরা নাহল : ৫৮-৫৯]

এই কলঙ্কজনক অনুভূতি থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য একসময় শুরু হয় কন্যাসন্তানকে জীবিত প্রোথিত করার চরম গর্হিত প্রথা। কায়স বিন আসিম নামক জনৈক ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করার পর নবীজির খেদমতে হাজির হয়ে বলেছিল, 'আমি নিজ হাতে আমার আটটি মেয়েকে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়েছি।'[৬]

---

৬. ইবনে কাছির দিমাশকি, *তাফসিরুল কুরআনিল আজিম*, সুরা তাকভির।

নির্লজ্জতা আরবসমাজে সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। ব্যভিচার ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। নারী-পুরুষ কেউই জনসম্মুখে বিবস্ত্র হতে সামান্য দ্বিধা করত না। এমনকি কুরাইশ বংশ ব্যতীত অন্যরা সম্পূর্ণ দিগম্বর হয়ে কাবাঘর তাওয়াফ করত।

বাছবিচার না করে খাদ্য-অখাদ্য-কুখাদ্য সবই ভক্ষণ করা হতো। কীট-পতঙ্গ, হিংস্র ও সরীসৃপ প্রাণী, শূকর, মৃত জন্তু ইত্যাদিও আরবদের সাধারণ খাদ্যতালিকায় স্থান পেত। এমনকি জীবিত প্রাণীর দেহের বিভিন্ন অংশও কেটে আহার্য হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

মদ হলো সকল প্রকার পাপ ও অন্যায়ের চাবিকাঠি। অথচ আরবে মদ ছিল আভিজাত্য ও কৌলীন্যের প্রতীক! ঘরে ঘরে আড্ডা জমিয়ে মদপান করা হতো। মাতালদের উন্মাদনায় সংঘটিত হতো নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার হাজারো দুর্ঘটনা। প্রসিদ্ধ প্রবাদ ছিল—আরবরা মদ পান করে না; মদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়! মদ ও মদের আসর নিয়ে কবিরা কবিতা রচনা করত এবং সগৌরবে আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা কুড়াত।

মদের ন্যায় আরবের ঘরে ঘরে জুয়ার প্রচলন ছিল। ব্যাপক প্রচলন ছিল সুদেরও। সম্পদশালী লোকেরা সুদের কারবার করত আর তাদের চক্রবৃদ্ধির ফাঁদে পড়ে দরিদ্ররা সর্বশান্ত হতো। আরবসমাজে আরও ছিল গণক-জ্যোতিষী ও ভবিষ্যদ্বক্তাদের জমজমাট ব্যবসা। জ্যোতিষীরা ভাগ্যগণনা করত, আগামীর বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করত এবং ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেবতার উপাসনা বা ভোগ প্রদানের পরামর্শ দিত।

ঘ. ধর্মীয় পরিস্থিতি

হজরত ইবরাহিম আ.-এর মাধ্যমে আরব ভূখণ্ডে একত্ববাদের বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর থেকে আরবরা একত্ববাদ ও এক আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিল। তবে কালের পরিক্রমায় একসময় তাদের মাঝে বহুত্ববাদের উৎপত্তি ঘটে। তাদের মাঝে এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আসন গেড়ে বসে যে, আল্লাহ তাআলা আসমান জমিন সৃষ্টি করে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং পার্থিব সকল বিষয়ের দায়িত্বভার ছোট ছোট উপাস্যদের হাতে ন্যস্ত করেছেন। মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন এসব উপাস্যই পূর্ণ করে। সুতরাং নিজেদের প্রয়োজন পূরণে সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে তাদের

উপাসনাই বেশি করে করা প্রয়োজন। এজন্য আরবরা কাল্পনিক বিভিন্ন উপাস্যের উপাসনা করত, তাদের নামে নজরানা পেশ করত এবং নিজেদের অভাব-অভিযোগ তাদের কাছেই নিবেদন করত। তারা বলত—

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾

আমরা তাদের উপাসনা কেবল এজন্য করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে। [সুরা যুমার : ০৩]

কালক্রমে তারা কাল্পনিক উপাস্যদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা শুরু করে। ক্রমান্বয়ে অলীক দেবতার পূজা এত ব্যাপক হয়ে পড়ে যে, কোথাও একটি সুন্দর পাথর পাওয়া গেলে তা উঠিয়ে নিয়ে পূজা করা শুরু হতো। কিছুদিন পর আরও সুন্দর কোনো পাথর পাওয়া গেলে আগেরটি ফেলে শুরু হতো 'নতুন উপাস্যে'র বন্দনা।

আমর খুযাই নামক জনৈক ব্যক্তি বনু জুরহামকে পরাস্ত করে কাবার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পবিত্র কাবাঘরের অভ্যন্তরেই মূর্তি স্থাপন করে। এরপর একত্ববাদের প্রতীক কাবাঘরেই শুরু হয় মূর্তিপূজার অনাচার।

মূর্তিপূজার পাশাপাশি আরবসমাজে ছিল নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ছড়াছড়ি। বিভিন্ন দিনকে শুভ-অশুভ গণ্য করা, বিশেষ ধরনের পশুকে সম্মানিত ও হারাম মনে করা, গণক ও জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণীকে বিশ্বাস করে তাদের নির্দেশে দেবতার সামনে ভোগ পেশ করা ইত্যাদি কুসংস্কার আরবসমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

সারকথা, নৈতিক-সামাজিক ও ধর্মীয় বিচারে আরব উপদ্বীপ তখন অবক্ষয়ের সর্বনিম্ন স্তরে উপনীত হয়েছিল এবং চূড়ান্ত পতনের প্রহর গুনছিল।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলামপূর্ব অবশিষ্ট বিশ্ব

পেছনের পৃষ্ঠাগুলোতে তৎকালীন আরব উপদ্বীপের সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের যে চিত্র তুলে ধরা হলো, বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতি তার চেয়ে মোটেও উন্নত ছিল না। নবীজির আবির্ভাবকালে সারা বিশ্ব কুসংস্কারের ঘোর ঘনঘটায় নিমজ্জিত ছিল। পারস্য, শাম, মিশর, ভারতবর্ষ ও চীনসহ সভ্য পৃথিবীর সর্বত্রই সত্যের আলো নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। ধর্মযাজকদের হাতে তাওরাত, যবুর, ইঞ্জিল ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ বিকৃত হয়ে একত্ববাদের শিক্ষা পৃথিবীতে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। আল্লাহর নবী ঈসা আ.-এর আনীত একত্ববাদ পরিণত হয়েছিল ত্রিত্ববাদবিশিষ্ট খ্রিষ্টধর্মে।

সত্য, ন্যায় ও সুবিচার, নীতি-নৈতিকতা রক্ষা ইত্যাদি বিষয় মানবসমাজ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। মানুষ আপন স্রষ্টাকে ভুলে সৃষ্টির সামনে মাথা নত করত এবং সৃষ্টির কাছেই নিজের প্রয়োজন খুঁজে ফিরত। প্রতিমাপূজা, নক্ষত্রপূজা, প্রেতপূজা, জড়পূজা, ধর্মযাজক ও পুরোহিতদের পূজা এবং প্রকৃতিপূজাই ছিল সেকালের ধর্ম। ব্যক্তিজীবন হতে রাষ্ট্রীয় জীবন—জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই ছিল না কোনো ধরনের নীতি ও শৃঙ্খলা। অনাচার, অবিচার, অত্যাচার ও ব্যভিচারে আক্রান্ত ছিল পুরো বিশ্বসমাজ।

সাসানি সাম্রাজ্য

তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী দুই সাম্রাজ্যের একটি ছিল পারস্যকেন্দ্রিক সাসানি সাম্রাজ্য। পারস্য এককালে যদিও সভ্যতার অত্যুচ্চ শিখরে উন্নীত হয়েছিল; কিন্তু নবীজির আবির্ভাবের দেড়শ বছর পূর্ব থেকেই সাসানি সাম্রাজ্যে শুরু হয় অবনতির উল্টো স্রোত। অনেক আগেই পারসিকরা গ্রহ-নক্ষত্রের পূজা পরিত্যাগ করে ধর্ম হিসেবে জরথুস্ত্রবাদ (অগ্নিপূজা) গ্রহণ করেছিল। ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্বে

পারস্যে 'মানি' নামক জনৈক ধর্মপ্রচারক জরথুস্ত্রবাদ ও খ্রিষ্টধর্মের মিশ্রণে এক অভিনব ধর্মের প্রচার শুরু করে।

পারসিক সমাজে নীতি-নৈতিকতা এতটা নিম্নগামী অবস্থানে উপনীত হয়েছিল যে, পিতা নিজ কন্যাকে এবং ভাই আপন বোনকে নির্দ্বিধায় বিয়ে করত। সাধারণ প্রজারা সম্রাট (কিসরা) ও রাজপ্রতিনিধিদের প্রণাম করত। রাজদরবারে কোনো প্রজা বসতে বা কথা বলতে পারত না। সাসানি-রোমান ঐতিহ্যবাহী সংঘাত ও যুদ্ধের কারণে রাজ্যজুড়ে সব সময় অশান্তি বিরাজ করত। কোনো এলাকা রোমানদের দখলে চলে গেলে রাতারাতি অগ্নিপূজার মন্দির গির্জায় পরিণত হতো, বিপরীতে রোমানদের কোনো অঞ্চল সাসানিদের দখলে এলে গির্জা পরিণত হতো মন্দিরে।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পারস্যে এক নতুন ধর্মীয় দর্শন জনপ্রিয়তা লাভ করে—'নারী ও ধনসম্পদ কারও ব্যক্তিগত অধিকার নয়; বরং প্রতিটি নারী ও সকল সম্পদে সকলের সমভাবে ভোগের অধিকার রয়েছে।' ইতর শ্রেণির লোকেরা সোৎসাহে এই নীতি গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীকালে রাজদরবার কর্তৃক স্বীকৃত হয়ে এই বিকৃত দর্শন পরিণত হয় সাসানি সাম্রাজ্যের রাজকীয় নীতিতে। সাম্রাজ্যজুড়ে ভোগবিলাস ও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থের এক উন্মত্ত ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়। ৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নওশেরওয়া সম্রাট হওয়ার পর এই কুপ্রথা রহিত করেন এবং জরথুস্ত্রবাদকে (Zoroastrianism) রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

রোমান সাম্রাজ্য

গ্রিকদের পতনের পর দীর্ঘদিন রোমান সাম্রাজ্যই ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ শক্তি। আল্লাহর নবী হজরত ঈসা আ. রোমান সাম্রাজ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের পরিস্থিতিও সাসানি সাম্রাজ্যের চেয়ে কোনো দিক থেকে উন্নত ছিল না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হজরত ঈসা আ.-কে উঠিয়ে নেওয়ার পর তার শিষ্যদের মধ্যে আত্মকলহ শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে সেন্ট পল নামক জনৈক ইহুদি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করে সমকালীন খ্রিষ্টানসমাজের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং বিভিন্ন মনগড়া মতাদর্শ খ্রিষ্টধর্মে যুক্ত করে

চিরতরে এই পবিত্র ধর্মের বিনাশ সাধন করে। তার কূট চক্রান্তে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠাকারী খ্রিষ্টধর্ম পরিণত হয় ত্রিত্ববাদ প্রচারকারী অসার ধর্মে। আল্লাহর রাসুল হজরত ঈসা আ. পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন মূর্তিপূজা ও পৌত্তলিকতার মূলোৎপাটন করতে; কিন্তু এবার তার অনুসারীরাই শুরু করে মূর্তিপূজা। ঈসা আ. ও তার জননীর মূর্তি তৈরি করে গির্জার অভ্যন্তরে শুরু হয় প্রতিমার আরাধনা।

চতুর্থ শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্য পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি সম্রাট কনস্টান্টাইন (Constantine the Great) রাজনৈতিক স্বার্থে সাম্রাজ্যের সাধারণ মানুষের গণধর্ম খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তার পৃষ্ঠপোষকতায় এবার ত্রিত্ববাদ ও পৌত্তলিকতাপূর্ণ খ্রিষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয়।

অপরদিকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যে 'হলি রোমান অ্যাম্পায়ার' নামে স্বতন্ত্র খ্রিষ্টজগৎ অস্তিত্ব লাভ করে। রোমের পোপ লাভ করেন ধর্মসংক্রান্ত যাবতীয় অপরাধের বিচারিক ক্ষমতা। ফলে লোভনীয় পোপ পদ নিয়ে শুরু হয় হানাহানি-সংঘাত। পোপ ও পাদরিরা নিজ নিজ অঞ্চলে সাধারণ খ্রিষ্টান জনগণের উপাস্যে পরিণত হয়। ধর্মযাজকরা ঘোষণা করে, 'স্বর্গের চাবি আমাদের হাতে। যথেচ্ছা পাপ করো; এরপর আমাদের কাছ থেকে ক্ষমা ও স্বর্গপ্রাপ্তির স্বীকৃতি নিয়ে যাও।' তাদের এই ঘোষণার ফলে খ্রিষ্টজগতে অন্যায়-অপরাধ এবং পাপ ও দুর্নীতির যে অবাধ স্রোত প্রবাহিত হয়, ইতিহাসে তার তুলনা নেই। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾

তারা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের ধর্মগুরু ও সন্ন্যাসীদের প্রতিপালক বানিয়ে নিয়েছে এবং মাসিহ বিন মরিয়মকেও।

[সুরা তাওবা : ৩১]

নিঃসন্দেহে আল্লাহর নবী ঈসা আ.-ও যদি তখন পুনরাগমন করতেন, এই খ্রিষ্টধর্মকে চিনতে পারতেন না এবং কিছুতেই এর সঙ্গে নিজের সম্পৃক্তি স্বীকার করতেন না।

ভারতবর্ষ

সুপ্রাচীন সভ্যতার গৌরবময় ঐতিহ্যের অধিকারী ভারতবর্ষের অবস্থাও তখন অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভারতবর্ষেও ছিল বহু দেবদেবীর উপাসনা ও পূজা-অর্চনা। বরং এ ক্ষত্রে ভারতবাসী ছিল অন্যদের চেয়ে এককাঠি সরেস! কালের পরিক্রমায় ভারতবর্ষে উপাস্য ও দেবতার সংখ্যা পৌঁছেছিল তেত্রিশ কোটিতে! ঝড়বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ, উষা-রজনী, নদী-পর্বত, গাভি-অশ্ব, পাখি-সাপ, অস্ত্র-পাথর কোনো বস্তুই উপাস্যের তালিকার বাইরে ছিল না।

ভারতবর্ষের সামাজিক অবক্ষয়ের আরেকটি নিদর্শন হলো জাতপ্রথা ও শ্রেণিবিভাজন। একই ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানবসমাজকে বিভক্ত করা হয়েছিল উচ্চ শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণিতে। সামাজিক এই বিভাজনের প্রভাব ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে। উচ্চ শ্রেণির কেউ যত বড় অপরাধই করুক, তার কোনো শাস্তি হতো না। অপরদিকে নিম্ন শ্রেণির মানুষকে লঘু অপরাধে প্রদান করা হতো গুরুদণ্ড। নিম্ন শ্রেণিকে অস্পৃশ্য গণ্য করা হতো এবং তাদের ছোঁয়া লাগলে বস্তুকে অপবিত্র মনে করা হতো। নারীদেরকে দাসী গণ্য করা হতো। কোনো পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীকে বরণ করতে হতো স্বেচ্ছামৃত্যু।

চীন, তুর্কিস্তান, আবিসিনিয়া ও অন্যান্য সাম্রাজ্যের পরিস্থিতিও সাসানি সাম্রাজ্য, রোমান সাম্রাজ্য বা ভারতবর্ষের চেয়ে ভিন্নতর কিছু ছিল না।

ইহুদিসমাজ

তৎকালে পুরো পৃথিবীতে ইহুদিদের স্বতন্ত্র কোনো রাষ্ট্র ছিল না। আরব উপদ্বীপের মদিনা ও খায়বার অঞ্চলে কিছু ইহুদি বসবাস করত। এর বাইরে রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু ইহুদির অস্তিত্ব ছিল।

নিষ্ঠুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতা ছিল ইহুদিদের প্রধান চরিত্র-বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি তারা ছিল চরম পর্যায়ের হিংস্র। ইহুদিরাই নাজরানের খ্রিষ্টানদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিল।

ধর্মজ্ঞানে পারদর্শী ইহুদি বুদ্ধিজীবীরা ধনবান ব্যক্তিদের মনস্তুষ্টির জন্য ধর্মীয় বিধানে যথেচ্ছ সংযোজন-বিয়োজন করত। তাদের স্বেচ্ছাচারিতায় ইহুদিধর্ম তখন ধর্মগুরুদের স্বার্থসিদ্ধির মাধ্যমে পরিণত হয়েছিল।

আচরণগত অবক্ষয়ের কারণে পৃথিবীবাসীর কাছে ইহুদিরা পরিণত হয়েছিল নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত এক জাতিতে।

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ﴾

আর তাদের (ইহুদিদের) ওপর লাঞ্ছনা ও অসহায়ত্বের ছাপ মেরে দেওয়া হলো এবং তারা আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরল।

[সুরা বাকারা : ৬১]

সমকালীন বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী ও প্রতাপশালী সাম্রাজ্যগুলোর অবস্থা যখন এই, তখন ছোট ছোট রাজ্য ও জনপদগুলোর পরিস্থিতি যে কতটা নিম্নগামী ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। ধরণিজুড়ে কোথাও ছিল না সত্য ও বিশ্বাসের আলো, পৃথিবী নিমজ্জিত ছিল অন্যায় ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে। অবক্ষয়ের চরম প্রান্তে উপনীত সেই কালের নামই হয়ে গিয়েছিল 'আল-আইয়ামুল জাহিলিয়া' বা মূর্খতা ও অন্ধকারের যুগ।

মানবতা যেন সহ্যের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে দয়াময় আল্লাহর কুদরতি করুণার প্রত্যাশায় প্রহর গুনছিল। সকলের প্রত্যাশা ছিল নিকষ কালো আঁধার চিরে নতুন সূর্যোদয়ের, মানবতার ভাগ্যাকাশে নতুন এক ভাগ্যতারা উদয়ের।

পৃথিবীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত ও শাশ্বত রীতি হলো—প্রতিটি আঁধার রাতের শেষেই আসে সুহাসিনী ভোর। রাত যত গভীর হয়, ভোরের আগমনধ্বনি তত নিকটবর্তী হয়। আর তাই মূর্খতার তমশাচ্ছন্ন ধরণিতেই নিকষ আঁধার ভেদ করে সত্যের আলো ছড়াতে উদয় হয়েছিল ন্যায় ও কল্যাণের মহাসূর্যের; পুণ্যের পথ দেখাতে আগমন ঘটেছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবের।

তার পরিচয়?! তিনি ইমামুল মুরসালিন, নবী-রাসুলগণের ইমাম; রহমাতুল্লিল আলামিন, বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রহমত; সাইয়িদুল কাওনাইন, উভয় জাহানের নেতা; শাফিউল মুযনিবিন, কিয়ামত-দিবসে পাপী-তাপীদের জন্য সুপারিশকারী; বাদরুদ-দুজা, আঁধার রাতের শশী; শামসুদ-দুহা, পূর্বাহ্নের দিবাকর।

তিনি...!

কত নামে কত অভিধায় তাকে ভূষিত করা হয়েছে! তবু যেন ভক্তকুলের আশ মেটে না! কত বর্ণে কত ছন্দে তার চরিত্র-মাধুরী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে! তবু যেন কবি-সাহিত্যিকদের ভাষা ফুরায় না! হাজারো ভাষায় কোটি জবানে নিযুত কলমে তার সিরাত ও জীবনেতিহাস চর্চা করা হয়েছে! তবু তাকে নিয়ে আলোচনা শেষ হয় না!

কত গবেষক-জীবনীকারক তার কর্ম ও কীর্তি নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন! তবু তার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের বিবরণ সমাপ্ত হয় না! তার প্রতিটি আচরণ ও প্রতিটি উচ্চারণ নিয়ে কত শতজন দিবানিশি গবেষণা করেছেন! উপলব্ধি ও অর্জনের অনিঃশেষ ধারা তবুও গতি হারায় না!

সেই মহামানবের সিরাত ও জীবনালোচনা দিয়েই তাই শুরু হতে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাস—*ইসলামি ইতিহাস*।

* * *

প্রথম অধ্যায়

সিরাতুন নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

কেন আরব উপদ্বীপে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব থেকে নবুওয়ত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওয়ত থেকে হিজরত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হিজরত থেকে ওফাত

﴿وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ﴾

(হে নবী!) আমি আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল রহমত করে প্রেরণ করেছি। [সুরা আম্বিয়া : ১০৭]

কেন আরব উপদ্বীপে!

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার শেষ নবী ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুলকে কেন আরব উপদ্বীপের মক্কা নগরীতে প্রেরণ করলেন? কেন তিনি আবির্ভূত হলেন না সে যুগের পরাক্রমশালী শক্তি পারস্য কিংবা রোমান সাম্রাজ্যে? কেন আত্মপ্রকাশ করলেন না সভ্যতার প্রাচীন ভূমি ভারতবর্ষে, ইরাকে কিংবা মিশরে? কেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব জন্মগ্রহণ করলেন অখ্যাত-অজ্ঞাত আরবভূমিতে?

এ কি খেয়ালি কোনো সিদ্ধান্ত?! নিছক দৈবচয়ন?! নাকি এতেও লুকিয়ে আছে রাব্বুল আলামিনের অসীম প্রজ্ঞার কোনো নিদর্শন?

মহাপ্রজ্ঞাময় সত্তা যিনি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার স্রষ্টা যিনি, তার কোনো সিদ্ধান্ত কি হতে পারে খেয়ালি বা আকস্মিক? কক্ষনো নয়। বরং এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, এই ঐশী নির্বাচনের পেছনেও নিহিত ছিল মহান সত্তার মহাপ্রজ্ঞার নানা নিদর্শন। বস্তুত আরব ভূখণ্ড ও আরবজাতির মাঝেই তিনি রেখেছিলেন এমন কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব, যার কারণে আরবজাতি ও আরব উপদ্বীপ লাভ করেছিল রাব্বে কারিমের অসীম করুণা; যে নুরের রোশনিতে আলোকিত হয়েছিল গোটা পৃথিবী, আরব দিগন্তেই ঘটেছিল তার প্রথম উদ্ভাস।

১. স্বভাব স্বচ্ছতা, হৃদয় নির্মলতা

যদিও আক্ষরিক জ্ঞানের বিচারে আরবরা ছিল তদানীন্তন পৃথিবীর অন্যতম পশ্চাৎপদ জাতি; কিন্তু আল্লাহ তাআলা আরবদের দান করেছিলেন স্বচ্ছ ও নির্মল হৃদয়জগৎ। আগে থেকে তাদের হৃদয়পটে এমন কোনো চিত্র অঙ্কিত ছিল না, যা মুছে ফেলে নতুন কোনো চিত্র অঙ্কন করা কঠিন হতো। বিপরীতে রোমান, পারসিক বা ভারতীয়দের ছিল জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্পকলার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সমৃদ্ধ সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরব। তাদের হৃদয়জগৎ আচ্ছন্ন ছিল এমন সুকঠিন মানসিক ও চিন্তাগত নানা

জটিলতায়, আপাতদৃষ্টিতে যা দূর করা ছিল অত্যন্ত কঠিন। এভাবেও বলা যায় যে, আরবরা ছিল 'নির্ভেজাল মূর্খতা'র শিকার, যার প্রতিকারবিধান সহজ ছিল; অপরদিকে অন্যান্য সুসভ্য জাতিগোষ্ঠী ছিল 'মিশ্রিত ও ভেজাল মূর্খতা'র শিকার, যার চিকিৎসা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও কষ্টসাধ্য।

ইতিহাস সাক্ষী, স্বচ্ছ-নির্মল হৃদয়ের অধিকারী আরবদের সামনে যখন ইসলাম নামক অমিয় সুধার পেয়ালাটি তুলে ধরা হয়েছিল, তারা তখন তা নিঃসংকোচে আকণ্ঠ পান করে ধন্য হয়েছিল আর সুসভ্য পারসিক ও রোমানরা জটিল মানসিক টানাপোড়েনের শিকার হয়ে সে পানপাত্র হেলায় ছুড়ে ফেলেছিল।

২. সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, প্রবাদতুল্য বীরত্ব

আরবরা ছিল আপন প্রকৃতিতে সমুজ্জ্বল, ইস্পাতকঠিন সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং সহজাত বীরত্ব ও রণকুশলতার অধিকারী। কোনো হক কথা যদি তাদের উপলব্ধিতে ধরা দিত, তাহলে তারা তা বাস্তবায়নে ব্রতী হতো এবং বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলায় তরবারি তুলে নিতে সামান্য দ্বিধা করত না। সত্য ও সুন্দর যখন তাদের হৃদয়জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করত, তখন তারা তা মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নিত এবং প্রয়োজনে তার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও এতটুকু ইতস্তত করত না। আরবজাতির বীরত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। জীবনবাজি রেখে লড়াই করা ছিল তাদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। আরবরা ছিল বাস্তবতাপ্রিয়, মননশীল, স্পষ্টভাষী ও কষ্টসহিষ্ণু। পাশাপাশি তাদের অন্তরে ছিল কর্ম সম্পাদনের অদম্য প্রেরণা।

বিপরীতে রোম, পারস্য ও ভারতবর্ষের জনগণ ছিল যুগ-স্রোতে ভেসে যাওয়ায় এবং হাওয়ার অনুকূলে পাল তোলায় অভ্যস্ত। সমাজে চলমান জুলুম ও বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আন্দোলন সৃষ্টির স্পৃহা ও সক্ষমতা তাদের মাঝে ছিল না। তাদের জীবন ছিল আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসনির্ভর, কষ্ট সহ্য করা তাদের ধাতে ছিল না।

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, কোনো জাতি যদি পৃথিবীতে কৃতিত্বপূর্ণ কোনো অবদান রচনা করতে চায় এবং জগৎজুড়ে সংস্কার ও পরিবর্তন সাধন করতে চায়, তাহলে সহজ-সরল জীবনধারা, কঠোর সহ্য ও প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং রণাঙ্গনে জীবনবাজি রেখে লড়াই করার যোগ্যতা তাদের জন্য অপরিহার্য শর্ত।

এজন্যই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই আরবরা স্রোতের প্রতিকূলে কেবল রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য নয়, পুরো অবিশ্বাসী পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পেরেছিল এবং স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জগৎজুড়ে ইসলামের ঝান্ডা সমুন্নত করেছিল।

৩. মুক্ত চিন্তা, স্বাধীন চেতনা

সৃষ্টির আদি যুগ থেকে কখনোই আরবজাতি কোনো বিদেশি শক্তির সামনে মাথা অবনত করেনি, পরাধীনতা স্বীকার করেনি। বিশেষ করে ইসমাইলি আরবগণের আবাসভূমি উত্তর আরব চিরদিনই স্বাধীন থেকেছে। নিয়মতান্ত্রিক কোনো রাজা বা রাজ্য মক্কায় ছিল না। দীর্ঘকাল ধরে সেখানে বহাল ছিল আন্তঃগোত্রীয় ব্যবস্থা। একজন সকলের ওপর প্রভুত্বের ছড়ি ঘোরাবে এবং সবার সঙ্গে প্রভুসুলভ আচরণ করবে, এমন সংস্কৃতির সঙ্গে আরবরা মোটেও পরিচিত ছিল না। বিপরীতে আরবভূখণ্ডের নিকট প্রতিবেশী পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের চিত্র ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে কিসরা ও কায়সারকে অতিমানব বরং উপাস্য মনে করা হতো। সম্রাটের সামনে এমনকি মঙ্গলবাক্য উচ্চারণ করার সাহসও কারও হতো না। মুক্ত চিন্তা ও মতামত প্রকাশের কথা এসব সাম্রাজ্যে কল্পনাও করা যেত না।

ইসলামপূর্ব যুগে জনৈক আরব একবার কিসরার দরবারে উপস্থিত হয়েছিল। তখন দরবারে উপস্থিত জনৈক পারসিক রাজপ্রতিনিধি তাকে কটূক্তি করে বলল, 'তোমরা আরবরা হিংস্র ও যাযাবর জাতি। অতি তুচ্ছ ও সামান্য বিষয়েও তোমরা মারামারি ও রক্তারক্তি কাণ্ড শুরু করে দাও।' তখন সেই আরব দীপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলো, 'জনাব, সুবিশাল পারস্য সাম্রাজ্যে কোটি কোটি মানুষের মধ্য হতে মাত্র একজন মানুষ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য। ঠিক একই পরিস্থিতি বিশাল রোমান সাম্রাজ্যেও। তারপরও দেখুন, মাত্র দুজন যোগ্য মানুষকে কেন্দ্র করে উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যে কত হানাহানি, লড়াই-বিগ্রহ! এ কারণে তাদেরকে নিশ্চয়ই আপনি হিংস্র ও যাযাবর বলবেন না। বিপরীতে আরবের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর প্রত্যেকেই বীরত্ব ও সাহসিকতায়, শক্তি ও রণকুশলতায় এবং পরিচিতি ও বংশমর্যাদায় একেকটি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট হওয়ার যোগ্য। অথচ রাজমুকুট, সিংহাসন, রাজ্য কিছুই তাদের

নেই। তাহলে তাদের মধ্যে যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে থাকে, তাতে বিচিত্র কী? এজন্য কি তাদের হিংস্র ও যাযাবর আখ্যায়িত করা যায়?'

আরবদের এই স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণেই বাবেলের অত্যাচারী শাসক বুখতে নাসার বনি ইসরাইলকে ধ্বংস করলেও আরবের দিকে চোখ তুলে তাকানোর সাহস করেননি। প্রথমে গ্রিক ও পরবর্তীকালে রোমানগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী মিশর হতে ইরাকের সীমান্ত পর্যন্ত সুবিশাল অঞ্চল শাসন করলেও পার্শ্ববর্তী আরব ভূখণ্ডে ভুলেও পা রাখেনি। সাসানি ও রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ একে অপরের ভূখণ্ড জয় করার জন্য উন্মত্ত লড়াইয়ে [illegible]পয়ে পড়লেও অরক্ষিত ও উন্মুক্ত আরবভূখণ্ড জয় করার চিন্তা করেনি।

৪. অত্যুচ্চ বংশমর্যাদা, চারিত্রিক উদারতা

আরবজাতির বংশকৌলীন্য ছিল সর্বজনস্বীকৃত। প্রখর মেধার অধিকারী আরবরা বংশানুক্রমে নিজেদের বংশধারা, গোত্রমূল, শাখাপ্রশাখা ইত্যাদির পরিচয় প্রামাণিকভাবে সংরক্ষণ করত। আর তাই আরবজাতির বংশপরিচয় ছিল স্বচ্ছ ও সুবিদিত। আরবদের মধ্যে কুরাইশরা ছিল সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত বংশপরিচয়ের অধিকারী। আল্লাহর নবী ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ.-এর সরাসরি বংশধর হওয়ায় আরবজুড়ে তাদের ছিল স্বীকৃত গ্রহণযোগ্যতা। পাশাপাশি অতিথিসেবা, প্রতিবেশীর প্রয়োজনে ত্যাগ ও কোরবানির মানসিকতা ছিল আরবদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য। এককথায়, সারা বিশ্বকে সত্য ও ন্যায়ের পথে নেতৃত্ব প্রদানের মতো পরিচিতি ও উদারতা আরবজাতির মধ্যে ছিল।

৫. ভৌগোলিক অবস্থান, বাইতুল্লাহর উপস্থিতি

আরব উপদ্বীপ এশিয়া মহাদেশের অংশ হলেও এর অবস্থান আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের সন্নিকটে। আরবভূখণ্ড ছিল তিনটি মহাদেশের মিলনকেন্দ্র। আরব থেকে স্থলপথে ইরাক, পারস্য, তুর্কিস্তান, খোরাসান ও কাবুল হয়ে সুদূর ভারতবর্ষে পৌঁছা যেত। অপরদিকে শাম হয়ে যাওয়া যেত মিশর, মাগরিব ও আন্দালুসের সীমানায়। জলপথেও আরব থেকে আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশের বিভিন্ন জনপদে যাতায়াত করা যেত। আন্তর্জাতিক রেখায় অবস্থানের এই স্বাতন্ত্র্যের কারণেই আরব বিনা প্রশ্নে

এমন এক বিশ্বজনীন দাওয়াত ও আন্দোলনের কেন্দ্র হওয়ার উপযুক্ত ছিল, যেখান থেকে সারা পৃথিবীতে ন্যায় ও কল্যাণের বার্তা প্রচার করা যাবে।

আরব উপদ্বীপে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণের আরেকটি রহস্য হলো এই ভূখণ্ডে পবিত্র কাবাঘরের অস্তিত্ব। আল্লাহর নবী হজরত ইবরাহিম আ. ও হজরত ইসমাইল আ. এ উদ্দেশ্যেই বাইতুল্লাহ নির্মাণ করেছিলেন, যেন তাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয় এবং তা চিরদিনের জন্য তাওহিদ ও একত্ববাদ এবং হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। মক্কায় প্রিয় নবীজির আবির্ভাব ছিল ইবরাহিম আ. ও ইসমাইল আ.-এর সেই দোয়ার বাস্তবায়ন, যা তারা কাবাঘরের ভিত্তিস্থাপনের সময় করেছিলেন।

তারা আল্লাহর দরবারে নিবেদন করেছিলেন—

﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

> হে আমাদের প্রতিপালক, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসুল প্রেরণ করুন, যে তাদেরই মধ্য হতে হবে; যে তাদের সামনে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে। নিশ্চয়ই আপনি পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও প্রজ্ঞার অধিকারী। [সুরা বাকারা : ১২৯]

এভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহাপ্রজ্ঞা ও সর্বজ্ঞানের ফয়সালা এটাই ছিল যে, হিদায়াত ও মুক্তির যে মহান সূর্য বিশ্ব মানবতাকে আলোকিত করবে, তা উদিত হবে সেই ভূখণ্ডে, যেখানকার মানুষ নিজেদের স্বভাব স্বচ্ছতা ও হৃদয় নির্মলতার গুণে অতি সহজে প্রিয় নবীজির আনীত দ্বীনের সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে, তার সাহাবি ও সহচর হয়ে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রবাদতুল্য বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আল্লাহর শত্রুদের পরাভূত করতে পারবে, মুক্ত চিন্তা ও স্বাধীন চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে বাতিলের সকল প্রলোভন ও আক্রমণ প্রতিহত করতে পারবে, অত্যুচ্চ বংশমর্যাদা ও চারিত্রিক উদারতার গুণে দূরের-কাছের সকলকে আপন করে নিয়ে ভ্রাতৃত্বের এক উপমাহীন নমুনা স্থাপন করতে সক্ষম হবে

এবং উপযোগী ভৌগোলিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে একত্ববাদের নিদর্শন বাইতুল্লাহকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলতে পারবে কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমান এক মৃত্যুঞ্জয়ী কাফেলা।

﴿اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ﴾

আল্লাহই ভালো জানেন যে, তিনি আপন পয়গাম কোথায় ন্যস্ত করবেন। [সুরা আনআম : ১২৪]

* * *

আবির্ভাব থেকে নবুওয়ত

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশপরম্পরা

পিতার দিক থেকে নবীজির বংশপরম্পরা নিম্নরূপ—

মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুর্‌রা বিন কাব বিন লুআই বিন গালিব বিন ফিহর বিন মালিক বিন নযর বিন কিনানা বিন খুযায়মা বিন মুদরিকা বিন ইলয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মাআদ বিন আদনান।

আদনান পর্যন্ত নবীজির উল্লিখিত বংশধারা ইতিহাসবিশারদ, সিরাত রচয়িতা ও কুলজিবিশারদ—সকলের নিকট সর্বস্বীকৃত। ঠিক তেমনই আদনান যে হজরত ইসমাইল আ.-এর বংশোদ্ভূত ও অধস্তন পুরুষ, এ বিষয়েও কারও দ্বিমত নেই।

আদনান হতে ওপরের দিকের বংশপরম্পরা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে বিধায় এখানে উল্লেখ করা হলো না।[৭]

নবীজির শুভজন্ম

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'হস্তিবছর'-এর রবিউল আউয়াল মাসের [illegible] তারিখ[৮] রোজ সোমবার ভূপৃষ্ঠে আগমন করেন। সে বছরই

---

৭. আদনান হতে হজরত ইসমাইল আ. পর্যন্ত বংশপরম্পরার বর্ণনায় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছুটা মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো, ঐতিহাসিকগণের কেউ কেউ আদনান হতে ইসমাইল পর্যন্ত সকল ঊর্ধ্বতন পুরুষের নাম উল্লেখ করেছেন, আবার কেউ কেউ কেবল বিখ্যাত ও খ্যাতিমান পুরুষদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তুলনামূলক অখ্যাত পুরুষদের নাম বাদ দিয়েছেন। বংশবর্ণনা শাস্ত্রে এটি একটি স্বীকৃত বিষয়। বিস্তারিত জানতে দেখা যেতে পারে—ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৪/১৪৯-১৫৪।

৮. ঐতিহাসিকগণ মোটামুটি এ বিষয়ে একমত যে, নবীজি হস্তিবছরের রবিউল আউয়াল মাসে সোমবারে জন্মগ্রহণ করেন। সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ণয়ে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়।=

ইয়ামেনের বাদশা আবরাহা মক্কায় আক্রমণ ও কাবাঘর ধ্বংসের চেষ্টা চালিয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেন এবং তার বাহিনীকে সমূলে ধ্বংস করেন। এ ঘটনা ছিল মানবজাতির জন্য মহান আল্লাহ তাআলার এক সুস্পষ্ট নিদর্শন। পবিত্র কুরআনের সুরা ফিল-এ আবরাহার হস্তিবাহিনী ধ্বংসের প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। কতক ঐতিহাসিকের মতে খ্রিষ্টাব্দের হিসাব অনুসারে প্রিয় নবীজির শুভাগমন ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হয়েছিল।

নবীজি মক্কার বনু হাশিম উপত্যকায় আবু তালিবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। জন্ম থেকেই নবীজি ছিলেন এতিম ও পিতৃহারা। মাতৃগর্ভে নবীজির বয়স যখন দু-মাস, তখন নবীজির পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। এতিম নবীজির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তার পিতামহ আবদুল মুত্তালিব। তিনি নবীজির দুধ-মা হিসেবে সাদ বিন বকর গোত্রের হালিমা সাদিয়া (বিনতে আবু যুআয়ব আবদুল্লাহ বিন হারিস)-কে নির্বাচন করেন।

বক্ষবিদারণের ঘটনা

বনু সাদ গোত্রে দুধমাতা হালিমার কাছে অবস্থানকালে নবী-জীবনের এই অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। এ ঘটনায় হালিমা সাদিয়া নবীজির নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং তাকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। এ সময় নবীজির বয়স ছিল পাঁচ বছর।

=যেমন: ২, ৮, ৯, ১০, ১২ রবিউল আউয়াল। প্রসিদ্ধতম মত হলো ১২ রবিউল আউয়াল। তবে প্রকৃতপক্ষে এসব মতের কোনোটিই শাস্ত্রগত দিক থেকে সুপ্রমাণিত নয়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য—ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৪/২০৬-২১০ ও মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ উশান, *মা শাআ' ওয়া লাম ইয়াছবুত ফিস সীরাতিন নাবাবিয়্যা*, পৃষ্ঠা : ৫-৯।

বলাবাহুল্য, সুনির্দিষ্ট জন্মতারিখের অবগতির সঙ্গে না কোনো দ্বীনি বিধান জড়িত আছে; আর না নবীজি, সাহাবায়ে কেরাম এবং আসলাফ ও পূর্বসূরিগণ এ বিষয়ে বিশেষ কোনো গুরুত্ব দিয়েছেন।

মাতৃবিয়োগ ও পিতামহের দায়িত্বগ্রহণ

মাতৃক্রোড়ে ফিরে আসার পর নবীজি মায়ের তত্ত্বাবধানেই অবস্থান করেন। এক বছর পর আমিনা স্বামীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে নবীজিকে সঙ্গে নিয়ে ইয়াসরিবে (মদিনায়) গমন করেন। ইয়াসরিব থেকে মক্কায় ফেরার পথে মক্কা ও হুদায়বিয়ার মধ্যবর্তী আবওয়া নামক স্থানে নবীজির মাতা আমিনা ইন্তেকাল করেন। এ সফরে নবীজির সঙ্গে আমিনার পরিচারিকা উম্মে আয়মানও ছিলেন। মায়ের মৃত্যুর পর দাদা আবদুল মুত্তালিব নবীজির প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যু ও পিতৃব্য আবু তালিবের দায়িত্বগ্রহণ

প্রিয় নবীজি দুই বছর দাদার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হওয়ার পর দাদা আবদুল মুত্তালিবও ইন্তেকাল করেন। এ সময় নবীজির বয়স ছিল আট বছর। মৃত্যুকালে আবদুল মুত্তালিব তার পুত্র আবু তালিবের কাছে নবীজির প্রতিপালনের দায়িত্ব অর্পণ করে যান।

চাচা আবু তালিব অতি যত্নের সঙ্গে যথার্থভাবে নবীজির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নবীজিকে আপন সন্তানদের চেয়েও অধিক স্নেহ করতেন। পরবর্তী একটানা বিয়াল্লিশ বছর তিনি নবীজিকে স্নেহ ও মমতায় আগলে রাখেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীদের সব ধরনের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করেন। নবীজির নবুওয়তপ্রাপ্তি-পরবর্তী দশম বছর তিনি ইন্তেকাল করেন।

নবুওয়তপ্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কালের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা

নবীজির মেষচারণ

যৌবনের প্রারম্ভে নবীজি আপন পিতৃব্য আবু তালিবকে সহায়তা করার জন্য মেষ চরাতেন।

বালক নবীর সঙ্গে পাদরি বাহিরার সাক্ষাৎ

বারো বছর বয়সে নবীজি চাচা আবু তালিবের সঙ্গে বাণিজ্যসফরে শামে গমন করেন। পথিমধ্যে বুছরায়[৯] পৌঁছলে সেখানকার বাহিরা নামক

---

[৯]. **বুছরা ও বসরা :** ভিন্ন দুটি নগরীর নাম। বুছরা (بصرى) বর্তমান সিরিয়ার অন্তর্গত একটি ঐতিহাসিক নগরী। সিরিয়ার রাজধানী দামেশক হতে এর দূরত্ব প্রায় ১৪০ কিলোমিটার।=

জনৈক খ্রিষ্টান পাদরি নবীজিকে চিনতে পারেন। বাহিরা নবীজিকে মক্কায় ফেরত পাঠাতে এবং ভবিষ্যতে কখনো তাকে শামে না আনতে আবু তালিবকে পরামর্শ দেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, শামের ইহুদি-খ্রিষ্টানরা শেষনবীকে চিনতে পারলে তাকে হত্যা করার চেষ্টা করবে।

ফিজারের যুদ্ধ

ফিজারের যুদ্ধ চলাকালে নবীজির বয়স ছিল চৌদ্দ মতান্তরে পনেরো বছর। যুদ্ধের একপক্ষে ছিল কুরাইশ, কিনানা ও তাদের মিত্র অন্যান্য গোত্র, অপরপক্ষে ছিল হাওয়াযিন গোত্র। নবীজি এ যুদ্ধে তার চাচাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ চলাকালে চাচাদেরকে তির সংগ্রহ করে দিতেন। পবিত্র নগরী মক্কার পবিত্রতা বিনষ্ট হওয়ায় এবং পবিত্র মাস মুহাররমের মর্যাদাহানি ঘটায় এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয় 'হারবুল ফিজার' বা অন্যায়যুদ্ধ।

হিলফুল ফুজুল

ফিজারের যুদ্ধ হতে কুরাইশ গোত্রের প্রত্যাবর্তনের পর হিলফুল ফুজুল নামক সেবাসংঘ গঠিত হয়। বনু হাশিম, বনু যুহরা ও বনু তাইম বিন মুর্‌রা প্রভৃতি শাখা-গোত্র আবদুল্লাহ বিন জুদআনের গৃহে সমবেত হয় এবং সকলে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে তারা জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সহায়তায় এবং মজলুমের অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকবে। কুরাইশরা এই অঙ্গীকার-চুক্তিকে 'হিলফুল ফুজুল'[১০] নামকরণ করে মন্তব্য করে, 'এই অঙ্গীকার-চুক্তির মাধ্যমে সকলে একটি কল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করেছে।' হিলফুল ফুজুল গঠনকে ইসলামপূর্ব আরবজাতির অন্যতম গৌরবময় কীর্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উদ্যোগে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে বলেন—

=বুছরা তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থান ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অপরদিকে বসরা (البصرة) হলো বর্তমান ইরাকের অন্তর্গত ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম নগরী। দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযি.-এর খিলাফত আমলে বিখ্যাত বদরি সাহাবি উতবা বিন গাযওয়ান রাযি. বসরা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তী ইসলামি ইতিহাসের বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে বসরার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

১০. হিলফ শব্দের অর্থ অঙ্গীকার আর ফুজুল অর্থ মজলুমের প্রাপ্য অধিকার। সুতরাং হিলফুল ফুজুল অর্থ মজলুম ও অত্যাচারিতের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার।

«لَقَدْ شَهِدْتُ فِيْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُدْعَانَ حِلْفًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيْ بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ ، وَلَوْ دُعِيْتُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ لَأَجَبْتُ».

আবদুল্লাহ বিন জুদআনের গৃহে উপস্থিত থেকে আমি যে অঙ্গীকার-চুক্তিতে অংশগ্রহণ করেছি, তার বিনিময়ে আমার কাছে রক্তবর্ণ উটও অধিক পছন্দ নয়। ইসলামি যুগেও যদি আমাকে এরূপ কোনো প্রচেষ্টায় আহ্বান জানানো হতো, আমি অবশ্যই সাড়া দিতাম।[১১]

খাদিজার বাণিজ্য-ভার গ্রহণ এবং পাণিগ্রহণ

তরুণ বয়সের প্রারম্ভেই নবীজি ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করেন। এক বর্ণনায় আছে, নবীজি সায়িব বিন আবু সায়িব মাখযুমির সঙ্গে মিলে বাণিজ্য করতেন।[১২] পঁচিশ বছর বয়সে নবীজি কুরাইশ গোত্রের বিদুষী, সম্ভ্রান্ত ও ধনবতী নারী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদের সম্পদ নিয়ে শামে বাণিজ্যে গমন করেন। এ সফরে খাদিজার ক্রীতদাস মায়সারা-ও নবীজির সঙ্গে ছিল।

বাণিজ্য শেষে নবীজি মক্কায় ফিরে আসেন এবং প্রচুর মুনাফাসহ বাণিজ্যের মূলধন খাদিজাকে বুঝিয়ে দেন। একদিকে নবীজির অপূর্ব সততা ও বিশ্বস্ততা, অপরদিকে মুনাফায় বিস্ময়কর বরকত প্রত্যক্ষ করে খাদিজা মুগ্ধ হন। তিনি নবীজির সহধর্মিণী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনাব্বিহের কাছে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করেন। নাফিসা নবীজিকে প্রস্তাব দিলে নবীজি সম্মতি প্রকাশ করেন।

বিয়ের সময় নবীজির বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর খাদিজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর।[১৩] খাদিজার ইতিপূর্বে আরও দু-বার বিয়ে হয়েছিল এবং দু-বারই তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আম্মাজান খাদিজা রাযি. নবীজির

---

১১. বায়হাকি, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদিস নং-১৩০৮০।

১২. দেখুন—*সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং-৪৮৩৬।

১৩. নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিয়ের সময় আম্মাজান খাদিজা রাযি.-এর বয়স কত ছিল, তা নিয়ে বর্ণনাসমূহের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। পঁচিশ বছর, আটাশ বছর, পঁয়ত্রিশ বছর ও চল্লিশ বছর ইত্যাদি বিভিন্ন মত সীরাত ও ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানতে দেখুন—মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ উশান, *মা শাআ' ওয়া লাম ইয়াছবুত ফিস সীরাতিন নাবাবিয়্যা*, পৃষ্ঠা : ১৮-১৯।

সঙ্গে পঁচিশ বছর সংসার করেন। তিনি ছিলেন স্বামীর জন্য শ্রেষ্ঠতম সহধর্মিণী, নবী-সন্তানদের শ্রেষ্ঠতম জননী। তার ইন্তেকালের পূর্বে নবীজি দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। ইবরাহিম ব্যতীত নবীজির সকল সন্তান হজরত খাদিজা রাযি.-এর গর্ভেই জন্মগ্রহণ করেন।

কাবা পুনর্নির্মাণ এবং এ সংক্রান্ত বিরোধ নিরসন

নবীজির বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, তখন কুরাইশ গোত্র কাবাঘর পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সময় কাবাঘরের প্রাচীরগুলো দুর্বল ও ভগ্নপ্রায় হয়ে পড়েছিল। কুরাইশগণ প্রথমে কাবাঘরের প্রাচীরগুলো ভেঙে ফেলে। এরপর তারা পুরো ঘরটিকে কয়েক অংশে বিভক্ত করে এবং প্রত্যেক শাখা-গোত্রকে একেকটি অংশ নির্মাণের দায়িত্ব প্রদান করে। হাজরে আসওয়াদ সংস্থাপনের স্থান পর্যন্ত গাঁথুনি সমাপ্ত হওয়ার পর গোত্রগুলো হাজরে আসওয়াদ পুনঃস্থাপনের অধিকার নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। কোনো গোত্রই এই সৌভাগ্য হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। বিবাদ যখন অনিবার্য যুদ্ধে পরিণত হওয়ার উপক্রম হয়, তখন প্রবীণ কুরাইশ নেতা আবু উমাইয়া ইবনুল মুগিরা মাখযুমি সকলের কাছে প্রস্তাব রাখেন—'আগামীকাল প্রত্যুষে মসজিদের দরজা দিয়ে সবার আগে যিনি প্রবেশ করবেন, তাকেই আমরা আমাদের সমস্যার মীমাংসাকারী হিসেবে মেনে নেব।'

আল্লাহর কী কুদরত! পরদিন প্রত্যুষে সবার আগে মসজিদে প্রবেশ করেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। নবীজিকে দেখে সকলে সমস্বরে বলে ওঠে, 'এ তো আল-আমিন (বিশ্বস্ত)! আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট।'

বিবাদ নিরসনের উদ্দেশ্যে নবীজি একটি চাদর বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ তার মধ্যে রাখেন এবং প্রত্যেক গোত্রপতিকে আহ্বান করেন। নবীজির নির্দেশে তারা সকলে মিলে চাদরটির বিভিন্ন প্রান্ত ধরে পাথরটি উত্তোলন করে। যথাস্থানে ওঠানো হলে নবীজি আপন মোবারক হস্তে পাথরটি স্থাপন করেন।

* * *

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবুওয়ত থেকে হিজরত

ওহি অবতরণ

নবীজির বয়স তখন চল্লিশ বছর। পবিত্র রমজান মাস চলছে। তিন বছর যাবৎ তিনি নিয়মিত হেরা পর্বত-গুহায় গমন করেন এবং মহান আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন থাকেন। এ সময় আল্লাহ তাআলা পৃথিবীবাসীকে আপন রহমতের বারিধারায় সিক্ত করার এবং আসমান-জমিনের মাঝে কুদরতি সংযোগ স্থাপনের মনস্থ করেন। আল্লাহ তাআলা আসমানের আল-আমিন জিবরাইল আ.-কে আসমানি প্রত্যাদেশ সহকারে প্রেরণ করেন জমিনের আল-আমিন মুহাম্মাদের কাছে আর প্রিয় নবীজিকে দান করেন নবুওয়ত ও রিসালাত এবং দাওয়াত ও জিহাদের এক সুমহান দায়িত্ব, যার স্থায়িত্ব থাকবে চিরকাল; যা পৌঁছে যাবে হৃদয় থেকে হৃদয়ে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে।

দাওয়াতের সূচনা ও অগ্রবর্তীদের ইসলামগ্রহণ

নবুওয়তপ্রাপ্তির পর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিচিতজনদের মধ্য হতে যাদের প্রতি কল্যাণ-ধারণা পোষণ করতেন, তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসস্থাপন ও ইসলামগ্রহণের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। নবীজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রথমে যারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নেন, তারা হলেন—

- নবীপত্নী খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ রাযি.।
- নবীজির চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিব রাযি.।
- নবীজির মুক্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসা রাযি.।
- নবীজির অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সার্বক্ষণিক সহচর আবু বকর সিদ্দিক রাযি.।

আবু বকর রাযি. ছিলেন একজন সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী এবং প্রসিদ্ধ কুলজিবিশারদ। ইসলামগ্রহণের পাশাপাশি ইসলামপ্রচারেও তিনি ছিলেন অগ্রগামী। ইসলামের প্রাথমিক কালেই তার আহ্বানে তার হাতে ইসলামগ্রহণ করেন উসমান বিন আফফান রাযি., যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি., আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি., সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. ও তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.-এর ন্যায় বিখ্যাত সাহাবিবৃন্দ।

- এ ছাড়াও বনু কুরাইশের বিভিন্ন শাখা-গোত্রের নারী-পুরুষসহ ক্রীতদাসদের অনেকেই ইসলামি দাওয়াতের প্রাথমিক স্তরে ইসলামগ্রহণ করেন।

নবুওয়তপ্রাপ্তির পর প্রায় তিন বছর নবীজি একান্ত গোপনেই মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান জানাতেন। এরপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে—

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾

এবং (হে নবী,) আপনি আপন নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।

[সুরা শুআরা : ২১৪]

তখন নবীজি পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের মাঝে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন। এর কিছু দিন পর আয়াত অবতীর্ণ হয়—

﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾

সুতরাং আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ করা হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে মানুষকে শুনিয়ে দিন। (তথাপি) যারা শিরক করবে, তাদের পরোয়া করবেন না। [সুরা হিজর : ৯৪]

তখন নবীজি মক্কার প্রতিটি প্রান্তে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। আর এখান থেকেই শুরু হয় ইসলামি দাওয়াতের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়—মুশরিকদের পক্ষ থেকে নবীজি ও মুসলমানদের প্রতি উপহাস ও বিদ্রূপ এবং শোষণ ও নিপীড়নের অধ্যায়।

নির্যাতন-নিপীড়নের অধ্যায়

নবুওয়তের চতুর্থ বছর যখন প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতি কার্যক্রম শুরু হয়, তখন থেকেই ব্যাপকভাবে সকল মুসলমান এবং বিশেষভাবে দুর্বল মুসলমানগণ কুরাইশদের ক্রোধ ও ক্ষোভের শিকার হতে থাকে। প্রত্যেক শাখা-গোত্রের গোত্রপতিগণ নিজ নিজ গোত্রের মুসলিম সদস্যদের ওপর নির্যাতন শুরু করে। প্রত্যেক মনিব তার মুসলিম ক্রীতদাসদের ওপর হিংস্র উন্মত্ততায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। সীমিত সংখ্যক মুসলমানের ছোট্ট কাফেলার ওপর নেমে আসে নির্যাতনের এমন এক কঠিন ও বিভীষিকাময় অধ্যায়, যা পাঠ করলেও দেহ-মন প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। নমুনাস্বরূপ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হলো—

- স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু লাহাব, আবু জাহল, উকবা বিন আবু মুইত, উমাইয়া বিন খালফ প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় মুশরিক সর্দারদের পক্ষ হতে ক্রমাগত নির্যাতন ও বিদ্রূপ-আচরণের সম্মুখীন হন।
- আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-কে মুখমণ্ডলজুড়ে প্রচণ্ড প্রহার করা হয়। মুশরিকদের প্রহারে তিনি যখন অচেতন হয়ে পড়েন, তখন তারা তাকে মৃত মনে করে প্রহার বন্ধ করে।
- উসমান বিন আফফান রাযি.-কে তার চাচা খেজুরপত্রের চাটাইয়ের ভেতর আটকে প্রহার করে এবং চাটাইয়ের অভ্যন্তরে ধোঁয়া প্রবেশ করিয়ে তাকে শ্বাসরুদ্ধ করার চেষ্টা করে।
- মুসআব বিন উমায়র রাযি.-এর মা পুত্রের ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পেরে তার পানাহার বন্ধ করে দেন এবং তাকে বন্দি করে রাখেন। অবশেষে তিনি হাবশায় হিজরত করেন।
- সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. তার মুশরিক মায়ের পক্ষ হতে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। তাকে ইসলামত্যাগে বাধ্য করতে মা তার পানাহার বন্ধ করে দেন।

এগুলো কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের দুর্যোগের কিছু খণ্ডচিত্র। তাহলে যেসব মুসলমান ছিলেন ক্রীতদাস বা মুক্ত দাস, অথবা যাদের ছিল না কোনো প্রতিপত্তি বা নিরাপত্তা-প্রতিশ্রুতি, তাদের জীবনে

কী নিদারুণ দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তা সহজেই অনুমেয়। উদাহরণস্বরূপ—

- বিলাল বিন রবাহ রাযি. নির্যাতিত হন তার মালিক উমাইয়া বিন খালফের হাতে।
- আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. ও তার মাতা-পিতা সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হন। পিতা ইয়াসির রাযি. কাফিরদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেন এবং মাতা সুমাইয়া পাপিষ্ঠ আবু জাহলের হাতে শহিদ হন। মাতা-পিতার মৃত্যুর পরও কাফিররা আম্মারকে নির্যাতন করা বন্ধ করেনি।
- সুহায়ব বিন সিনান রুমি রাযি. প্রচণ্ড নিপীড়নের কারণে চেতনা ও বোধশক্তি হারিয়ে ফেলতেন।
- খাব্বাব বিন আরাত রাযি. ছিলেন উম্মে আনমারের ক্রীতদাস। পেশায় কামার উম্মে আনমার উত্তপ্ত লোহা এনে হজরত খাব্বাব রাযি.-এর মাথায় ও পিঠে চেপে ধরত।
- এ ছাড়াও আমির বিন ফুহাইরা রাযি., আবু ফুকায়হা রাযি., যিন্নিরা রুমিয়া রাযি., নাহদিয়া রাযি. ও তার কন্যা প্রমুখ ক্রীতদাস সাহাবি-সাহাবিয়াগণও অবর্ণনীয় নির্যাতনের সম্মুখীন হন।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এমন একটি বর্ণনাও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, তাদের কেউ এ ধরনের কঠিন নির্যাতন ও নিষ্পেষণের শিকার হওয়ার পর ইসলাম ত্যাগ করেছেন। বরং ইতিহাস এই গৌরবোজ্জ্বল তথ্যই সংরক্ষণ করেছে যে, কঠিন থেকে কঠিনতর নির্যাতন ইসলাম নামক সুমহান ধর্মের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ও বন্ধন আরও সুদৃঢ় করেছে। কারণ, তারা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন—ইসলাম পৃথিবীতে আগমন করেছে তাদেরকে পার্থিব জীবনের দুর্ভাগ্য ও পরকালের মহা যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি দিতে।

হাবশায় প্রথম হিজরত

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, নবুওয়তের চতুর্থ বছর হতেই নির্যাতন-নিপীড়নের ধারা শুরু হয়েছিল। নবুওয়তের পঞ্চম বছরের মধ্যভাগে এসে নির্যাতনের মাত্রা চরম অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন সাহাবিদের এই অবর্ণনীয় কষ্ট দেখে

তাদেরকে বলেন, 'তোমরা যদি হাবশা-ভূমিতে[১৪] চলে যাও, তাহলে কল্যাণকর হবে। কেননা, সেখানে এমন এক শাসক আছেন, যার রাজত্বে কেউ জুলুম-নির্যাতনের শিকার হয় না। হাবশা হলো সত্যের ভূমি। আল্লাহ তাআলা যতদিন না তোমাদেরকে চলমান দুর্যোগ থেকে মুক্তি দান করেন, ততদিন তোমরা সেখানেই থাকবে।'

নবীজির নির্দেশে বারোজন পুরুষ ও চারজন নারীর একটি সাহাবা-কাফেলা নবুওয়তের পঞ্চম বছর রজব মাসে হাবশায় হিজরত করে। কাফেলার নেতৃত্বে ছিলেন উসমান বিন আফফান রাযি.। তার সঙ্গে তার সহধর্মিণী নবীকন্যা রুকাইয়া রাযি.-ও ছিলেন।

মুহাজিরদের মক্কায় প্রত্যাবর্তন

মাসতিনেক পরই হাবশায় হিজরতকারী মুহাজির-কাফেলার কাছে এই ভুল সংবাদ পৌঁছায় যে, মক্কার কুরাইশরা সকলে ইসলামগ্রহণ করেছে। এ সংবাদ পেয়ে একই বছরের শাওয়াল মাসে মুহাজির-কাফেলা মক্কায় ফিরে আসে। মক্কায় প্রবেশ করার পূর্বেই প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভ করায় অনেকেই পুনরায় হাবশায় ফিরে যায় আর কয়েকজন সাহাবি অতি সঙ্গোপনে বা নেতৃস্থানীয় কোনো কুরাইশ ব্যক্তির নিরাপত্তা-আশ্রয় গ্রহণ করে মক্কায় প্রবেশ করে।

হাবশায় দ্বিতীয় হিজরত

প্রথমবারের হিজরতের পর যারা মক্কায় ফিরে এসেছিল, তাদের প্রতি কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়ন আরও বৃদ্ধি পায়। গোত্রের লোকেরা তীব্র ক্রোধ নিয়ে নব উদ্যমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অমানুষিক নির্যাতন চালাতে থাকে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। দ্বিতীয়বারের এই হিজরত ছিল প্রথমবারের চেয়েও কষ্টসাধ্য। এবার হিজরত করে তিরাশিজন পুরুষ ও আঠারোজন নারী সাহাবি।

---

১৪. **হাবশা** : আরব উপদ্বীপ হতে সরাসরি দক্ষিণে অবস্থিত একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল হাবশা বা আবিসিনিয়া। বর্তমান ইরিত্রিয়া, উত্তর ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ, জিবুতি, মিশরের দক্ষিণাঞ্চল, সুদানের পূর্বাঞ্চল ও ইয়ামেনজুড়ে এর বিস্তৃতি ছিল।

মুহাজিরদের ফিরিয়ে আনতে মক্কার মুশরিকদের ষড়যন্ত্র

সাহাবায়ে কেরামের দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরতের পর মক্কার কুরাইশরা মুহাজির-কাফেলাকে মক্কায় ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালায়। এ উদ্দেশ্যে তারা আমর ইবনুল আস ও আবদুল্লাহ বিন আবু রাবিয়াকে হাবশায় প্রেরণ করে। পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করে নতুন ধর্ম গ্রহণকারী মুহাজিরদের ফিরিয়ে দিতে হাবশা-অধিপতি নাজাশিকে[১৫] রাজি করানোর জন্য তারা দুজন মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়। রাজদরবারে নাজাশি ও হাবশায় আশ্রয়গ্রহণকারী মুহাজির-কাফেলার প্রতিনিধি জাফর বিন আবু তালিব রাযি.-এর মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। জাফর রাযি. কুরাইশ প্রতিনিধিদলের সমস্ত মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করে নাজাশির সামনে নিজেদের নিষ্ঠা ও সততা প্রমাণ করতে সক্ষম হন। হাবশা-রাজ নাজাশি মুহাজির কাফেলাকে মক্কায় ফেরত পাঠানোর পরিবর্তে নিজেই গোপনে ইসলামগ্রহণ করেন এবং সপ্তম হিজরিতে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) খায়বার যুদ্ধ চলাকালে মুহাজির-কাফেলার মদিনায় গমনের পূর্ব পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

প্রথমে হামজা ও তারপর উমর ইবনুল খাত্তাবের ইসলামগ্রহণ

নবুওয়তের ষষ্ঠ বছরের শেষদিকে মহান আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রভাব মজবুত ও সুদৃঢ় করার এবং কাফির ও মুশরিকদের লাঞ্ছিত ও হীনবল করার ইচ্ছা করেন। এ সময় প্রথমে ইসলামগ্রহণ করেন নবীজির পিতৃব্য ও কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত ও শক্তিশালী যুবক হামজা রাযি.। এর তিনদিন পরই ইসলামগ্রহণ করেন আরেক তেজস্বী যুবক উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.।

---

১৫. নাজাশি কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম নয়; বরং তৎকালীন আবিসিনিয়া সাম্রাজ্যের প্রত্যেক অধিপতিকেই সম্মানসূচক সম্বোধন হিসেবে নাজাশি বলা হতো। তদ্রূপ রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কায়সার, পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কিসরা, মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসককে মুকাওকিস এবং তুর্কি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে খাকান বলা হতো। আলোচ্য নাজাশি বা হাবশা-রাজের নাম ছিল আসহামা বিন আবজার। তিনি সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যার জন্য নবীজি গায়েবি জানাযা আদায় করেছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।

উমরের ইসলামগ্রহণ মক্কার মুশরিকসমাজে বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং মুশরিকরা নিজেদেরকে লাঞ্ছিত-অপমানিত ভাবতে শুরু করে। বিপরীতে মুসলমানরা লাভ করে গৌরব ও আনন্দ-অনুভূতি।

বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. বলতেন, 'উমর ইসলামগ্রহণ করার পূর্বে আমরা কাবার কাছে নামাজ আদায় করতে পারিনি।'

সুহায়ব বিন সিনান রাযি. বলেন, 'উমরের ইসলামগ্রহণের পরই ইসলাম পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের পথ সুগম হয়। আমরা কাবাগৃহের পাশে উপবেশন ও তাওয়াফ করার সুযোগ পাই। এতদিন যারা আমাদের সঙ্গে নির্দয় আচরণ করত, এবার আমরা তাদের প্রতিবাদ করার এবং মন্দ আচরণের কিছু অংশ তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার সুযোগ পাই।'

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. আরও বলেন, 'উমরের ইসলামগ্রহণের পর থেকে আমরা সর্বদা মর্যাদাসম্পন্ন ছিলাম।'

—দ্রষ্টব্য—

হজরত উমর রাযি.-কে 'আল-ফারুক' নামকরণের কারণ

বিশিষ্ট তাবেয়ি মুজাহিদ রহ. হতে বর্ণিত, হজরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাযি. বলেন, আমি একবার উমর ইবনুল খাত্তাবকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে 'আল-ফারুক' নামকরণ করা হয়েছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, হামজা আমার তিনদিন পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেন। এ কথা বলার পর উমর তার ইসলামগ্রহণের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। শেষে তিনি বলেন, ইসলামগ্রহণ করার পর আমি নবীজিকে বললাম, আল্লাহর রাসুল! মারা যাই বা বেঁচে থাকি, আমরা কি হকের ওপর প্রতিষ্ঠিত নই? নবীজি উত্তর দিলেন, অবশ্যই! ওই মহান সত্তার শপথ, যার কুদরতি হাতে আমার জীবন! মারা যাও বা বেঁচে থাকো, সর্বাবস্থায় তোমরা ন্যায় ও সত্যের পথে আছ। তখন আমি নবীজিকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে কেন এই সঙ্গোপন?! ওই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন! অবশ্যই আমরা বাইরে বের হব। এরপর আমরা দুটি

কাতার করে নবীজিকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। এক কাতারের অগ্রভাগে ছিলেন হামজা, অপর কাতারের অগ্রভাগে আমি। আমরা যখন পথ চলছিলাম, রাস্তাজুড়ে জাঁতা-পেষা আটার মতো ধুলা উড়ছিল। আমরা মসজিদে প্রবেশ করলাম। সারিদুটির সম্মুখে আমাকে ও হামজাকে দেখে কুরাইশরা এমন হতভম্ব ও বিষণ্ন হয়ে পড়ল, যা তারা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। সেদিনই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'আল-ফারুক' উপাধি দান করেন।

সমঝোতা ও দরকষাকষির পথে

হামজা ও উমরের ইসলামগ্রহণের পর কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেয়—এবার তারা নির্যাতন-নিপীড়নের পথ ছেড়ে ভিন্ন পথে নবীজিকে নিবৃত্ত করার প্রচেষ্টা চালাবে। নবীজিকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান হতে বিরত রাখতে প্রথমে তারা দরকষাকষির পথ অবলম্বন করে এবং নবীজিকে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতা প্রদানের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু এ পদ্ধতিও ব্যর্থ হলে তারা নবীজির চাচা আবু তালিবের কাছে উপস্থিত হয়ে তাকে অনুরোধ জানায় যে, তিনি যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি সমর্থন ও সহায়তা প্রত্যাহার করে নেন। কিন্তু আবু তালিব সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। এবারও ব্যর্থ হওয়ার পর মক্কার কুরাইশরা সম্পূর্ণ নতুন ও অভিনব এক পদ্ধতি অবলম্বন করে। আরবজাতি ও মানবজাতির ইতিহাসে এর অতীত কোনো দৃষ্টান্ত নেই। অবশ্য পরবর্তীকালে অনেক জাতি-গোষ্ঠীই এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। আর তা হলো অবরোধ ও বয়কটের পথ।

অবরোধ ও বয়কট

নবীজির পক্ষাবলম্বন করায় এবং নবীজিকে নিরাপত্তা দেওয়ায় কুরাইশরা বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল সদস্যের ওপর অবরোধ ও বয়কট আরোপ করে এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে।

- এই দুই গোত্রের লোকদের সঙ্গে তারা ক্রয়-বিক্রয় বা কোনো ধরনের লেনদেন করবে না।

- এই দুই গোত্রের কারও সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবে না।
- তাদের সঙ্গে যোগাযোগ, সাক্ষাৎ, ওঠা-বসা, কথাবার্তা, মেলামেশা কিছুই করবে না।
- তাদের সঙ্গে কুরাইশরা কোনো সন্ধি করবে না, তাদের প্রতি কোনোপ্রকার দয়া ও করুণা প্রকাশ করবে না।

সকলে যেন এসব শর্ত মেনে চলে, এ উদ্দেশ্যে কুরাইশরা শর্তগুলো একটি কাগজে প্রতিজ্ঞাপত্র হিসেবে লিখে তা কাবা-প্রাচীরে টাঙিয়ে দেয়।

কুরাইশদের আরোপিত এই অবরোধ নবুওয়তের সপ্তম বছরের মুহাররম মাস হতে দশম বছরের মুহাররম মাস পর্যন্ত পূর্ণ তিন বছর স্থায়ী ছিল।

লাগাতার তিন বছরের অবরোধে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিব সীমাহীন দুর্যোগ-দুর্দশার শিকার হয়। একপর্যায়ে যুহায়র বিন আবু উমাইয়া, মুতইম বিন আদি, আবুল বুখতারি বিন হিশাম, যামআ' বিন আসওয়াদ প্রমুখ কুরাইশ ব্যক্তিদের অন্তরে আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্ববোধ জেগে ওঠে। তারা সকলে এই অমানবিক অবরোধ প্রত্যাহার ও বাতিল করার চেষ্টা চালায়। তাদের চেষ্টা সফল হলে নবীজি ও তার সঙ্গীগণ সেই গিরিপথ থেকে বের হয়ে আসেন, যেখানে তারা দীর্ঘ তিন বছর অবরুদ্ধ ছিলেন। নতুন করে আবারও শুরু হয় আল্লাহর হুকুমে দ্বীনের পথে অব্যাহত সংগ্রাম এবং ঈমান ও ইসলামের পথে মানুষকে আহ্বানের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা।

শোকের বছর : আবু তালিব ও খাদিজা রাযি.-এর পরলোকগমন

অবরোধ ও বয়কটের দুঃসহ তিন বছর শেষ হওয়ার স্বস্তির রেশ কাটতে না কাটতেই একই বছরে ঘটে দু-দুটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা। অবরোধ শেষ হওয়ার ছয় মাস পর নবুওয়তের দশম বছর রজব মাসে মৃত্যুবরণ করেন নবীজির চাচা আবু তালিব। আবু তালিব ছিলেন নবীজির সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধায়ক ও নিরবচ্ছিন্ন সহায়তাকারী। এর পঞ্চাশ দিন পর রমজান মাসে ইন্তেকাল করেন নবীজির সহধর্মিণী আম্মাজান খাদিজা রাযি.। ঘরের-বাইরের দুই পরম নির্ভরতাকে হারিয়ে নবীজি অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন। এ কারণেই নবীজি এ বছরকে 'আমুল হুযন' বা শোকের বছর নামকরণ করেন। অবশ্য একের পর এক দুর্যোগময় পরিস্থিতিতেও

নবীজি হতোদ্যম হননি; বরং আল্লাহর সাহায্যের প্রতি আস্থা রেখে নিরবচ্ছিন্নভাবে ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

সাওদা বিনতে যামআ রাযি. ও আয়েশা রাযি.-কে বিবাহ

আম্মাজান খাদিজা রাযি.-এর ইন্তেকালের এক মাস পর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা বিনতে যামআ রাযি.-কে বিয়ে করেন। সাওদা রাযি. ইতিপূর্বে সাকরান বিন আমর রাযি.-এর স্ত্রী ছিলেন। হজরত সাকরান রাযি. ইসলামগ্রহণ করার পর হাবশায় হিজরত করেন এবং সেখানেই মতান্তরে মক্কায় ফেরার পর ইন্তেকাল করেন। হজরত সাওদা রাযি.-এর ইদ্দত ও নির্জনবাস শেষ হলে নবীজি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন এবং নবুওয়তের দশম বছর শাওয়াল মাসে তাকে বিয়ে করেন। একই মাসে নবীজি আবুবকর সিদ্দিক রাযি.-এর কন্যা আয়েশা রাযি.-কেও বিয়ে করেন। অবশ্য আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর সঙ্গে নবীজির বাসর মদিনায় হিজরতের পরে হয়েছিল।

নবীজির তায়েফ গমন

নবুওয়তের দশম বছরের শাওয়াল মাসে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলাম প্রচারের জন্য সহায়ক ও উপযুক্ত কোনো ভূমির সন্ধানে বের হন। এ উদ্দেশ্যে নবীজি তার মুক্ত ক্রীতদাস যায়দ বিন হারিসাকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফে গমন করেন। তায়েফ মক্কা হতে প্রায় ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। নবীজি পায়ে হেঁটেই তায়েফে গমন করেন, পায়ে হেঁটেই সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। পথ অতিক্রমকালে নবীজি আশেপাশে বসবাসকারী প্রতিটি গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। কিন্তু কোনো গোত্রই নবীজির দাওয়াতে সাড়া দেয়নি।

নবীজি তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন এবং তায়েফবাসীকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেন। কিন্তু একজন ব্যক্তিও তার আহ্বানে সাড়া দেয়নি। উল্টো তারা নবীজিকে তায়েফ থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। নবীজি যখন তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করেন, তখন তায়েফবাসীর প্ররোচনায় নির্বোধ-দুষ্ট, শিশু-কিশোর ও ক্রীতদাসরা নবীজির পিছু নেয় এবং তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গালাগালি করতে থাকে। তারা নবীজির মোবারক শরীরে পাথর নিক্ষেপ করে নবীজিকে রক্তাক্ত

করে। প্রবাহিত রক্তে নবীজির পদযুগল সিক্ত হয়ে ওঠে, পাদুকাদুটি রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়।

নবীজি তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত উতবা ও শায়বার একটি আঙুর-বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলে পিছু নেওয়া দুষ্ট লোকেরা ফিরে চলে যায়। এরপর নবীজি ও যায়দ বিন হারিসা একটি আঙুর-গাছের নিচে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন।

প্রিয় নবীজি তখন ব্যথা ও কষ্ট, দুঃখ ও মনঃপীড়া এবং মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত। এই চরম সঙ্গিন মুহূর্তে তিনি আপন রবের প্রতি নিবেদিত ও সমর্পিত হন এবং অত্যন্ত আবেগপূর্ণ ভাষায় আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দোয়া করেন—

«اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ أَشْكُوْ ضُعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ! أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ ، وَأَنْتَ رَبِّيْ ، إِلَى مَنْ تَكِلُنِيْ؟ إِلَى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ أَمْ إِلَى عَدُوٍّ مَلَّكْتَه أَمْرِيْ ؟ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِيْ؛ وَلٰكِنَّ عَافِيَتَكَ هِيَ أَوْسَعُ لِيْ. أَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ أَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ، أَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سُخْطُكَ، لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ».

হে আল্লাহ, আমি আপন দুর্বলতা ও উপায়হীনতা, অসহায়ত্ব ও কৌশলস্বল্পতা এবং মানুষের কাছে আমার অকিঞ্চিৎকরতা সম্পর্কে আপনার দরবারেই ফরিয়াদ করছি। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়, আপনিই অক্ষম ও দুর্বলের প্রতিপালক, আপনিই আমার মালিক। আপনি আমাকে কার হাতে সমর্পণ করছেন?! যারা আমাকে রুক্ষ ব্যবহারে জর্জরিত করবে, এমন অচেনা কারও হাতে? নাকি যারা আমাকে বিপর্যস্ত করার ক্ষমতা রাখে, এমন শত্রুর হাতে? আপনি যদি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হন, তাহলে আমি কোনো কিছুর পরোয়া করি না। আপনার ক্ষমা ও নিরাপত্তার শামিয়ানাই আমার জন্য সুপ্রশস্ত সম্বল। আমি আপনার সেই পুণ্য জ্যোতির আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যার প্রভাবে যাবতীয়

> অন্ধকার বিদূরিত হয়ে চারদিক আলোয় উদ্ভাসিত হয় এবং দ্বীন-দুনিয়ার সবকিছু সুবিন্যস্ত হয়। আমি আমার প্রতি আপনার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি পতিত না হওয়ার প্রার্থনা করছি। আমি আমার ত্রুটি স্বীকার করছি, যতক্ষণ না আপনি সন্তুষ্ট হন। আপনি শক্তি দান না করলে সৎ কাজ করার ও অন্যায় কাজ হতে বিরত থাকার কোনো ক্ষমতা আমার নেই।

দোয়ার প্রতিটি বাক্যে আল্লাহর প্রতি নবীজির অগাধ আস্থা ও নির্ভরতা, দ্বীনের পথে নিষ্ঠাপূর্ণ পদচারণা ও অবিচলতা এবং শত দুঃখ-কষ্টেও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও আত্মনিবেদন ফুটে উঠেছে।

নবীজির দোয়া শেষ হতেই ঊর্ধ্বাকাশ হতে নবীজির কাছে আল্লাহ-প্রদত্ত সাহায্য উপস্থিত হয়। আল্লাহ তাআলা পাহাড়-পর্বতের দায়িত্বশীল ফিরেশতাসহ হজরত জিবরাইল আ.-কে নবীজির কাছে প্রেরণ করেন। ফিরেশতাদ্বয় নবীজির কাছে নিবেদন করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি অনুমতি দিলে আমরা এখনই দু-পাশের পাহাড় মিলিয়ে দিয়ে তায়েফবাসীকে ধ্বংস করে দিই।'

নবীজি উত্তরে বলেন, 'না, আমি বরং আশা করি, পরবর্তীকালে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে এমন এক প্রজন্ম সৃষ্টি করবেন, যারা (ইসলামকে বরণ করে নিয়ে) এক আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না।'

রহমতের নবীর এই উত্তরে তার অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব, দয়া ও মহত্ত্ব এবং সুমহান চারিত্রিক আদর্শই প্রস্ফুটিত হয়েছে। পাশাপাশি ফুটে উঠেছে নিকট বা দূর-ভবিষ্যতে তায়েফবাসীর ইসলামগ্রহণের প্রত্যাশা।

আল্লাহর দ্বীনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠিত করার এই সংগ্রামী সফরে শত বাধার মুখেও নবীজি তখন দৃঢ় প্রত্যয়ী ও অবিচল। অব্যাহত দ্বীন প্রচারের লক্ষ্যে তিনি এবার মুতইম বিন আদি-এর নিরাপত্তা-আশ্রয় গ্রহণ করে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মিরাজের সফর

একদিকে ঘরের-বাইরের দুই অকৃত্রিম সহযোগী খাদিজা রাযি. ও আবু তালিবের মৃত্যু, অপরদিকে তায়েফের সফরে প্রচণ্ড শারীরিক-মানসিক নিপীড়ন—এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপন

নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করিয়ে প্রিয় বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে এবং আপন রবের প্রতি প্রিয়নবীর আস্থা ও নির্ভরতা আরও বৃদ্ধি করার মনস্থ করেন। সাইয়েদ আবুল হাসান আলি মিয়া নদবি রহ. লিখেছেন,

> ইসরার (ও মিরাজের) ঘটনা এমন কোনো বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক ঘটনা ছিল না, যার উদ্দেশ্য নবীজিকে শুধুই আল্লাহ তাআলার বড় বড় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করানো এবং আসমান জমিন ও ঊর্ধ্বলোকের যাবতীয় সৃষ্টিরহস্য নবীজির দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত করা। বরং এই কুদরতি সফরে প্রচ্ছন্ন ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আরও অনেক রহস্য ও মর্মবাণী এবং সুদূরপ্রসারী ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বহু ইঙ্গিত ও সংকেত নিহিত রয়েছে। ইসরার (ও মিরাজের) ঘটনা এই বাস্তবতাকেই সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদুল হারাম ও মসজিদুল আকসা উভয় কেবলার নবী, পূর্ব ও পশ্চিম, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ইমাম, পূর্ববর্তী নবীগণের উত্তরাধিকারী এবং আগামী মানবপ্রজন্মের পথপ্রদর্শক। মিরাজের প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ সুরা ইসরা ও সুরা নাজমেও এ ঘোষণা করা হয়েছে। নবীজির মিরাজ সফরে মক্কা আল-কুদসের সঙ্গে এবং মসজিদুল হারাম মসজিদুল আকসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তার ইমামতিতে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সালাত আদায় করেছেন। এটি ছিল তার দাওয়াত ও পয়গামের সর্বজনীনতা, ইমামত ও নেতৃত্বের চিরন্তনতা—সর্বোপরি তার শিক্ষা ও সংস্কারের মানবিকতা এবং স্থান-কালের ভিন্নতাভেদে সামগ্রিকতা ও উপযুক্ততার সুস্পষ্ট প্রমাণ। উক্ত সুরায় নবীজির ব্যক্তিত্বের সঠিক ও সুনির্ধারিত রূপ, নেতৃত্বের সুস্পষ্ট বিবরণ, এই উম্মাহর (যাদের উদ্দেশে তিনি প্রেরিত হয়েছেন এবং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে) প্রকৃত মর্যাদা ও অবস্থান নির্ণয় এবং নববি পয়গাম ও দাওয়াতের বিবরণ ও ভূমিকার কথা উল্লেখ আছে, যা বিশ্বসমাজের প্রতিটি মানবশ্রেণির জন্য প্রযোজ্য ও পরিব্যাপ্ত।[১৬]

এই অলৌকিক ঘটনার মক্কা থেকে মসজিদুল আকসা পর্যন্ত সফরকে ইসরা এবং মসজিদুল আকসা থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গমনকে মিরাজ বলা হয়।

---

১৬. আবুল হাসান আলি মিয়া নদবি, *আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, পৃষ্ঠা : ১৪৯।

মিরাজে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন প্রভুর সান্নিধ্যলাভে ধন্য হন। মিরাজের সফরেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করা হয়। নবীজি জান্নাত-জাহান্নাম ও জান্নাতি-জাহান্নামিদের পরিস্থিতি স্বচক্ষে দর্শন করেন। এই সুমহান তাৎপর্যমণ্ডিত সফরের পর রিসালাত ও দাওয়াতের কর্মধারা অব্যাহত রাখতে সে রাতেই নবীজি মক্কায় ফিরে আসেন।

ইয়াসরিববাসীর ইসলামগ্রহণের সূচনা

নবুওয়তের একাদশ বছর হজের মৌসুমে নবীজি নিজেই ইয়াসরিব (মদিনা)-এর অধিবাসী ছয়জন খাযরাজ বংশীয় যুবককে ইসলামের দাওয়াত দেন। তারা নবীজির দাওয়াত কবুল করে ইসলামগ্রহণ করে। এরপর তারা নবীজিকে নিজেদের কওমের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে বলে, আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তাদের মধ্যে যেরূপ শত্রুতা ও বিভেদ রয়েছে, তা অন্য কারও মধ্যে নেই। আমরা আশাবাদী, আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা তাদের কাছে যাব এবং তাদেরকে আপনার দ্বীনের প্রতি আহ্বান জানাব। আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে আমরা যে দ্বীন কবুল করেছি, তাদের সামনেও সে দ্বীন পেশ করব। যদি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপনার পাশে সমবেত করেন, তাহলে আপনার চেয়ে সম্মানিত অন্য কেউ হবে না।

নওমুসলিম ছয় খাযরাজি সাহাবি ইসলামের সুমহান দাওয়াত নিয়ে ইয়াসরিবে ফিরে যান। তাদের প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবের ঘরে-ঘরে আলোচিত হতে থাকে মক্কায় আবির্ভূত শেষ নবীর প্রসঙ্গ।

আকাবার প্রথম বায়আত

খাযরাজ গোত্রের ছয় যুবকের ইসলামগ্রহণের এক বছর পর নবুওয়তের দ্বাদশ বছর হজের মৌসুমে ইয়াসরিব হতে বারোজনের একটি প্রতিনিধিদল আকাবায়[১৭] উপস্থিত হয়। তাদের মধ্যে দশজন খাযরাজ

---

১৭. আরবিতে সংকীর্ণ গিরিপথকে 'আকাবা' বলা হয়। মক্কা থেকে মিনায় গমনের পথে মিনার ময়দানের পশ্চিমে অবস্থিত একটি সংকীর্ণ পাহাড়ি পথ 'আকাবা' নামে খ্যাত ছিল। উল্লেখ্য, হজের সময় মিনায় যে তিনটি স্তম্ভকে লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হয়, তার প্রথমটি অর্থাৎ জামারায়ে আকাবা এই গিরিপথটির প্রান্তেই অবস্থিত।

গোত্রীয় এবং দুজন আওস গোত্রীয়। তারা নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এই বায়আত ইতিহাসে 'প্রথম বায়আতে আকাবা' নামে খ্যাত।

বিশিষ্ট সাহাবি উবাদা বিন সামিত রাযি. বলেন, যেহেতু এ বায়আত সম্পন্ন হয়েছিল জিহাদ-বিধান ফরজ হওয়ার পূর্বে, তাই আমরা নবীজির হাতে নারীদের বায়আতের ন্যায় বায়আত গ্রহণ করলাম। অর্থাৎ আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম—আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করব না, চুরি-ছিনতাই, ব্যভিচার করব না, নিজ সন্তানকে হত্যা করব না, স্বেচ্ছায়-স্বজ্ঞানে কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করব না এবং কোনো কল্যাণ-কর্মে নবীজির অবাধ্যতা করব না। আমরা বায়আত গ্রহণ করার পর নবীজি বললেন, যদি তোমরা আপন প্রতিজ্ঞায় অটল থাক, তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। আর যদি কোনো অংশ লঙ্ঘন কর, তাহলে তোমাদের পরিণতি আল্লাহর হাতে। আল্লাহ চাইলে তোমাদের শাস্তি দেবেন, চাইলে তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন।

এরপর নবীজি দ্বীন ও কুরআন পাঠ শিক্ষা দিতে এবং নামাজে ইমামতি করতে হজরত মুসআব বিন উমায়র রাযি.-কে তাদের সঙ্গে ইয়াসরিবে প্রেরণ করেন। মুসআব রাযি. অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইয়াসরিবের প্রতিটি ঘরে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। তার দাওয়াতে সাদ বিন মুআয, উসায়দ বিন হুযায়রসহ ইয়াসরিবের নেতৃস্থানীয় অনেকেই ইসলামের পতাকাতলে শামিল হয়ে দ্বীনের আনসার ও সাহায্যকারীতে পরিণত হয়।

পরবর্তী বছরের (নবুওয়তের ত্রয়োদশ বছরের) হজের মৌসুম আগমনের পূর্বেই মুসআব বিন উমায়র রাযি. কল্যাণ ও সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে নবীজির দরবারে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি নবীজিকে ইয়াসরিবের বিভিন্ন গোত্রের ইসলামগ্রহণ এবং তাদের সামরিক ও প্রতিরক্ষা শক্তি সম্পর্কে অবগত করেন।

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত

নবুওয়তের ত্রয়োদশ বছর হজের মৌসুমে হজকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ইয়াসরিব থেকে তিয়াত্তরজন পুরুষ ও দুজন নারীর একটি মুসলিম জামাত আপন কওমের মুশরিক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে মক্কায় উপস্থিত হয়। আইয়ামে তাশরিকের মাঝের দিন ১২ জিলহজ তারা আকাবায় নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। মিনার নিকটবর্তী গিরিপথে রাতের অন্ধকারে পূর্ণ গোপনীয়তায় অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে নবীজির সঙ্গে তার চাচা আব্বাসও ছিলেন। তিনি তখনও মুসলমান হননি। উপস্থিত আনসারি সাহাবিরা নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করে। বায়আতে উল্লেখ ছিল—নবীজি যখন ইয়াসরিবে হিজরত করবেন, তখন তারা আপন পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তায় যেরূপ সচেষ্ট থাকে, নবীজির সার্বক্ষণিক প্রতিরক্ষায়ও সেরূপ সচেষ্ট থাকবে।

বায়আত সম্পন্ন হওয়ার পর নবীজি তাদেরকে জানান যে, মক্কার মুসলমানগণ শীঘ্রই ইয়াসরিবে হিজরত করবেন। তিনি তাদেরকে তাদের মুহাজির ভাইদের সাদর সংবর্ধনা জানাতে এবং তাদের জন্য আবাস ও জীবিকার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব নিতে বলেন। তারা নবীজির নির্দেশ সাদরে গ্রহণ করে নেয়। ইতিহাস সাক্ষী—আনসারি সাহাবিগণ পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে বায়আতের দাবি রক্ষা করেছিল এবং দ্বীন ও নবীর প্রতি আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করেছেন।

৫০—দ্রষ্টব্য—৩৫

দ্বীনের পথে আনসারি সাহাবিগণের ত্যাগ ও নিষ্ঠা

জীবনীশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ হতে আকাবার দ্বিতীয় বায়আতে অংশগ্রহণকারী আনসারি সাহাবিগণের জীবনেতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়—তাদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সাহাবি নবীযুগে বা পরবর্তীকালে বিভিন্ন যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন। তেত্রিশজন অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক সাহাবি নবীজির সঙ্গে সকল গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্য হতে বদরের যুদ্ধে শরিক ছিলেন প্রায় সত্তরজন।

এই সব আনসারি সাহাবি আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করেছেন। তাদের অনেকে শাহাদাতের গৌরব লাভ করেছেন, আপন জান আল্লাহর পথে কুরবানি করেছেন এবং শহিদ অবস্থায় আপন রবের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। আবার অনেকে গাজির মর্যাদা লাভ করেছেন, জিহাদে শরিক হয়েও জীবিত থেকেছেন এবং পরবর্তী সময়ে মুসলিম রাষ্ট্রের বিনির্মাণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। নবীজির ইন্তেকালের পর তারা ইসলামি রাষ্ট্রের সুমহান ও গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহে শরিক ছিলেন। এ ধরনের মহান ও আদর্শ কাফেলার কর্মপ্রচেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামি রাষ্ট্র। কোনো পার্থিব প্রাপ্তির মোহ নয়; বরং একমাত্র জান্নাতই ছিল তাদের কাম্য। আর তাই তারা স্থাপন করতে পেরেছিলেন ত্যাগ ও কুরবানির অনুপম সব দাস্তান। ইতিহাস যদিও পৃথিবীর সকল যুগের সকল শ্রেণির মানুষের কর্ম ও কীর্তির তথ্য সংরক্ষণ করেছে; কিন্তু এই মহান কাফেলার সঙ্গে তুল্য কোনো ব্যক্তি বা দলের নমুনা তুলে ধরতে ইতিহাস সব সময়ই ব্যর্থ হয়েছে।

* * *

হিজরত থেকে ওফাত

মদিনায় হিজরত

আকাবার দ্বিতীয় বায়আতের পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে ইয়াসরিবে হিজরত করার নির্দেশ দেন। সবার আগে হিজরত করেন আবু সালামা বিন আবদুল আসাদ রাযি.। এরপর সস্ত্রীক হিজরত করেন আমির বিন রাবিয়া রাযি.। তারপর আবদুল্লাহ বিন জাহাশ রাযি., উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.। উমর রাযি.-ই একমাত্র সাহাবি, যিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে হিজরত করেছিলেন। এরপর পর্যায়ক্রমে সাহাবায়ে কেরামের হিজরত চলতে থাকে। নবীজি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতির প্রতীক্ষায় মক্কাতেই অবস্থান করেন। আবু বকর রাযি. ও আলি বিন আবু তালিব রাযি. ব্যতীত নবীজির সঙ্গে মক্কায় কেবল সেসব সাহাবিই রয়ে গিয়েছিল, কুরাইশরা যাদের আটকে রেখেছিল বা কোনোভাবে বিপদে ফেলেছিল।

আবু বকর রাযি. কয়েকবারই নবীজির কাছে হিজরতের অনুমতি চেয়েছিলেন। নবীজি তাকে উত্তর দেন, 'তাড়াহুড়া করো না; সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তোমাকে সফরসঙ্গী বানাবেন।' এরপর থেকে আবু বকর রাযি. নবী-সান্নিধ্যের প্রতীক্ষা করতে থাকেন।

মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় দেখতে পায়—ইতিমধ্যে মক্কার বাইরেও নবীজির উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অনুসারী তৈরি হয়ে গেছে এবং মক্কার মুসলমানরা হিজরত করে তাদের কাছে চলে যাচ্ছে। এভাবে মুসলমানরা ধীরে ধীরে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সমবেত হচ্ছে। তারা উপলব্ধি করে, সবশেষে স্বয়ং নবীজিও সেখানে হিজরত করবেন এবং সকলকে একত্র করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। তাই নিজেদের করণীয় ঠিক করতে কুরাইশরা মক্কার 'দারুন নাদওয়া' নামক পরামর্শগৃহে সমবেত হয়। পরামর্শের পর তারা নবীজিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা পরিকল্পনা করে,

কুরাইশের প্রতিটি শাখা-গোত্র নিজেদের একেকজন শক্তিশালী যুবককে নির্বাচন করবে এবং তাকে তীক্ষ্ণ ও ধারালো তরবারি প্রদান করবে। যুবকরা সকলে মিলে নবীজির ঘরের বাইরে অবস্থান গ্রহণ করবে এবং প্রত্যুষে যখন তিনি বের হবেন, তখন সকলে একযোগে আক্রমণ করে নবীজিকে হত্যা করবে। হত্যাকাণ্ডে সকল গোত্র জড়িত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম পুরো মক্কার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ-যুদ্ধের দুঃসাহস দেখাবে না; বরং রক্তপণ পেয়েই তুষ্ট থাকবে।

কুরাইশরা এ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অব্যবহিত পরেই হজরত জিবরাইল আ. নবীজির কাছে উপস্থিত হন এবং নবীজিকে আপন গৃহে শয্যাগ্রহণ করতে নিষেধ করেন। এরপর নবীজি হজরত আলি রাযি.-কে চাদর মুড়ি দিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন এবং আশ্বাস দেন যে, কাফিররা তার কোনো অনিষ্ট সাধন করতে পারবে না।

নীরব-নিস্তব্ধ রজনী। নবীজি মুশরিকদের সামনে দিয়েই ঘর থেকে বের হলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তো তাদের দৃষ্টি অন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে দরজায় অপেক্ষমান ঘাতক যুবকরা কিছুই দেখতে পেল না। নবীজি এক মুষ্টি কঙ্কর নিয়ে তাদের উদ্দেশে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত কঙ্কর আল্লাহর হুকুমে প্রত্যেকের মাথায় পতিত হলো। নবীজি সেখান থেকে আবু বকর রাযি.-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। আবু বকর রাযি. এই মোবারক সফরের জন্য প্রয়োজনীয় পাথেয়, বাহন ও পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন উরায়কিতকে সঙ্গে নিয়ে নবীজির প্রতীক্ষাতেই ছিলেন। এভাবেই মুশরিকদের অপচেষ্টা ব্যর্থ হলো। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন—

﴿وَ اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ؕ وَ يَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ﴾

(হে নবী,) সেই সময়কে স্মরণ করুন যখন কাফিররা ষড়যন্ত্র করছিল—আপনাকে বন্দি করবে, অথবা হত্যা করবে কিংবা দেশ থেকে বহিষ্কার করবে। তারা তো নিজেদের ষড়যন্ত্র পাকাচ্ছিল আর আল্লাহও নিজ কৌশল প্রয়োগ করছিলেন। বস্তুত আল্লাহ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল প্রয়োগকারী। [সুরা আনফাল : ৩০]

হিজরতের জন্য নবীজির সুদৃঢ় পরিকল্পনা

হিজরতের জন্য প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং সফরে যাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব ও ভূমিকা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করে দেন। ফলে পুরো পরিকল্পনাটি সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত রূপ লাভ করে। নিম্নের বিবরণে বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. নবীজি আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্য তার বাড়িতে গমন করেন দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে। এ সময় সাধারণত তিনি আবু বকরের বাড়িতে যেতেন না।

২. নবীজি মুখ ঢেকে বের হন, যেন কেউ তাকে চিনতে না পারে।

৩. হিজরতের উদ্দেশ্যে নবীজি আবু বকরের বাড়ি থেকে তাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের আঁধারে পেছনের দরজা দিয়ে বের হন, যেন কেউ তাদেরকে দেখতে না পায়।

৪. নবীজির কাছে মক্কার বিভিন্নজনের আমানত গচ্ছিত ছিল। তাই তিনি আলি বিন আবু তালিব রাযি.-কে গচ্ছিত আমানত মালিকদের কাছে পৌঁছিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব দেন এবং তাকে কয়েকদিন পর ইয়াসরিব অভিমুখে রওনা হতে বলেন।

৫. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাযি. তাদের পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ বিন উরায়কিতের সঙ্গে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যে, তারা উভয়ে তিনদিন পর ছাওর-গুহায় আবদুল্লাহর সঙ্গে মিলিত হবেন।

৬. নবীজি আবু বকর-পুত্র আবদুল্লাহকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন কুরাইশদের কর্মতৎপরতার নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন এবং প্রতিদিন রাতে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎপূর্বক বিস্তারিত অবহিত করে ফজরের পূর্বেই মক্কায় ফিরে আসেন। সবাই যেন মনে করে যে, তিনি রাতে মক্কায়ই ছিলেন।

৭. আবু বকর-কন্যা আসমা রাযি.-এর দায়িত্ব ছিল গুহায় খাবার পৌঁছিয়ে দেওয়া।

৮. আবু বকর রাযি.-এর ক্রীতদাস আমির বিন ফুহায়রা গুহার চারপাশে মেষ চরাতেন এবং সেখানেই মেষগুলোর বিশ্রামের ব্যবস্থা করতেন। ফলে আবদুল্লাহ ও আসমার পায়ের ছাপ মুছে যেত। একইসঙ্গে তিনি নবীজি ও আবু বকরকে পাথেয় ও দুধ সরবরাহ করতেন।

৯. নবীজি ও তার সঙ্গী আবু বকর রাযি. তিনদিন ছাওর গুহায় অবস্থান করেন। ততদিনে কুরাইশদের অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা স্তিমিত হয়ে আসে এবং তারা ধারণা করে যে, নবীজি ইতিমধ্যে ইয়াসরিবে পৌঁছে গেছেন। এরপর নবীজি আবু বকরকে নিয়ে সফর অব্যাহত রাখেন।

১০. অনুসন্ধানরত কুরাইশ মুশরিকদের বিভ্রান্ত করতে নবীজি আবু বকরকে নিয়ে প্রথমে উত্তরে অবস্থিত ইয়াসরিবের পথ না ধরে দক্ষিণে ইয়ামেনের পথ ধরেন।

নবীজি পথে কোবায় চারদিন অবস্থান করেন। হজরত আলি রাযি. আপন দায়িত্ব সমাপ্ত করে কোবায় নবীজির সঙ্গে মিলিত হন। নবুওয়তের চতুর্দশ বছর (বা ১ম হিজরি সনের) রবিউল আউয়াল মাসের বারো তারিখ (৬২২ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) রোজ শুক্রবার নবীজি ইয়াসরিবে পৌঁছান। নবীজির আগমনধন্য ইয়াসরিবের নতুন নাম হয় 'আল-মদিনাতুল মুনাওয়ারা' বা আলোকিত নগরী। মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে সূচিত হয় এক নব-অধ্যায়, যাবতীয় উপাদানে সমৃদ্ধ এক ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। এ রাষ্ট্রের ভূমি ছিল ইয়াসরিব, যার জনগণ হলো মুহাজির ও আনসারগণ, সংবিধান হলো আল-কুরআন আর রাষ্ট্রনায়ক হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

নবীন ইসলামি রাষ্ট্রের বিনির্মাণে নবীজির কর্মধারা

১. মসজিদ নির্মাণ

মদিনায় পৌঁছেই নবীজি মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সশরীরে নির্মাণকাজে অংশগ্রহণ করেন। নবীজির অংশগ্রহণে ইসলামের ইতিহাসে মসজিদে নববি এক অনন্য বৈশিষ্ট্য-মর্যাদা লাভ করে। মসজিদে নববি কেবল নামাজ আদায়ের স্থানই নয়;

বরং এমন এক স্বতন্ত্র শিক্ষাঙ্গনে পরিণত হয়, যেখান থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে ইসলামের পতাকাবাহী কাফেলার প্রথম প্রজন্ম। পরবর্তীকালে মসজিদে নববিতেই মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচন করা হতো এবং এখানেই মুসলিম জনগণ খলিফার হাতে বায়আত গ্রহণ করত। মসজিদে নববিতেই ইসলামি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। এখান থেকেই দেশ-দেশান্তরে বিজয়াভিযান প্রেরিত হতো এবং এখানেই নবীজি বিভিন্ন গোত্রের প্রতিনিধিদল, রাজন্যবর্গ ও রাজ-দূতদের স্বাগত জানাতেন।

২. মুহাজির-আনসার ভ্রাতৃত্বস্থাপন

এটি ছিল ইসলামি রাষ্ট্রের বিনির্মাণে নবীজির গৃহীত দ্বিতীয় মূল ভিত্তি। তিনি মুহাজির ও আনসারদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের এমন অভূতপূর্ব সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, মানবতা তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে যার কোনো দৃষ্টান্ত লাভ করেনি।

নবীজির নির্দেশে আনসারি সাহাবিরা সাদরে, উদারচিত্তে ও সন্তুষ্টমনে তাদের মুহাজির ভাইদের জন্য নিজেদের হৃদয়দ্বার ও গৃহদরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। কোনো মুহাজির সাহাবি তার আনসারি ভাইয়ের কাছে উপস্থিত হলেই আনসারি সাহাবি দ্রুত তার সম্পদ ও বাড়ি দু-ভাগ করে এক ভাগ তার মুহাজির ভাইকে সোপর্দ করতেন। এভাবেই নবীজি সকল মুসলমানের মাঝে হৃদয়ের বন্ধন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। ফলে রক্ত-বংশসহ মানবিক সম্পর্কের সকল কার্যকারণের ওপরে উন্নীত হয়েছিল ঈমানি বন্ধন। আর পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের এই সম্পর্ক ও বন্ধন লাভ করেছিল সকল বন্ধনের ওপর অগ্রাধিকার।

৩. মুসলিম-ইহুদি মৈত্রীচুক্তি

মদিনায় মুসলমানদের অবস্থান স্থিতিশীল হওয়ার পর এবং মদিনার অধিকাংশ অধিবাসী ইসলামগ্রহণ করার পর নবীজি মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের সঙ্গে চুক্তি করেন।[১৮] চুক্তিতে ইহুদিদের নিজ ধর্ম ও সম্পদের

---

১৮. মদিনায় ইহুদিদের প্রথম পদার্পণ কীভাবে হয়েছিল—এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। একদল ঐতিহাসিকের মতে আল্লাহর নবী মুসা আ.-এর সঙ্গে হজ করতে আসা কিছু ইহুদি ফেরার পথে মদিনায় থেকে গিয়েছিল এবং বসতি স্থাপন করেছিল। অন্য আরেক দলের মতে শামে রোমানদের আগ্রাসনের কারণে আত্মরক্ষা=

অধিকার প্রদান করা হয় এবং তাদের অধিকার ও দায়িত্ব এবং প্রাপ্য ও করণীয় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়।

গাযওয়া ও সারিয়্যাসমূহের বিবরণ

জিহাদের অনুমতিদান

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন,

নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা যথার্থ ও উপযুক্ত সময়েই জিহাদের বিধান অবতীর্ণ করেছেন। কেননা, মুসলমানগণ যখন মক্কায় ছিলেন, তখন মুশরিকরা ছিল সংখ্যায় অধিক আর মুসলমানগণ ছিলেন অতি অল্প। তখন যদি মুসলমানদের ওপর জিহাদ-বিধান অবতীর্ণ হতো, তাহলে তা তাদের জন্য কঠিন বিবেচিত হতো। এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, আকাবার রজনীতে যখন মদিনা হতে আগত প্রায় আশিজন নওমুসলিম সাহাবি নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করেন এবং নবীজিকে বলেন, আল্লাহর

=করতে কিছু ইহুদি মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তৃতীয় আরেকটি মত হলো, বুখতে নাসার-এর সাম্রাজ্য থেকে পালিয়ে কিছু ইহুদি মদিনায় বসতি স্থাপন করেছিল। পরবর্তীকালে কিছু আরব জনগোষ্ঠী তাদের সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। কালের পরিক্রমায় এসব ইহুদিদের বংশধরই নবীজির হিজরতের সময় মদিনায় বসবাস করছিল। হিজরতের সময় বনু নজির, বনু কুরায়যা ও বনু কায়নুকাসহ ছোট-বড় প্রায় পঁচিশটি ইহুদি গোত্র মদিনায় বসবাস করত।

ইহুদিদের মদিনায় বসতি স্থাপনের প্রায় সমসাময়িক কালেই ইয়ামেনের মা'দিকারিব অঞ্চলে পবিত্র কুরআনে (সুরা সাবায়) উল্লেখিত ঐতিহাসিক প্লাবন সংঘটিত হয়। তখন সেখানে বসবাসকারী কিছু লোক গোত্রের প্রবীণ নেতা আমর বিন ছা'লাবার পরামর্শে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। তাদেরই একটি অংশ বনু কালার প্রধান-পুরুষ হারিসা বিন যায়দ বিন সাওয়াদ বিন আসলাম জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের মাধ্যমে জানতে পারেন—আসমানি গ্রন্থসমূহে শেষনবীর আবাসস্থলের যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ আছে, তা ইয়াসরিব এলাকায় বিদ্যমান আছে। তখন তিনি ইয়াসরিবে বসতি স্থাপন করেন। হারিসার দুই পুত্রের নাম ছিল আওস ও খাযরাজ। তাদের বংশধররাই হিজরতের পর মদিনায় নবীজিকে বরণ করে নিয়েছিল এবং 'আনসার' উপাধি লাভ করেছিল। হিজরতের সময় মদিনায় আওস ও খাযরাজ গোত্রের শাখাগোত্রের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে তেরো ও ছত্রিশটি।

মক্কা থেকে নবীজি ও মুহাজির সাহাবায়ে কেরামের হিজরতের সময় মদিনায় মূলত এই দুই শ্রেণির মানুষই বসবাস করত।

রাসুল, আমরা এই উপত্যকাবাসীর (মিনাবাসীর) ওপর আক্রমণ করে এই রাতেই তাদের ধরাশায়ী করে ফেলব, তখন নবীজি উত্তর দেন, আমি এখনো এর জন্য আদিষ্ট হইনি। এরপর মুশরিকরা যখন অত্যধিক অত্যাচার শুরু করে, নবীজিকে দেশান্তরে বাধ্য করে, তার প্রাণনাশের চেষ্টা চালায় এবং নানারকম নির্যাতন-উৎপীড়ন করে তার সঙ্গীদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করে, তখন তাদের একদল হাবশায় গমন করে, অপরদল মদিনায় হিজরত করে। অবশেষে সাহাবায়ে কেরাম যখন মদিনায় স্থির হন এবং মদিনায় নবীজির শুভাগমন হয়, তখন সকলে নবীজির নেতৃত্বে একত্র হন এবং সকলেই নবীজির সাহায্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এভাবে মদিনা যখন মুসলমানদের জন্য একটি ইসলামি রাষ্ট্র ও আশ্রয় গ্রহণের দুর্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলা শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করার অনুমতি দান করেন এবং এ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত নাজিল হয়—

﴿أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ۭ وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ﴾

যাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে, যেহেতু তাদের প্রতি জুলুম করা হয়েছে, তাই তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে (তারা নিজেদের প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ করতে পারে)। নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ তাদেরকে জয়যুক্ত করতে পরিপূর্ণ সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ি হতে অন্যায়ভাবে কেবল এ কারণে বিতাড়িত করা হয়েছে যে, তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ।

[সুরা হাজ : ৩৯-৪০][১৯]

বদর যুদ্ধের পূর্বের অভিযানসমূহ[২০]

১. সারিয়্যায়ে সিফুল বাহর। ১ম হিজরি সনের রমজান মাসে সংঘটিত হয়। হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব রাযি.-এর নেতৃত্বে ত্রিশজন মুহাজির এতে অংশগ্রহণ করেন।[২১]

২. সারিয়্যায়ে রাবিগ। ১ম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে সংঘটিত হয়। উবায়দা ইবনুল হারিস রাযি.-এর নেতৃত্বে ষাটজন মুহাজির সাহাবি এতে অংশগ্রহণ করেন।[২২]

৩. সারিয়্যাতুল খাররার। ১ম হিজরি সনের জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়। সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-এর নেতৃত্বে বিশজন সাহাবি এতে অংশগ্রহণ করেন।[২৩]

৪. গাযওয়ায়ে আবওয়া বা গাযওয়ায়ে ওয়াদ্‌দান। ২য় হিজরি সনের সফর মাসে সংঘটিত হয়। স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

২০. **গাযওয়া ও সারিয়্যা** : নবীযুগে সংঘটিত সামরিক অভিযানসমূহকে হাদিসবিশারদ, সিরাতরচয়িতা ও ঐতিহাসিকগণ দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। এক. গাযওয়া : যেসব অভিযানে নবীজি নিজে অংশগ্রহণ করেছেন এবং নেতৃত্বদান ও পরিচালনা করেছেন। দুই. সারিয়্যা : যেসব অভিযানে নবীজি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি; বরং কোনো সাহাবিকে বাহিনী-প্রধান নির্ধারণ করে অভিযানে প্রেরণ করেছেন।

কখনো কখনো অভিযানের সফলতার লক্ষ্যে মূল অভিযানের পূর্বে এক বা একাধিক ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করা হতো। তদ্রূপ শত্রুপক্ষের গতিবিধির তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেও প্রেরণ করা হতো ক্ষুদ্র কাফেলাকে। শাস্ত্রবিদগণ সেগুলোকেও সারিয়্যারূপে গণ্য করেছেন। উল্লেখ্য, কোনো অভিযানে সরাসরি সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও পরিভাষায় তাকে গাযওয়া বা সারিয়্যা বিবেচনা করা হয়।

প্রসিদ্ধ ও অগ্রগণ্য মতানুসারে গাযওয়ার সংখ্যা সাতাশটি, যার মধ্যে আটটি মতান্তরে নয়টিতে প্রত্যক্ষ লড়াই সংঘটিত হয়। গাযওয়াসমূহের মধ্যে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ গাযওয়া হচ্ছে সাতটি—১. বদর (রমজান, ২য় হিজরি) ২. উহুদ (শাওয়াল, ৩য় হিজরি) ৩. খন্দক (শাওয়াল, ৫ম হিজরি) ৪. খায়বার (মুহাররম, ৭ম হিজরি) ৫. মক্কাবিজয় (রমজান, ৮ম হিজরি) ৬. হুনায়ন (শাওয়াল, ৮ম হিজরি) ও ৭. তাবুক (রজব, ৯ম হিজরি)। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, *সীরাত বিশ্বকোষ*, ৬/১৪০-১৭৭।

২১. সিফুল বাহর অর্থ সমুদ্রতীর। লোহিত সাগরের উপকূলে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর মুখোমুখি হওয়ায় এই নামকরণ করা হয়।

২২. মুসলিম বাহিনী বতনে রাবিগ এলাকায় প্রেরিত হওয়ায় এ অভিযানকে সারিয়্যারে রাবিগ নামকরণ করা হয়।

২৩. খাররার অভিমুখে প্রেরিত হওয়ায় অভিযানের নাম সারিয়্যায়ে খাররার।

ওয়াসাল্লাম সত্তরজন মুহাজির সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন।[২৪]

৫. গাযওয়ায়ে বুওয়াত। ২য় হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে সংঘটিত হয়। নবীজি দুইশ সাহাবিকে নিয়ে এ অভিযান পরিচালনা করেন।[২৫]

৬. গাযওয়ায়ে সাফওয়ান। ২য় হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসেই সংঘটিত হয়। নবীজি সত্তরজন সাহাবিকে নিয়ে এই অভিযান পরিচালনা করেন। মদিনার চারণভূমিতে কুরয বিন জাবির আল-ফিহরি আক্রমণ করার প্রতিক্রিয়ায় এ গাযওয়া সংঘটিত হয়।[২৬]

৭. গাযওয়ায়ে যুলউশায়রা। ২য় হিজরি সনের জুমাদাল উলা ও জুমাদাল উখরা মাসে সংঘটিত হয়। নবীজি দেড়শ মতান্তরে দুইশ সাহাবিকে নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন।[২৭]

৮. সারিয়্যায়ে নাখলা। ২য় হিজরি সনের রজব মাসে সংঘটিত হয়। আবদুল্লাহ বিন জাহ্‌শ আসাদির নেতৃত্বে বারোজন মুহাজির সাহাবি এতে অংশগ্রহণ করেন।[২৮]

---

২৪. **আবওয়া** : মদিনা হতে প্রায় আশি মাইল দূরে অবস্থিত একটি এলাকার নাম। কুরাইশদের একটি বাণিজ্যকাফেলার গতিরোধের উদ্দেশ্যে এ অভিযান পরিচালিত হলেও কোনো সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি।

২৫. **বুওয়াত** : মদিনা হতে শাম যাওয়ার পথে জুহায়না অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম। আরেকটি কুরাইশ বাণিজ্যকাফেলার গতিরোধের উদ্দেশ্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

২৬. মুসলিম বাহিনী বদরের নিকটবর্তী সাফওয়ান নামক এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেছিল বলে একে গাযওয়ায়ে সাফওয়ান বলা হয়। এই গাযওয়ার আরেক নাম বদরের প্রথম অভিযান। উল্লেখ্য, কুরয বিন জাবির আল-ফিহরি পরবর্তী সময়ে ইসলামগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন অভিযানে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

২৭. মক্কা হতে শামে গমনরত একটি কুরাইশ বাণিজ্যকাফেলাকে বাধাদানের উদ্দেশ্যে এ অভিযান পরিচালিত হয়। মুসলিম বাহিনী যুলউশায়রা নামক স্থানে পৌঁছার পর জানতে পারে যে, বাণিজ্যকাফেলা কয়েকদিন পূর্বেই এ স্থান অতিক্রম করে চলে গেছে। উক্ত কুরাইশকাফেলা শাম থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ই ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

২৮. **নাখলা** : মক্কা ও তায়েফের মধ্যে অবস্থিত একটি স্থানের নাম নাখলা। এই অভিযানে যৎসামান্য সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

বদর যুদ্ধের পূর্বে সংঘটিত এই সকল গাযওয়া ও সারিয়্যার একটিতেও প্রত্যক্ষ লড়াই বা হতাহতের ঘটনা ঘটেনি; মুসলমানরা কোনো মুশরিককে হত্যাও করেনি। কেবল সারিয়্যায়ে নাখলায় আমর ইবনুল হাযরামিকে হত্যা করা হয়েছিল। পবিত্র মাসচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত রজব মাসে এ ঘটনা ঘটায় নবীজি সাহাবিদেরকে ভর্ৎসনা করেন এবং বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পবিত্র মাসে লড়াইয়ের নির্দেশ দিইনি।' এরপর নবীজি নিহতের পরিবারকে রক্তপণ প্রদান করেন।

কিবলা পরিবর্তন এবং এর সূক্ষ্ম তাৎপর্য

শায়খ মুবারকপুরি রহ. বলেন,

সেই সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরির শাবান মোতাবেক ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তে কাবাঘরকে কিবলা হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দেন। এই পরিবর্তনের ফলে যেসব দুর্বল ঈমানদার বা কপট ইহুদি মুসলমানদের মাঝে অস্থিরতা ও জটিলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলিমবেশে মুসলমানদের কাতারে ঢুকে পড়েছিল, তারা চিহ্নিত হয়ে যায় এবং মুসলমানদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম জামাত প্রচুর সংখ্যক প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক হতে মুক্ত ও পবিত্র হয়।

কিবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে সম্ভবত মুসলমানদের এই সূক্ষ্ম বিষয়েও অবগত করা হয়েছে যে, এখন থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হতে যাচ্ছে, যার পরিসমাপ্তি ঘটবে উক্ত কিবলা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে আসার মাধ্যমে। কারণ, কোনো জাতির কিবলা থাকবে শত্রুদের দখলে, এর চেয়ে বিস্ময়ের বিষয় আর কী হতে পারে?! যদি কোনো জাতি হক ও সত্যের পথে থাকে আর তাদের কিবলা অন্যের দখলদারিতেও থাকে, তাহলে অবশ্যই তারা তা একদিন না একদিন মুক্ত করবেই।[২৯]

---

২৯. সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ১৮২।

বদর যুদ্ধ

বদর যুদ্ধকে ইসলামি ইতিহাসের প্রথম নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়। আর এ কারণেই বদর যুদ্ধের দিনকে বলা হয় 'ইয়াওমুল ফুরকান' বা পার্থক্য নিরূপণের দিন। কেননা, এ দিন আল্লাহ তাআলা হক ও বাতিল এবং ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য-রেখা টেনে দিয়েছেন।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

নবীজি সংবাদ পেয়েছিলেন—কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি বণিক-কাফেলা প্রচুর সম্পদসহ শাম থেকে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে। কুরাইশরা মুহাজির মুসলমানদের যেসব সম্পদ কুক্ষিগত করেছিল, প্রিয়নবী এই বণিক-কাফেলার ওপর হামলা চালিয়ে তার কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করার মনস্থ করেন। নবীজি সাহাবিদের বলেন, 'কুরাইশদের বণিক-কাফেলা প্রভূত সম্পদ নিয়ে ফিরছে। এই কাফেলার উদ্দেশে তোমরা বেরিয়ে পড়ো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ পাক সমুদয় সম্পদ তোমাদেরকে গনিমত হিসেবে প্রদান করবেন।'

নবীজির ঘোষণার পর কিছু সংখ্যক সাহাবি মুজাহিদ কাফেলায় যোগদান করলেও অনেকেই মদিনায় থেকে যান। তারা মনে করেছিলেন, (অতীত অভিযানগুলোর মতো) এবারও প্রত্যক্ষ লড়াই সংঘটিত হবে না। অধিকন্তু কুরাইশকাফেলার সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র চল্লিশজন। দ্বিতীয় হিজরি সনের ৮ রমজান (৬২৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) নবীজি মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। নবীজি মদিনার ব্যবস্থাপনা-দায়িত্ব আবু লুবাবা রাযি.-কে এবং ইমামতির দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাযি.-কে প্রদান করে যান।

আবু সুফিয়ানের মক্কায় সংবাদ প্রেরণ

মুসলিম বাহিনী মদিনা ত্যাগ করতেই কুরাইশপ্রধান আবু সুফিয়ান গুপ্তচর মারফত এ সংবাদ পেয়ে যান। তিনি এ সংবাদ মক্কার কুরাইশদেরকে জানাতে তৎক্ষণাৎ আমর বিন যামযাম গিফারিকে মক্কায় প্রেরণ করেন। মক্কায় পৌঁছেই আমর বিন যামযাম (তৎকালীন রীতি অনুযায়ী) আপন

বাহনজন্তুর মুখমণ্ডলে আঘাত করে রক্তাক্ত করে। এরপর সে বাহনের মুখ ঘুরিয়ে দেয়, নিজের পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফেলে এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, কুরাইশ সম্প্রদায়, শোনো! কাফেলা! কাফেলাকে রক্ষা করো! তোমাদের যে সম্পদ আবু সুফিয়ানের কাছে আছে, মুহাম্মাদ ও তার সঙ্গীরা তার ওপর হামলা করতে যাচ্ছে। আমার মনে হয় না, বিলম্ব করলে তোমরা তা রক্ষা করতে পারবে। সাহায্য! দ্রুত সাহায্য নিয়ে চলো।

আসন্ন বিপদের সংবাদ পেয়ে কুরাইশরা দ্রুত যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বণিক-কাফেলার নিরাপত্তারক্ষায় একটি বাহিনী গঠন করে। কুরাইশদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবু লাহাব ব্যতীত সবাই বাহিনীতে শরিক হয়। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল নয়শ পঞ্চাশ, ঘোড়ার সংখ্যা ছিল একশ আর উট সাতশ।

বণিক-কাফেলার নিরাপদ প্রস্থান

এদিকে আবু সুফিয়ান মক্কায় সংবাদ পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত না থেকে নিজেও আত্মরক্ষার চেষ্টা চালান। তিনি মক্কায় ফেরার প্রচলিত পথ ছেড়ে সমুদ্র উপকূলের পথ ধরে তার কাফেলা নিয়ে পালাতে সক্ষম হন। এরপর তিনি কুরাইশদের কাছে সংবাদ পাঠান যে, এখন আর কোনো আশঙ্কা নেই, কুরাইশ রণ-কাফেলা ফিরে যেতে পারে। কিন্তু কুরাইশ-নেতা আবু জাহল মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ব্যতীত ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে, আমি শপথ করছি—বদর প্রান্তরে পৌঁছে সেখানে তিন দিন অবস্থান না করে আমরা ফিরব না। আমরা সেখানে উট জবাই করব, আহার-উৎসব করব, মদ পান করব এবং দাসীদের গীতি-নৃত্য উপভোগ করব। সারা আরবে আমাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে এবং আরববাসী চিরদিন আমাদের কীর্তি নিয়ে গৌরব করবে। সুতরাং চলো সবাই বদরপানে।

সাহাবিদের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ

কুরাইশ বণিক-কাফেলার প্রস্থান এবং যুদ্ধ-বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে নবীজি করণীয় ঠিক করতে বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শে বসেন। বিশেষ করে আনসারি সাহাবিদের মতামত জানা জরুরি ছিল। কারণ, ইতিপূর্বে তারা কেবল মদিনার অভ্যন্তরে নবীজিকে নিরাপত্তা প্রদানের বায়আত গ্রহণ করেছিল। এখন যেহেতু নবীজি মদিনার বাইরে

বেরিয়ে এসেছেন, তাই তাদের মতামত জানা অপরিহার্য ছিল। নবীজি সমবেত সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।

নবীজির আহ্বান শুনে প্রথমে আবু বকর রাযি. দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে আপন মনোভাব প্রকাশ করেন। এরপর উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. দাঁড়ান এবং তিনিও উত্তম পরামর্শ প্রদান করেন। এরপর দণ্ডায়মান হন মিকদাদ বিন আমর রাযি.[৩০]। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, আপনি তাতে অবিচল থাকুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর শপথ! বনি ইসরাইল মুসা আ.-কে যেমন জবাব দিয়েছিল, আমরা আপনাকে সেরূপ জবাব দেবো না। তারা বলেছিল, 'মুসা, তুমি ও তোমার রব যাও এবং যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকব।' কিন্তু আমরা বলব, 'হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ও আপনার রব যুদ্ধ করুন; আমরাও আপনাদের সঙ্গে মিলে যুদ্ধ করব।' ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে (ইয়ামেনের দিকে আরব উপদ্বীপের শেষ প্রান্তে অবস্থিত) বারকুল গিমাদ পর্যন্তও অগ্রসর হন, আমরা আপনার সঙ্গেই থাকব।

মিকদাদ রাযি.-এর মতামত শুনে নবীজি অত্যন্ত খুশি হন। তিনি মিকদাদের প্রশংসা করেন এবং তার জন্য দোয়া করেন। এরপর নবীজি পুনরায় বলেন, 'তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও।' তখন আওস গোত্রপ্রধান ও আনসারদের নেতা সাদ বিন মুআয রাযি. দাঁড়িয়ে বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর শপথ! সম্ভবত আপনি আমাদের মতামত জানতে চাচ্ছেন?' নবীজি উত্তর দেন, 'হ্যাঁ।' তখন সাদ বিন মুআয রাযি. বলেন, 'আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যে দ্বীন নিয়ে আগমন করেছেন, তা হক ও সত্য। আপনার নিঃশর্ত আনুগত্যের প্রতি আমরা স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি। সুতরাং আপনি যা কল্যাণকর মনে করছেন, সে পথে অগ্রসর হোন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। ওই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি আমাদের নিয়ে অগ্রসর হয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, আমরাও আপনার সঙ্গে ঝাঁপিয়ে

---

৩০. তিনি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন।

পড়ব। আমাদের একজনও তাতে সামান্য দ্বিধা করবে না। আগামীকাল আপনি আমাদের নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করলেও আমরা অপছন্দ করব না। আমরা তো যুদ্ধক্ষেত্রে অটল-অবিচল, শত্রুর মোকাবিলায় নিষ্ঠাবান। হয়তো আল্লাহ পাক আমাদের দ্বারা এমন কর্ম সম্পাদন করাবেন, যা আপনার চক্ষু শীতল করবে। সুতরাং আল্লাহর রহমত ও বরকতকে সঙ্গী করে আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

সাদ রাযি.-এর বক্তব্য শুনে নবীজি অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন, 'চলো, আনন্দের সঙ্গে চলো। আল্লাহ তাআলা আমাকে দু-দলের (বণিক-কাফেলা ও যুদ্ধ-বাহিনী) কোনো একটির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর শপথ! আমি যেন এখন (কুরাইশ) কওমের বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।'

হুবাব ইবনুল মুনযির রাযি.-এর পরামর্শ

এরপর নবীজি মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং বদর প্রান্তরে পৌঁছে জলাশয়ের নিকটে উপত্যকার বালুকাময় নিম্নভূমিতে অবস্থান গ্রহণ করেন। তখন হুবাব ইবনুল মুনযির রাযি. নবীজিকে জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, এই অবতরণস্থল আল্লাহ তাআলাই ওহির মাধ্যমে নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন (তাহলে তো তাতে পরিবর্তনের সুযোগ নেই), নাকি এটা আপনার নিজস্ব অভিমত ও রণকৌশল?' নবীজি উত্তর দেন, 'এটা নিছক নিজস্ব অভিমত ও রণকৌশল।' তখন হুবাব রাযি. বলেন, 'আল্লাহর রাসুল, (রণকৌশল বিবেচনায়) এটা উপযুক্ত স্থান নয়। আমার মত হলো, আপনি সকলকে নিয়ে আরও সামনে চলুন, যেন আমরা শত্রুপক্ষের তুলনায় পানির তুলনামূলক বেশি কাছে থাকতে পারি। আমরা সেখানে ছাউনি স্থাপন করব, এরপর পেছনের অন্যান্য কূপ নষ্ট করে দেবো। আর আমরা সেখানে একটি হাউজ তৈরি করে তা পানি দ্বারা পূর্ণ করে রাখব। তাহলে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আমাদের পানির ব্যবস্থা থাকলেও তাদের থাকবে না।' নবীজি হুবাব রাযি.-এর পরামর্শ পছন্দ করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে শেষ কূপটির কাছে ছাউনি স্থাপন করেন। নবীজির নির্দেশে পেছনের কূপগুলো নষ্ট করে দেওয়া হয় এবং মুসলিম বাহিনীর অবস্থানস্থলের কাছের কূপটির পাশে একটি হাউজ তৈরি করে পানি দ্বারা পূর্ণ করা হয়। এ সময় সাহাবিগণ নিজেদের পাত্রগুলো পূর্ণ করে নেন।

উভয় বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও সেনাবিন্যাস

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল তিনশ চৌদ্দজন।[৩১] এর মধ্যে তিরাশিজন ছিলেন মুহাজির, একষট্টিজন আওস গোত্রীয় এবং একশ সত্তরজন খাযরাজ গোত্রীয়। মুসলিম বাহিনীর কাছে মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল—একটি যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর, অপরটি মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযি.-এর। উটের সংখ্যা ছিল সত্তরটি; প্রতি দু-তিনজন একটি উটে পালাক্রমে আরোহণ করতেন। মুসলিম বাহিনীর মূল ঝান্ডা ছিল মুসআব বিন উমায়র রাযি.-এর হাতে, মুহাজির অংশের পতাকা ছিল আলি রাযি.-এর হাতে আর আনসারিদের পতাকা ছিল সাদ বিন মুআয রাযি.-এর হাতে। মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুর নেতৃত্বে ছিলেন যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি., বামবাহুর নেতৃত্বে মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযি. এবং মধ্যবর্তী অংশের নেতৃত্বে কায়স বিন আবু সা'সাআ'হ রাযি.। আর পুরো বাহিনীর পরিচালন-দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছিল।

অপরদিকে মুশরিক বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল নয়শ পঞ্চাশ। তাদের সঙ্গে ছিল একশ ঘোড়া, সাতশ উট ও ছয়শ বর্ম। বাহিনীর নেতৃত্ব ছিল আবু জাহলের হাতে।

---

৩১. বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৯—বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। গবেষক আলিমগণ এসব বর্ণনার মাঝে এভাবে সামঞ্জস্যবিধান করেন যে, মুসলিম বাহিনী রওনা হওয়ার কিছুক্ষণ পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফেলার সদস্যসংখ্যা গণনা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন মোট ৩১৪ জন হয়েছিল। এরপর নবীজি পুনরায় গণনা করার নির্দেশ দেন। এ সময় দূর থেকে এক সাহাবি উটে আরোহণ করে কাফেলায় শরিক হওয়ার জন্য আসছিলেন। তাকে সহ গণনা করায় এবার মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১৫ জন। সুতরাং যদি উক্ত শেষ ব্যক্তিকে এবং স্বয়ং নবীজিকে-সহ হিসাব করা হয়, তাহলে মোট সংখ্যা হয় ৩১৫ জন, কোনো একজনকে বাদ দিলে ৩১৪ জন আর উভয় জনকে গণনায় না ধরলে ৩১৩ জন। আর কাফেলায় চারজন অল্পবয়স্ক সাহাবিও (হজরত বারা বিন আযিব রাযি., আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি., আনাস বিন মালিক রাযি. ও জাবির বিন আবদুল্লাহ রাযি.) ছিলেন, যাদের যুদ্ধ করার অনুমতি ছিল না। তাদেরকেও যোগ করা হলে কাফেলার মোট সদস্যসংখ্যা হয় ৩১৯ জন। দ্রষ্টব্য : সাইদ আহমাদ পালনপুরি রহ., *তুহফাতুল কারি*, ৮/৫৩।

সাদ বিন মুআযের প্রস্তাব

মুসলমানদের ছাউনি স্থাপন শেষে সাদ বিন মুআয রাযি. যুদ্ধক্ষেত্রে সার্বক্ষণিক নজর রাখতে নবীজির জন্য একটি আরিশ (মোর্চা) নির্মাণের প্রস্তাব রাখেন। নবীজি সাদের প্রস্তাবে খুশি হন এবং তার জন্য দোয়া করেন। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ছোট টিলার ওপর একটি আরিশ নির্মাণ করেন। নবীজির নিরাপত্তায় সাদ বিন মুআযের নেতৃত্বে আনসারি যুবকদের একটি দলকে আরিশের চারপাশে মোতায়েন করা হয়।

যুদ্ধপূর্ব রজনীতে

যুদ্ধের আগের পুরো রাত নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন রবের কাছে দোয়া ও অনুনয়-বিনয় করে অতিবাহিত করেন। নবীজি দোয়া করেন, হে আল্লাহ, যদি এ জামাতটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে আজকের পর পৃথিবীতে আর আপনার ইবাদত হবে না। একপর্যায়ে হজরত আবু বকর রাযি. এগিয়ে এসে নবীজিকে বলেন, 'আল্লাহ অবশ্যই আপনার দোয়া কবুল করবেন।' এরপর নবীজি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে বলেন, 'আবু বকর! সুসংবাদ গ্রহণ কর; আল্লাহর সাহায্য এসে গেছে। এই তো জিবরাইল ঘোড়ার লাগাম ধরে সম্মুখে ধুলা উড়িয়ে এগিয়ে আসছেন।'

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সুসংবাদ প্রদান করে বলেন,

«وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلٌ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ»

ওই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন! আজ যে ব্যক্তিই সাওয়াবের আশায় সবরের সঙ্গে (পিছু না হটে) সম্মুখপানে অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং শাহাদাত বরণ করবে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাত দান করবেন।[৩২]

---

৩২. ইবনে হিশাম, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ১/৬২৭, ইবনু সায়্যিদিন-নাস, *উয়ূনুল আছার*, ১/৩৩৮, ইবনে কাছির, *আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ*, ২/৪২০ ও সুহায়লি, *আর-রাওযুল উনুফ*, ৩/৭১।

যুদ্ধের সূচনা ও মুশরিকদের পরাজয়

দ্বিতীয় হিজরির সতেরো রমজান প্রত্যুষে যুদ্ধ শুরু হয়। মুশরিক বাহিনীর আসওয়াদ বিন আবদুল আসাদ মাখযুমি শপথ করেছিল—সে যেকোনো মূল্যে মুসলমানদের হাউজের পানি পান করবে, তা ধ্বংস করে ছাড়বে, অথবা এর জন্য জীবন দিয়ে দেবে। সে হাউজের দিকে অগ্রসর হতেই হামযা রাযি. তার দফারফা করেন। এরপর কুরাইশ কাফিরদের মধ্য হতে রাবিয়ার দুই পুত্র উতবা ও শায়বা এবং উতবার পুত্র ওয়ালিদ মল্লযুদ্ধের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে আসে। নবীজি তাদের মোকাবিলার জন্য তার চাচা হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব এবং দুই চাচাতো ভাই আলি বিন আবু তালিব ও উবায়দা বিন হারিসকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। হামযা রাযি. ও আলি রাযি. শায়বা ও ওয়ালিদকে হত্যা করেন। অপরদিকে উবায়দা রাযি. ও উতবার মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই হয়। ইতিমধ্যে হামযা ও আলি এগিয়ে এসে উতবার ইহলীলা সাঙ্গ করেন এবং আহত উবায়দা রাযি.-কে নবীজির কাছে নিয়ে আসেন।

এরপর দু-পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম অটলতা ও অবিচলতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মুসলিম বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয় এবং কাফির-মুশরিকদের চূড়ান্ত পরাজয়ের মাধ্যমে যুদ্ধ শেষ হয়। কাফিরপক্ষের সত্তরজন নিহত হয়, বন্দী হয় সমসংখ্যক। মুসলিম বাহিনীর চৌদ্দজন সদস্য বদর যুদ্ধে শহিদ হয়।

যুদ্ধবন্দি বিষয়ে সাহাবিদের সঙ্গে নবীজির পরামর্শ

যুদ্ধশেষে নবীজি যুদ্ধবন্দিদের সম্পর্কে করণীয় নির্ধারণ করতে সাহাবায়ে কেরামের মতামত জানতে চান। তিনি আবু বকর ও উমরকে জিজ্ঞেস করেন, 'এসব যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে তোমাদের মতামত কী?' উত্তরে আবু বকর রাযি. বলেন, 'আল্লাহর নবী! তারা তো আপনার পিতৃবংশীয় আত্মীয়স্বজন। আমার মত হলো, মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দিন। এর ফলে একদিকে আমাদের কাফিরদের বিরুদ্ধে শক্তি অর্জিত হবে, অপরদিকে ভবিষ্যতে হয়তো আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ইসলামের নিয়ামত দান করবেন।' নবীজি উমর রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেন, 'ইবনুল খাত্তাব! তোমার কী মত?' হজরত উমর রাযি. বলেন, 'আল্লাহর রাসুল! আল্লাহর শপথ করে বলছি—আমি আবু বকরের সঙ্গে

একমত নই। আমার মত হলো, আমরা তাদের হত্যা করব। আলির হাতে আকীলকে তুলে দিন, সে তাকে হত্যা করবে। আমার হাতে অমুককে (উমরের জনৈক নিকটাত্মীয়) তুলে দিন, আমি তাকে হত্যা করি। কারণ, এরা হলো কাফিরদের নেতৃস্থানীয় লোক।'

নবীজি আবু বকরের মত গ্রহণ করেন এবং মুক্তিপণ গ্রহণের ফয়সালা করেন। পরবর্তী সময়ে হজরত উমর রাযি.-এর মত সমর্থন করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাজিল হয়—

﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِي الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ۭ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

> কোনো নবীর পক্ষে এটা শোভনীয় নয় যে, জমিনে যতক্ষণ পর্যন্ত (শত্রুদের) রক্ত ব্যাপকভাবে প্রবাহিত না করা হবে, (যাতে তাদের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে শেষ হয়ে যায়,) ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে কয়েদি থাকবে। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ কামনা করো আর আল্লাহ (তোমাদের জন্য) আখিরাত (-এর কল্যাণ) চান। আল্লাহ ক্ষমতারও মালিক, হিকমতেরও মালিক।
>
> [সুরা আনফাল : ৬৭]

মুশরিকদের শবদেহ পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ

যুদ্ধ শেষে সাহাবিগণ মুশরিকদের মৃতদেহ বদরের একটি পরিত্যক্ত কূপে ফেলে দেন। নবীজি কূপের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, 'হে কূপবাসী, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অঙ্গীকার সত্যরূপে পেয়েছ কি? আমি তো আমার রবের প্রতিশ্রুতি ঠিক ঠিক পেয়েছি।'

মদিনায় বিজয়-সংবাদ

মুসলিম বাহিনী মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই মদিনাবাসীকে বিজয়ের সুসংবাদ অবহিত করতে নবীজি আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. ও যায়দ বিন হারিসা রাযি.-কে প্রেরণ করেন। মদিনার ইহুদি ও মুনাফিকরা মুসলিম বাহিনীর পরাজয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল। তারা মদিনায় অবস্থানরত মুসলমানদের উপহাস করে বলছিল, 'কুরাইশ বাহিনীর হাতেই মুসলমানদের চূড়ান্ত দফারফা হবে।' অবশেষে মুসলিম বাহিনীর বিজয়-সংবাদ মদিনায় পৌঁছলে তাদের মুখ বন্ধ হয়।

অপরদিকে পরাজিত মুশরিক বাহিনীর অবশিষ্টাংশ মক্কায় পৌছার পূর্বেই হাইসামান বিন ইয়াস মুশরিক বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ মক্কায় পৌছিয়ে দেয়।

পবিত্র কুরআনের সুরা আনফালে বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে।

বনু কায়নুকার যুদ্ধ

বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় মদিনায় বসবাসরত ইহুদিদের অন্তরে ইসলাম-বিদ্বেষ ও হিংসার আগুন নতুন করে উসকে দেয়। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে শত্রুতা ও অনিষ্টমূলক আচরণ করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে নবীজি ও মুসলমানদেরকে কষ্ট দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে নবীজি তাদেরকে কায়নুকা গোত্রের বাজারে সমবেত করে বলেন, 'হে ইহুদি সম্প্রদায়, কুরাইশদের ওপর যেমন দুর্যোগ আপতিত হয়েছে, তেমন দুর্যোগ তোমাদের ওপর আপতিত হওয়ার পূর্বেই সাবধান হও এবং ইসলামগ্রহণ করো। তোমরা তো নিশ্চিত জানো যে, আমি আল্লাহর প্রেরিত নবী। তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থে এবং আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তোমাদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতে আমার নবুওয়তের স্বীকৃতি পাবে।'

ইহুদিরা নবীজিকে উত্তর দেয়, 'মুহাম্মাদ, তুমি আমাদেরকে তোমার কওমের ন্যায় মনে করেছ! প্রবঞ্চনার শিকার হয়ো না। তুমি তো এমন এক কওমের মোকাবিলা করেছ, যাদের কোনো যুদ্ধ-জ্ঞানই নেই। ফলে তুমি সুযোগে দান মেরেছ। আল্লাহর শপথ! আমাদের সঙ্গে যদি লড়তে আসো, তাহলে নিশ্চিত বুঝবে, আমরা বীর জাতি।'

নবীজির সতর্কবাণীতে সতর্ক হওয়া দূরে থাক; ইহুদিরা বরং তাদের অবাধ্যতায় অবিচল থেকে বিভিন্নভাবে মুসলমানদের ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। একদিন জনৈকা মুসলিম নারী বনু কায়নুকার বাজারে তার পণ্য বিক্রি করার পর এক ইহুদি স্বর্ণকারের দোকানে বসেন। দুষ্ট ইহুদিরা তার সঙ্গে অসদাচরণ করে এবং বারবার তাকে চেহারা উন্মোচিত করার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। মুসলিম নারীটি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করার পর ইহুদি স্বর্ণকার কুবুদ্ধি এঁটে মহিলার অগোচরে তার পরিচ্ছদের একটি অংশ পিঠের সঙ্গে বেঁধে দেয়। ফলে তিনি যখন উঠে দাঁড়ান, তার নিম্নাংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। মুসলিম নারীকে লাঞ্ছিত

করে উপস্থিত ইহুদিরা উল্লাস করতে থাকে। মহিলার চিৎকারে জনৈক সাহাবি বিষয়টি অবগত হন এবং ঝাঁপিয়ে পড়ে ইহুদি স্বর্ণকারকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। তখন উপস্থিত ইহুদিরা সকলে মিলে উক্ত সাহাবিকে হত্যা করে। নিহতের পরিবার মুসলমানদের কাছে অভিযোগ করলে মুসলমানগণ সবকিছু শুনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ফলে মুসলমানদের সঙ্গে ইহুদি বনু কায়নুকা গোত্রের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। মদিনার ইহুদিদের মধ্যে বনু কায়নুকাই প্রথম নবীজির সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করেছিল।

নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে বনু কায়নুকার দুর্গের উদ্দেশে রওনা হন। মুসলিম বাহিনীকে দেখতে পেয়ে বনু কায়নুকার লোকেরা দুর্গদ্বার বন্ধ করে দুর্গের ভেতরেই আশ্রয় নেয়। নবীজি দুর্গের চতুর্দিকে কঠোর অবরোধ আরোপ করেন। দ্বিতীয় হিজরি সনের ১৫ শাওয়াল শনিবার বনু কায়নুকার দুর্গ অবরোধ করা হয়। এরপর (বনু কায়নুকার মিত্র) মুনাফিক-সর্দার ইবনে সালুলের পীড়াপীড়িতে নবীজি অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। ইবনে সালুল এ ঘটনার এক মাসেরও কম সময় পূর্বে বাহ্যিকভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল।

এরপর নবীজি বনু কায়নুকার ইহুদিদের মদিনা হতে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তারা মদিনা থেকে শামের আযরাআ'ত এলাকায় চলে যায়। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে তাদের অধিকাংশই সেখানে মারা যায়।

দ্বিতীয় হিজরির উল্লেখযোগ্য আরও কিছু ঘটনা

- ❖ নবীজির দুধভাই উসমান বিন মাযউন রাযি. ইন্তেকাল করেন। তিনিই ছিলেন মদিনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির সাহাবি। তাকে জান্নাতুল বাকিতে সমাধিস্থ করা হয়। নবীজি তার কবরের ওপর একটি পাথর স্থাপন করেন এবং বলেন, 'এর দ্বারা আমি আমার ভাইয়ের কবর চিনতে পারব।'
- ❖ রমজান মাসের রোজা ফরজ করা হয় এবং ঈদের নামাজ ও সদকায়ে ফিতরের বিধান চালু হয়।
- ❖ সম্পদের জাকাত ফরজ করা হয় এবং জাকাতের নেসাব ও বিধিবিধান বর্ণিত হয়।

❖ 'কুরাইশ শয়তান' নামে খ্যাত উমায়র বিন ওয়াহাব আল-জুমাহি ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি নবীজিকে হত্যা করার লক্ষ্যে মদিনায় এসেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার হৃদয়জগৎ ইসলামের জন্য প্রসারিত করে দেন এবং তিনি ইসলামগ্রহণে ধন্য হন।

❖ নবী-তনয়া ও উসমান-পত্নী রুকাইয়া রাযি. ইন্তেকাল করেন। বদর যুদ্ধ চলাকালে তার ইন্তেকাল হয়। রুকাইয়া রাযি. অসুস্থ থাকায় নবীজি হজরত উসমান রাযি.-কে যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে অসুস্থ স্ত্রীর পাশে থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন।

❖ রুকাইয়া রাযি.-এর মৃত্যুর পর উসমান রাযি. নবীজির আরেক কন্যা উম্মে কুলসুমকে বিয়ে করেন।

❖ আলি বিন আবু তালিব রাযি. নবীকন্যা ফাতিমা রাযি.-কে বিয়ে করেন।

❖ নবীকন্যা যায়নাব রাযি.-কে তার মুশরিক স্বামী আবুল আস বিন রাবি' অনুমতি দেওয়ায় তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে আসেন। আবুল আস বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দি হওয়ার পর নবীজি তাকে এই শর্তে মুক্তি দিয়েছিলেন যে, বিনিময়ে সে যায়নাবকে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দেবে।

উহুদ যুদ্ধ

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

বদর যুদ্ধের পর যেসব কুরাইশ নেতা জীবিত ছিল, তারা বদর যুদ্ধে নিহতদের প্রতিশোধ গ্রহণের এবং বদরে মুসলিম বাহিনীর হাতে হৃত খ্যাতি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধারের সংকল্প করে। যেহেতু আবু সুফিয়ানের বণিক-কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যই কুরাইশ বাহিনী বদরে প্রেরিত হয়েছিল, তাই আবু সুফিয়ান, আবু জাহলের পুত্র ইকরিমা ও উমাইয়ার পুত্র সাফওয়ান মক্কার বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে অনুরোধ জানায়—আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যকাফেলা হতে প্রাপ্ত সমুদয় সম্পদ যেন সকলে পরবর্তী যুদ্ধপ্রস্তুতির জন্য প্রদান করে। সকলে এ প্রস্তাবে সোৎসাহে সম্মতি জানায়।

প্রধান সেনাপতি আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের মুশরিক বাহিনী মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়। কুরাইশ বাহিনীর ডান বাহুর নেতৃত্ব ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে, অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্বও তাকে প্রদান করা হয়। বাম বাহুর নেতৃত্ব প্রদান করা হয় ইকরিমা বিন আবু জাহলকে আর পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া হয় সাফওয়ান বিন উমাইয়াকে। বাহিনীর মূল ঝান্ডা বহনের দায়িত্ব ছিল তালহা আল-আবদারির। কুরাইশ বাহিনীর যুদ্ধসামগ্রীর মধ্যে ছিল দুইশ ঘোড়া ও সাতশ বর্ম। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবার নেতৃত্বে পনেরোজন নারীর একটি দলও কুরাইশ বাহিনীর সঙ্গে ছিল, যাদের কাজ ছিল দফ বাজিয়ে মূল বাহিনীর যুদ্ধস্পৃহা বৃদ্ধি করা।

কুরাইশ বাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ এবং তাদের রওনা হওয়ার সংবাদ জানিয়ে নবীজির চাচা আব্বাস নবীজির কাছে একটি বার্তা পাঠান। সংবাদ পেয়ে নবীজি সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শে বসেন। মুশরিক বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলমানরা মদিনা হতে বের হয়ে অগ্রসর হবে, নাকি মদিনাতেই অবস্থান করে মদিনার নিরাপত্তা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে—এ বিষয়ে নবীজি সাহাবায়ে কেরামের মতামত জানতে চান। স্বয়ং নবীজির ও বিশিষ্ট সাহাবিদের মত ছিল মদিনাতেই অবস্থান করা; কিন্তু অধিকাংশ সাহাবি বিশেষত বদর যুদ্ধে যেসব তরুণ সাহাবি অংশগ্রহণ করতে পারেনি, তারা মদিনা হতে অগ্রসর হওয়ার মত প্রকাশ করে। তাদের

আগ্রহ-উদ্দীপনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে নবীজি মদিনা হতে বের হয়ে কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলা করার ফয়সালা করেন।

হিজরতের বত্রিশ মাস পর তৃতীয় হিজরি সনের ৭ শাওয়াল (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) শুক্রবার নবীজি এক হাজার সাহাবায়ে কেরামের এক বাহিনী নিয়ে মদিনা হতে রওনা হন। উহুদে পৌঁছার পূর্বে পথিমধ্যে মুনাফিক সর্দার ইবনে সালুল মুসলিম বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্য নিয়ে মদিনায় ফিরে যায়। সে অজুহাত পেশ করে বলে, 'মুহাম্মাদ আমার পরামর্শ উপেক্ষা করে যেসব ছেলের সিদ্ধান্তযোগ্যতা নেই, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করেছে। আমরা বুঝতেই পারছি না যে, কী উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেবো!'

যারা ইবনে সালুলের সঙ্গে মদিনায় ফিরে গিয়েছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল ইবনে সালুলের মতো নিফাক ও কপটতায় আক্রান্ত।

মুসলিম বাহিনী যখন উহুদের পথে 'শায়খায়ন' নামক স্থানে পৌঁছায়, তখন নবীজি শোরগোলরত একদল সৈন্যকে সেখানে দেখতে পান। নবীজি জিজ্ঞেস করেন, 'এরা কারা?' উত্তরে সাহাবিগণ জানায়, 'এরা ইবনে সালুলের ইহুদি মিত্র (আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসেছে)।' নবীজি বলেন, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুশরিকদের সহায়তা নিয়ো না।'

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদ পাহাড়ের কাছে ছাউনি স্থাপন করেন এবং পাহাড়কে পেছনে রেখে পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তায় ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। নবীজি আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাযি.[৩৩]-এর নেতৃত্বে পঞ্চাশজনের একটি তিরন্দাজ বাহিনীকে পাহাড়ের ওপর মোতায়েন করেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দেন—তোমরা এখানেই অবস্থান করবে এবং আমাদের পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা রক্ষা করবে। যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করি বা নিহত হই, কোনো অবস্থাতেই তোমরা এ স্থান ত্যাগ

---

৩৩. তিনি বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. নন। আলোচ্য আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাযি. ছিলেন মদিনার আওস গোত্রের একজন আনসারি সাহাবি। তিনি দ্বিতীয় বায়আতে আকাবায় অংশগ্রহণ করেন। মহান এই বদরি সাহাবি উহুদ যুদ্ধে শহিদ হন। অপরদিকে বিখ্যাত সাহাবি আবদুল্লাহ বিন যুবায়র ছিলেন নবীজির ফুফাতো ভাই যুবায়র রাযি.-এর পুত্র। তিনি উহুদ যুদ্ধের দু-বছর পূর্বে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর ৬৪ হিজরি সনে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ৭৩ হিজরি সনে হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বাহিনীর হাতে শহিদ হন।

করবে না এবং আমাদের সঙ্গে শরিক হতে বা আমাদের সাহায্য করতে অগ্রসর হবে না।

নবীজি মুসলিম বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন।

১. মুহাজিরদের দল। এ দলের পতাকা ছিল মুসআব বিন উমায়র রাযি.-এর হাতে।

২. আওস গোত্রের দল। পতাকা ছিল উসায়দ বিন খুযায়র রাযি.-এর হাতে।

৩. খাযরাজ গোত্রের দল। পতাকা ছিল হুবাব ইবনুল মুনযির রাযি.-এর হাতে।

নবীজি মিকদাদ বিন আমর রাযি. ও মুসলিম বাহিনীর একমাত্র অশ্বারোহী সৈনিক যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-কে মুশরিক বাহিনীর খালিদ ও ইকরিমার নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী অংশের প্রতিরোধের দায়িত্ব প্রদান করেন।

যুদ্ধের সূচনা

আবু আমির ফাসিকের নেতৃত্বে মুশরিক বাহিনীর ডানবাহুর আক্রমণের মাধ্যমে যুদ্ধের সূচনা হয়। মুসলিম বাহিনীর বামবাহুর ওপর পরিচালিত এ আক্রমণে খালিদ বিন ওয়ালিদের নেতৃত্বাধীন অশ্বারোহী বাহিনীও তাদেরকে সহায়তা করছিল। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর তিরন্দাজ সৈনিকরা প্রতিপক্ষের এ অংশটিকে পরাভূত করে এবং পিছু হটতে বাধ্য করে। তিরন্দাজদের অব্যর্থ নিশানায় নিক্ষিপ্ত তিরে মুশরিকদের অশ্বগুলো আহত হতে থাকে। এবার মুসলিম বাহিনী মুশরিকদের পতাকাবাহীদের ওপর পাল্টা আক্রমণ চালায় এবং ঝান্ডাধারী বনু আবদুদ দারের দশজনের সকলকে একে একে হত্যা করে। মুশরিক বাহিনীর ঝান্ডা মাটিতে পড়ে যায় এবং পদদলিত হতে থাকে।

এরপর মুসলিম বাহিনী একযোগে মুশরিকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামজা রাযি. ও আবু দুজানা রাযি. ময়দান থেকে পলায়নরত মুশরিকদের কচুকাটা করতে থাকেন। বদরের ন্যায় উহুদেও মুসলিম বাহিনীর বিজয় তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

রণাঙ্গনের পট পরিবর্তন, নিশ্চিত বিজয় পরাজয়ে রূপান্তর

মুসলিম বাহিনীর আসন্ন বিজয় উপলব্ধি করে পাহাড়ে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনরত তিরন্দাজ বাহিনীর অনেকে গনিমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) কুড়াতে পাহাড় থেকে নেমে আসে। বাহিনীর প্রধান আবদুল্লাহ বিন জুবায়র রাযি. বারবার তাদেরকে সতর্ক করতে থাকেন এবং নবীজির নির্দেশ অমান্য করে পাহাড় হতে অবতরণ করতে নিষেধ করেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে মনে করে দশজন বাদে বাকি সকলে তার নির্দেশ অমান্য করে। মুশরিক বাহিনীর অশ্বারোহী অংশের প্রধান খালিদ বিন ওয়ালিদ পাহাড়ে দায়িত্বপালনরত তিরন্দাজদের অবতরণ করতে দেখে দ্রুত দুইশ অশ্বারোহী সৈনিক নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে সটকে পড়েন এবং পেছন দিক থেকে পাহাড়ে আরোহণ করেন। পাহাড়ে অবস্থানরত অবশিষ্ট মুসলিম সৈনিকগণ আবদুল্লাহ বিন জুবায়রের নেতৃত্বে প্রচণ্ড প্রতিরোধ গড়ে তুললেও একপর্যায়ে খালিদ-বাহিনীর হাতে শহিদ হয়ে যায়। এরপর খালিদের বাহিনী পেছন দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পেছন থেকে হঠাৎ আক্রমণে মুসলিম বাহিনী বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। এ সময় মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ লক্ষ্যহীনভাবে লড়াই করতে থাকে। একের পর এক মুসলিম শহিদের লাশ ভূপাতিত হতে থাকে। মুসআব বিন উমায়র, হামজা বিন আবদুল মুত্তালিব, আনাস বিন নাযার, সাদ বিন রাবি'সহ অনেক সাহাবি শহিদ হয়ে যান।

মুসআব বিন উমায়র রাযি. দৈহিক গড়নে অনেকটা নবীজির সদৃশ ছিলেন। ইবনে কুমআ নামক জনৈক দুরাচার তাকে শহিদ করার পর মনে করেছিল যে, সে—নাউজুবিল্লাহ—নবীজিকেই হত্যা করেছে। সে চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি মুহাম্মাদকে হত্যা করেছি। এ কথা শুনে মুসলিম বাহিনীর অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে, আবার অনেকে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু নবীজি তৎক্ষণাৎ আওয়াজ দিয়ে সকলকে নিজের উপস্থিতি নিশ্চিত করেন। নবীজির মোবারক আওয়াজ শুনে সাহাবিদের হৃদয়-মন প্রশান্ত হয় এবং মানসিক শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়। এবার জীবিত সকলে নবীজির পাশে সমবেত হয়। মুশরিক বাহিনীর লক্ষ্য ছিল যেকোনো মূল্যে নবীজিকে হত্যা করা। তাই নবীজির চারপাশে তীব্র লড়াই চলতে থাকে। সাহাবায়ে কেরাম নবীজির চারপাশে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই অব্যাহত রাখেন। নবীজিকে রক্ষার জন্য বীর যোদ্ধাদের

একটি দল নবীজির চারপাশে প্রাচীর তৈরি করে কাফিরদের হামলা প্রতিরোধ করে যাচ্ছিল।

এরপর নবীজি অবশিষ্ট মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসেন এবং উহুদের একটি গিরিপথে আশ্রয় নিয়ে মুসলমানদের পুনঃবিন্যস্ত করেন। মুসলিম বাহিনীর অনবরত তির নিক্ষেপের কারণে মুশরিক বাহিনী নিরাশ হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধ শেষ করে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। আত্মপ্রবঞ্চিত কুরাইশরা এতটুকু সাফল্যকেই নিজেদের বিজয় হিসেবে বিবেচনা করছিল।

উহুদ যুদ্ধে মুশরিক বাহিনীর বাইশজন সৈন্য নিহত হয়। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর সত্তরজন সাহাবি শহিদ হয়। মুশরিকরা নবীজির চাচা হামজা বিন আবদুল মুত্তালিবসহ অনেক শহিদের লাশ বিকৃত করে।

হামরাউল আসাদের অভিযান

উহুদ প্রান্তর থেকে নবীজি শনিবার সন্ধ্যায় মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। নবীজি ও সাহাবিগণ মদিনাতেই রাত্রিযাপন করেন এবং আহতদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় অতিবাহিত করেন। পরদিন রবিবার ফজর নামাজের পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত বিলাল রাযি.-কে এই ঘোষণা প্রদানের নির্দেশ দেন যে, আল্লাহর রাসুল তোমাদেরকে শত্রু বাহিনীর অন্বেষণের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে শুধু তারাই বের হবে, যারা গতকাল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

এরপর নবীজির নির্দেশে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধপতাকা নিয়ে আসা হয়। নবীজি হজরত আলি রাযি.-কে পতাকা প্রদান করেন। এরপর আহত ও ক্লান্ত-শ্রান্ত মুসলিম বাহিনী বেরিয়ে পড়ে এবং হামরাউল আসাদে[৩৪] শিবির স্থাপন করে। মুসলমানরা সেখানে বিশাল আগুন প্রজ্বলিত করে। বহু দূর থেকে আগুন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং মনে হচ্ছিল, প্রচুর সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে।

মক্কার মুশরিকরা তখন উহুদেই অবস্থান করে অর্জিত বিজয় উদ্‌যাপন করছিল এবং আনন্দে কোরাস গাইছিল। এ সময় তারা মুসলমানদের

---

৩৪. **হামরাউল আসাদ** : মদিনা হতে প্রায় বারো কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহরতলির নাম।

সমূলে শেষ করতে মদিনায় হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছিল। অবশ্য সাফওয়ান বিন উমাইয়া এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া ঝুঁকিপূর্ণ হবে বলে তাদেরকে নিষেধ করছিল।

খুযাআ গোত্রের সর্দার মা'বাদ আল-খুযায়ি তখনও মুসলমান হননি। তিনি সে পথেই কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর শিবিরের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করে মুশরিক বাহিনীর কাছে পৌঁছান। মা'বাদ আল-খুযায়িকে দেখতে পেয়ে কুরাইশ বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, 'মা'বাদ, পেছনে কী অবস্থা দেখে এলে?' মা'বাদ উত্তর দেন, 'ধিক তোমাকে! মুহাম্মাদ তো তোমাদের খোঁজে তার সঙ্গীদের নিয়ে রওনা হয়ে গেছে। এত বিশাল বাহিনী আমি জীবনেও দেখিনি। মুসলমানরা তোমাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভে টগবগ করছে। এমন ক্রোধ ও ক্ষোভ আমি কখনো দেখিনি।'

মা'বাদের কথা শুনে মুশরিক বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা দ্রুত পলায়ন করে এবং মক্কার পথ ধরে।

নবীজি রবি হতে বুধবার চারদিন হামরাউল আসাদে অবস্থান করার পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। উল্লেখ্য, সুরা আলে ইমরানে এই যুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ আলোচিত হয়েছে।

বনু নাযিরের বিরুদ্ধে অভিযান

চতুর্থ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে এই অভিযান সংঘটিত হয়।

অভিযানের প্রেক্ষাপট

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার কয়েকজন সাহাবিকে নিয়ে মদিনার বনু নাযিরের ইহুদি-পল্লিতে গমন করেন। আমর বিন উমাইয়া নামক জনৈক সাহাবি ভুলক্রমে দুজন ব্যক্তিকে হত্যা করায় নিহতদের রক্তপণ আদায় অপরিহার্য ছিল। তাই মিত্র ইহুদিদের সহযোগিতা গ্রহণে নবীজি সেখানে গিয়েছিলেন। পূর্বে সম্পাদিত মুসলিম-ইহুদি মৈত্রীচুক্তির ভিত্তিতে ইহুদিরা রক্তপণে শরিক হতে বাধ্য ছিল। নবীজি উপস্থিত হওয়ার পর বনু নাযিরের ইহুদিরা স্বভাব-বহির্ভূতভাবে নবীজিকে উষ্ণ স্বাগত জানায় এবং রক্তপণ আদায়ে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। তারা

নবীজিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলায় নবীজি একটি দেয়ালের পাশে বসে থাকেন। ইত্যবসরে ইহুদিরা গোপনে পরামর্শ করে ওপর থেকে বিশাল একটি পাথর ফেলে বিশ্রামরত নবীজিকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। আমর বিন জাহহাশ নামক জনৈক দুরাচার এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করে।

তৎক্ষণাৎ জিবরাইল আ. উপস্থিত হয়ে নবীজিকে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেন। নবীজি সঙ্গে সঙ্গে সে স্থান ত্যাগ করে মদিনায় রওনা হয়ে যান। নবীজির এলাকা ত্যাগ করার সংবাদ পেয়ে নবীজির সঙ্গী সাহাবিগণও চলে আসেন এবং নবীজির সঙ্গে মিলিত হন। নবীজি তাদেরকে ইহুদিদের প্রতারণা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং বনু নাযিরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে আদেশ করেন।

নবীজি প্রথমে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাকে বনু নাযিরের কাছে পাঠান এবং তাকে বলে দেন যে, তুমি বনু নাযিরের ইহুদিদের কাছে গিয়ে তাদেরকে বলো, আল্লাহর রাসুল আমাকে তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা আমাদের দেশ থেকে বের হয়ে যাও। কারণ, তোমরা প্রতারণা করার মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছ। আমি তোমাদেরকে দশ দিন সময় দিচ্ছি। এরপর তোমাদের যাকেই পাওয়া যাবে, হত্যা করা হবে।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামার ঘোষণা শোনার পর বনু নাযির মদিনাত্যাগের প্রস্তুতি শুরু করে। কিন্তু মুনাফিক-সর্দার ইবনে সালুল লোক পাঠিয়ে তাদেরকে নিষেধ করে এবং প্রয়োজনে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইবনে সালুলের আশ্বাস পেয়ে ইহুদিরা নিজ জনপদেই অবস্থান করে এবং মুসলমানদের সাফ জানিয়ে দেয়—আমরা কোথাও যাচ্ছি না।

এরপর নবীজির নির্দেশে মুসলমানরা বনু নাযিরের জনপদ অবরোধ করে। ইহুদিরা তাদের দুর্গের অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়। এ অবরোধ পনেরো দিন স্থায়ী হয়েছিল।

নবীজি বনু নাযিরের জনপদের চারপাশের খেজুর গাছ কেটে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। তারা নবীজির কাছে প্রস্তাব পাঠায়—আমরা মদিনা ছেড়ে চলে যাব; তবে আমাদেরকে অস্ত্রশস্ত্র বাদে অন্যান্য সবকিছু

সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দিন। নবীজি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলে তারা তাদের আসবাবপত্র উটের পিঠে তুলে নেয়। কেউ কেউ নিজের ঘর ভেঙে ঘরের দরজাও নিয়ে যায়। এরপর তাদের একদল শামে চলে যায় আর সালাম বিন আবুল হাকিক, কিনানা বিন রাবি' ও হুয়াই বিন আখতাব প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসহ অধিকাংশ চলে যায় খায়বারে।

নবীজি বনি নাযিরের রেখে যাওয়া সম্পদ মুহাজিরদের মাঝেই বণ্টন করে দেন। আনসারদের মধ্যে অতি দরিদ্র হওয়ায় কেবল আবু দুজানা রাযি. ও সাহল বিন হানিফ রাযি. কিছু সম্পদ লাভ করেন। বনু নাযিরের অভিযানের প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের সুরা হাশর অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই এই সুরার আরেক নাম 'সুরা বনু নাযির'।

গাযওয়ায়ে খন্দক

অগ্রগণ্য মত অনুসারে ৫ম হিজরি সনের শাওয়াল মাসে (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) খন্দক যুদ্ধ[৩৫] সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

ইসলামের আবির্ভাবকাল হতেই ইহুদিরা ছিল প্রচণ্ড ইসলামবিদ্বেষী। বনু কায়নুকা ও বনু নাযিরকে মদিনা থেকে বিতাড়ন করায় তাদের বিদ্বেষ যেন শত গুণে বৃদ্ধি পায়। এবার ইহুদি নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার মনস্থ করে। ইহুদি নেতা সালাম বিন আবুল হাকিক, কিনানা বিন রাবি' ও হুয়াই বিন আখতাব প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল খায়বার হতে মক্কায় গমন করে এবং কুরাইশদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আহ্বান জানায়। এরপর তারা গাতফান গোত্রের কাছে গিয়ে তাদেরকেও একই আহ্বান জানায়। সকলে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বের হওয়ার তারিখ নির্ধারণ করে।

---

৩৫. শত্রুপক্ষের আক্রমণ হতে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে মদিনার পাশে পরিখা খনন করা হয় বলে এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয় খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ। যেহেতু এ যুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের সঙ্গে ইহুদিরাসহ বনু গাতফান ও বিভিন্ন আরব গোত্র অংশ নিয়েছিল, তাই একে গাযওয়ায়ে আহযাব বা বহুজাতিক বাহিনীর যুদ্ধও বলা হয়।

নবীজি যথাসময়ে এ বিষয়ে অবগত হন এবং করণীয় নির্ণয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শ তলব করেন। প্রবীণ সাহাবি সালমান ফারসি রাযি. মুশরিক বাহিনীকে মদিনায় প্রবেশে বাধা দিতে মদিনার পাশে পরিখা খনন করার প্রস্তাব দেন। সালমান ফারসি রাযি.-এর প্রস্তাব গৃহীত হয়। সাহাবায়ে কেরাম সকলে মিলে পরিখা খনন করেন।[৩৬] স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খননকাজে নেতৃত্ব দেন এবং সবচেয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেন। শত্রুবাহিনীর আগমনের পূর্বেই পরিখা খনন সমাপ্ত হয়।

শত্রুবাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও নেতৃত্ব

কুরাইশ বাহিনী আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মদিনার উদ্দেশে রওনা হয়। গাতফানের শাখা-গোত্র বনু ফাযারার নেতৃত্বভার ছিল উয়াইনা বিন হিসন-এর হাতে। বনু মুররার নেতৃত্ব দিচ্ছিল হারিস বিন আওফ আর বনু আশজা'-এর নেতৃত্বে ছিল মুসইর বিন রুহায়লা। এ ছাড়াও বনু কিনানা ও বনু তিহামাও বহুজাতিক এ বাহিনীতে যোগদান করে। সব মিলিয়ে দশ

---

৩৬. মদিনার পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই তিনদিক ছিল পাহাড়-পর্বত ও খেজুর-বাগান দ্বারা বেষ্টিত। শুধু উত্তর দিক ছিল উন্মুক্ত। নবীজি আপন দূরদৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেন যে, কাফির বাহিনী উত্তর দিক থেকেই মদিনার আক্রমণ করার চেষ্টা করবে। এজন্য তিনি কেবল উত্তর দিকেই পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। মদিনার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত হাররাতু ওয়াকিম হতে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হাররাতু ওয়াবরা-এর মধ্যবর্তী এলাকায় ২.৭২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ, নয় হাত প্রস্থ এবং স্থানভেদে সাত থেকে দশ হাত গভীর পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং প্রতি চল্লিশ হাত পরিমাণ জায়গা খননের জন্য সাহাবায়ে কেরামকে দশ-দশজন করে দলবদ্ধ করে দেওয়া হয়। স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরিখা খননে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

যেহেতু বহুজাতিক বাহিনীর মদিনায় আগমন অত্যাসন্ন ছিল, তাই মুসলমানগণ প্রচণ্ড কষ্ট স্বীকার করে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে খননকাজ সম্পন্ন করতে সচেষ্ট ছিলেন। '*তাবাকাতে ইবনে সাদ*' গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে মাত্র ছয় দিনে পরিখা খনন সমাপ্ত হয়। হাররা নামে পরিচিত মদিনার এ অংশটি ছিল কালো-কালো প্রচুর বড় ও ভারী পাথরবিশিষ্ট শক্তভূমি। সাহাবায়ে কেরাম কয়েক দিনব্যাপী ক্ষুৎপিপাসার প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করছিলেন। ক্ষুধার কষ্টে তারা পেটে একটি করে পাথর বেঁধে কাজ করছিলেন। আর দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেটে দুটি পাথর বেঁধে সবার চেয়ে অধিক উদ্যমে পরিখা খনন করছিলেন। পরিখা খননকালীন বিস্ময়কর ও শিক্ষাপূর্ণ বিভিন্ন ঘটনা সিরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত আছে।

হাজার সৈন্যের এই বাহিনী মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে মদিনা অভিমুখে রওনা হয়। কিন্তু মদিনায় পৌঁছেই তারা কল্পনাতীত এক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। তারা দেখতে পায়—মদিনার প্রবেশপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুদীর্ঘ পরিখা! শত্রুপক্ষকে বাধা দিতে পরিখা খননের পদ্ধতি মূলত পারস্যে প্রচলিত ছিল। বালুকাময় পাথুরে-ভূমির অধিবাসী আরবজাতি এর সঙ্গে মোটেও পরিচিত ছিল না। অবস্থাদৃষ্টে বহুজাতিক বাহিনী কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও নিরাশ হয়ে পড়ে। কেউ কেউ পরিখা অতিক্রমের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়, মারাও যায় অনেকে।[৩৭]

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। নবীজি মদিনার মুসলিম নারী, শিশু-কিশোর ও বয়োবৃদ্ধদের শত্রুর আক্রমণ হতে নিরাপদে রাখতে বনু হারিসার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পরিখার কারণে যদিও মুসলমানরা মুশরিক বাহিনীর আক্রমণ হতে আপাতত নিরাপদ ছিল; কিন্তু কঠিন ক্ষুধা ও প্রচণ্ড শীতের পাশাপাশি সর্বক্ষণ সুবিশাল বহুজাতিক বাহিনীর আক্রমণ-শঙ্কা ও প্রবল ভীতির কারণে মুসলমানদের জন্য সময়টা ছিল বড়ই কঠিন। পবিত্র কুরআনে সেই কঠিনতর পরিস্থিতিকে এভাবে চিত্রায়িত করা হয়েছে—

﴿إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ○ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾

স্মরণ করো, যখন তারা তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল ওপর দিক থেকে এবং নিচের দিক থেকেও এবং যখন চোখ বিস্ফারিত

---

৩৭. বহুজাতিক বাহিনী মদিনায় পৌঁছে পরিখা দেখে প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও হতোদ্যম হয়ে পড়লেও এরপর পরিখা অতিক্রম বা পরিখা ভরাট করে রাস্তা তৈরি করার উপর্যুপরি চেষ্টা চালায়। ফলে সাহাবায়ে কেরামকে প্রতিমুহূর্ত সতর্ক ও পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হচ্ছিল। এ সময় বিস্তৃত এলাকাজুড়ে সার্বক্ষণিক প্রহরায় ব্যস্ত থাকার কারণে মুসলমানদের কয়েক ওয়াক্ত নামাজও কাজা হয়ে যায়। পরিখার দু-পাশ থেকে উভয় পক্ষের মধ্যে তির নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে এবং এতে ছয়জন সাহাবি শহিদ হন; মুশরিক পক্ষের নিহত হয় দশজন। বিখ্যাত আনসারি সাহাবি সাদ বিন মুআয রাযি.-ও এ সময় আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং পরে এ আঘাতের কারণেই ইন্তেকাল করেন।

> হয়েছিল, কলিজা মুখের কাছে এসে পড়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারকমের ভাবনা ভাবতে শুরু করেছিলে। তখন মুমিনগণ কঠিনভাবে পরীক্ষিত হয়েছিল এবং তাদেরকে তীব্র প্রকম্পনে কাঁপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। [সুরা আহযাব : ১০-১১]

ঠিক একই সময়ে সংবাদ আসে যে, মদিনায় বসবাসরত ইহুদি গোত্র বনু কুরায়যা মুসলমানদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে এবং চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে বহুজাতিক বাহিনীকে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছে। এ সংবাদ ছিল মুসলমানদের জন্য বজ্রপাতের ন্যায়। মুসলিম বাহিনী তখন বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধেই প্রচণ্ড রকম ব্যস্ত ছিল। ভেতর থেকে এমন আঘাত তারা মোটেও আশা করেনি। অবস্থাদৃষ্টে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং মুসলমানদের উদ্যম টিকিয়ে রাখতে শত্রুপক্ষের বিষয়ে নমনীয় হওয়ার চিন্তা করেন। তিনি মদিনায় উৎপাদিত খেজুরের এক-তৃতীয়াংশ প্রদানের বিনিময়ে বনু গাতফানের সঙ্গে সন্ধি করার বিষয়ে আনসার-সরদার সাদ বিন মুআয ও সাদ বিন উবাদার সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু আনসারি সাহাবিদ্বয় দৃঢ়তার সঙ্গে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং নবীজিকে নিশ্চিন্ত করেন যে, তারা কোনো পরিস্থিতিতেই হতোদ্যম হবেন না। সাহাবিদ্বয়ের মতানুসারে নবীজি বনু গাতফানের সঙ্গে সমঝোতার চিন্তা পরিহার করেন।

অটল-অবিচল মুসলিম বাহিনীর জন্য গায়বি সাহায্য

সময়টি ছিল মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত সঙ্গিন। শীত ও ক্ষুধা, ভয় ও শঙ্কা, হামলা ও অবরোধ—সবকিছু মিলে তখন কঠিন দুর্যোগময় পরিস্থিতি। এমন সময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে গাতফান গোত্রের শাখা বনু আশজা'-এর জনৈক ব্যক্তি ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলামগ্রহণের সংবাদ দেন এবং এ কথাও জানান যে, তার ইসলামগ্রহণের কথা কেউ জানে না। নবীজি তাকে বলেন, তুমি তো একজনমাত্র ব্যক্তি (তোমার পক্ষে দলবল নিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করা সম্ভব নয়)। তুমি শত্রুপক্ষের লোকদের যথাসম্ভব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে প্ররোচিত করবে। যুদ্ধ তো কৌশলেরই নাম। নবীজির নির্দেশনা মোতাবেক নওমুসলিম নুআইম আশজায়ি রাযি. তৎক্ষণাৎ কাজে নেমে পড়েন। তিনি প্রথমে (বনু কুরায়যার) ইহুদিদের কাছে যান এবং তাদেরকে বোঝান যে, মুশরিকরা তো যুদ্ধ শেষে নিজেদের এলাকায় চলে

যাবে আর তোমরা মদিনাতেই থেকে যাবে। তখন তো মুহাম্মাদের রোষানলে তোমরাই পড়বে। সুতরাং তোমরা বনু গাতফান ও কুরাইশদের বলো, তারা যেন তাদের সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় কিছু লোককে তোমাদের কাছে জামানতস্বরূপ রাখে। তাহলে ভবিষ্যতে তোমরা আক্রান্ত হলে বনু গাতফান ও কুরাইশ সম্প্রদায় তোমাদেরকে সহায়তা করবে। বনু কুরায়যা নুআইম রাযি.-এর পরামর্শ গ্রহণ করে নেয়।

এরপর তিনি একে একে গাতফান ও কুরাইশ গোত্রের নেতৃবৃন্দের কাছেও যান এবং তাদেরকে বলেন, ইহুদিরা তো মুহাম্মাদের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করায় অনুতপ্ত হয়ে পড়েছে। তারা এখন পূর্বের ভুলের প্রতিকারবিধান করতে চাচ্ছে। ভবিষ্যতে মুসলমানদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি বজায় রাখার নিশ্চয়তাস্বরূপ তারা তোমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মুহাম্মাদের হাতে তুলে দিতে চায়।

নুআইম রাযি.-এর প্রচেষ্টা সফল হয়। কুরাইশ ও মিত্রবাহিনী যখন ইহুদিদেরকে যুদ্ধ শুরু করার অনুরোধ করে, তখন ইহুদিরা মুশরিক বাহিনীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে জামানত হিসেবে তাদের হাতে তুলে দিতে বলে। মুশরিকরা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে কুরাইশ, গাতফান ও ইহুদি—তিন পক্ষই বিশ্বাস করে যে, নুআইমের কথাই ঠিক। এভাবে বহুজাতিক বাহিনীর মধ্যে দ্বন্দ্ব ও অবিশ্বাস তৈরি হয় এবং মুশরিক সৈন্যদের মন হতাশায় ছেয়ে যায়।

—দ্রষ্টব্য—

একটি সুসংক্ষিপ্ত দোয়া

খন্দক যুদ্ধের কঠিনতম পরিস্থিতিতে সাহাবায়ে কেরাম নবীজির কাছে সমবেত হয়ে নিবেদন করে, আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রাণ তো ওষ্ঠাগত প্রায়! এমন কোনো দোয়া-বাক্য আছে কি, যা আমরা এ সময় পাঠ করতে পারি? নবীজি বললেন, হ্যাঁ, (তোমরা বলো)—

«اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِنَا، وَآمِنْ رَوْعَاتِنَا»

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের গোপন ত্রুটিসমূহ ঢেকে রাখুন এবং

আমাদের উদ্বিগ্নতাকে নিরাপত্তায় রূপান্তরিত করুন।

এরপর নবীজি বহুজাতিক বাহিনীর জন্য বদদোয়া করে বলেন—

«اَللّٰهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، سَرِيْعَ الْحِسَابِ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْ الْأَحْزَابَ، اَللّٰهُمَّ اهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ»

হে আল্লাহ, হে কুরআন অবতরণকারী, দ্রুত হিসাবগ্রহণকারী, হে আল্লাহ, আপনি বহুজাতিক বাহিনীকে পরাভূত করুন। হে আল্লাহ, আপনি তাদেরকে পরাভূত করুন, প্রকম্পিত করুন।

আল্লাহ পাক তার নবীর দোয়া কবুল করেন। মুসলমানদের জন্য স্বস্তি ও শান্তির শুভবার্তা এসে যায়। আল্লাহ তাআলা আপন কুদরতি ক্ষমতাবলে কাফির বাহিনীকে ফিরিয়ে দেন। তাদের দেহ-আত্মা-হৃদয় প্রকম্পিত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক মতবিরোধের কারণে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর আল্লাহ তাআলা শত্রুশিবিরের ছাউনিতে প্রচণ্ড শীতল ঝঞ্ঝাবায়ু প্রেরণ করেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করেন। আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর সহায়তায় তার অদৃশ্য সৈন্যদের প্রেরণ করেন। পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا﴾

হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের প্রতি ওই সময় কীরূপ অনুগ্রহ করেছিলেন তা স্মরণ করো, যখন বহু সৈন্য তোমাদের প্রতি চড়াও হয়েছিল, তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে এক ঝড়ো হাওয়া প্রেরণ করি এবং এক বাহিনী, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা করছিলে, আল্লাহ তা দেখছিলেন। [সুরা আহযাব : ০৯]

শত্রুপক্ষের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে হুযায়ফা রাযি.

নবীজি এ সময় শত্রুপক্ষের মতিগতি পর্যবেক্ষণের জন্য হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.-কে প্রেরণ করেন। নবীজি হুযায়ফাকে বলে দেন, শত্রুশিবিরে নিজের উপস্থিতি ও পরিচয় গোপন রাখতে হবে এবং কোনো অবস্থাতেই অস্ত্রধারণ বা কাউকে হত্যা করা যাবে না। হুযায়ফা রাযি. গোপনে মুশরিক-শিবিরে প্রবেশ করেন। তিনি জানতে পারেন যে, মুশরিক বাহিনীর প্রধান আবু সুফিয়ান ময়দান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং অশ্বারোহী বাহিনীকে নিরাপদে প্রস্থানের নির্দেশ দিয়েছেন। পরদিন ভোর হওয়ার পূর্বেই কুরাইশ ও গাতফান গোত্র পলায়ন করে এবং অশ্বারোহী বাহিনী তাদের অনুসরণ করে। বহুজাতিক শিবির শূন্য হয়ে যাওয়ার পর মুসলমানগণ অস্ত্র ত্যাগ করে মদিনায় ফিরে আসে।

খন্দক যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবীজি সাহাবিদের বলেন, এখন থেকে আমরাই তাদের ওপর হামলা করব; তারা আর আমাদের ওপর হামলা করতে পারবে না। নবীজির উক্তিতে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে, ইতিমধ্যে পরিস্থিতি মুসলমানদের অনুকূলে চলে এসেছে এবং শক্তির পাল্লা এখন তাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কুরাইশরা আজকের পর থেকে আর কখনো মুসলমানদের ওপর হামলা চালাতে সাহস করবে না।

বনু কুরায়যার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক অভিযান

খন্দক যুদ্ধের সময় বনু কুরায়যার ইহুদি সম্প্রদায় যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, তা ছিল নবীজির সঙ্গে ইহুদিদের কৃত সন্ধিচুক্তির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন ও অবমাননা। মুসলমানদের চরম দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে তারা কুরাইশ ও গাতফান গোত্রের সঙ্গে মিত্রতা করে মুসলমানদের সমূলে বিনাশ করার ঘৃণ্য তৎপরতায় মেতে উঠেছিল। এর মাধ্যমে মূলত মুসলমানদের প্রতি তাদের অন্তরে সুপ্ত বিদ্বেষ ও অনিষ্ট চিন্তা ফাঁস হয়ে যায়।

খন্দকের যুদ্ধ শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধাস্ত্র ত্যাগ করামাত্র আল্লাহ পাকের নির্দেশে হজরত জিবরাইল আ. সেখানে উপস্থিতি হন এবং নবীজিকে প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহর রাসুল! আপনি যুদ্ধসাজ ত্যাগ করেছেন?!' নবীজি হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিলে জিবরাইল বলেন, 'ফিরেশতারা তো যুদ্ধাস্ত্র পরিত্যাগ করেননি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে বনু কুরায়যায়

অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি এখনই সেখানে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে প্রকম্পিত করে তুলব।' তখন নবীজির নির্দেশে ঘোষণা করা হয়—যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি নিঃশর্ত অনুগত, তারা যেন বনু কুরায়যার জনপদে পৌঁছেই আছর নামাজ আদায় করে।

নবীজি আবদুল্লাহ বিন উম্মে মাকতুম রাযি.-কে মদিনার দেখাশোনার দায়িত্ব প্রদান করেন। মূল বাহিনী পৌঁছার পূর্বেই যেন বাহিনীর একটি অংশ দ্রুত সেখানে পৌঁছে যায়, এ উদ্দেশ্যে নবীজি আলি বিন আবু তালিব রাযি.-কে পতাকা বহনের দায়িত্ব দিয়ে তাকে দ্রুত অগ্রবর্তী বাহিনীর সঙ্গে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলিম বাহিনী বনু কুরায়যার জনপদে পৌঁছে অবরোধ করে। পঁচিশ দিন স্থায়ী অবরোধের একপর্যায়ে যখন বনু কুরায়যার প্রতিরোধক্ষমতা, মানসিক শক্তি ও রসদব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন তারা এই শর্তে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয় যে, আল্লাহর রাসুল হজরত সাদ বিন মুআয রাযি.-কে তাদের বিষয়ে ফয়সালাকারী নির্ধারণ করবেন। তারা ভেবেছিল, বনু কুরায়যার মিত্র আনসারি আওস গোত্রের সর্দার হিসেবে সাদ বিন মুআয তাদের বিষয়ে কোমল ও সহনীয় কোনো ফয়সালা করবেন।

বিশ্বাসঘাতকদের বিষয়ে সাদ বিন মুআয রাযি.-এর ফয়সালা

খন্দকের যুদ্ধে হাতের বাহুতে তিরবিদ্ধ হওয়ায় আহত সাদ বিন মুআয তখন মদিনাতেই অবস্থান করছিলেন। নবীজির নির্দেশে তাকে বাহনে চড়িয়ে বনু কুরায়যার জনপদে নিয়ে আসা হয়। সাদ রাযি. নিম্নোক্ত ফয়সালা করেন—

- যুদ্ধ করতে সক্ষম প্রত্যেক ব্যক্তির শিরশ্ছেদ করা হবে।
- নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হবে।
- তাদের সকল সম্পদ (মুসলমানদের মাঝে) বণ্টন করে দেওয়া হবে।

সাদ বিন মুআয রাযি.-এর ফয়সালা শুনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মন্তব্য করেন, সপ্তাকাশের উর্ধ্বে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাদের বিষয়ে যে ফয়সালা করেছেন, তুমিও সে ফয়সালাই করেছ।

মদিনার বাজারে অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের বিধান কার্যকর করা হয়। আর যাবতীয় সম্পদ এবং নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

প্রকৃতপক্ষে এটিই ছিল বিশ্বাসঘাতকদের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়ানুগ শাস্তি। শাস্তি তো অপরাধের সমশ্রেণিরই হয়ে থাকে। বনু কুরায়যার ইহুদিরা মুসলমানদের সঙ্গে মিত্রতা ভঙ্গ করে শঠতার আশ্রয় নিয়েছিল। তারা মুসলমান পুরুষদের হত্যা করতে, নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের দাসে পরিণত করতে এবং সম্পদ লুণ্ঠন করতে চেষ্টা করেছিল। তাই এ শাস্তি ছিল সম্পূর্ণই যথোচিত শাস্তি।

বনু কুরায়যাকে সমূলে নিপাত করার মাধ্যমে মদিনা পুরোপুরি ইহুদিমুক্ত হয় এবং নির্ভেজাল ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ অংশ পবিত্র হয় এমন এক দুষ্ট ও অনিষ্টকর জাতি-উপাদান হতে, যা যেকোনো মুহূর্তে ষড়যন্ত্র, শঠতা ও প্রতারণা করার ক্ষমতা রাখত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিজওয়ান

কুরাইশদের সঙ্গে সংঘটিত এসব যুদ্ধের পর ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে উমরা আদায়ের উদ্দেশ্যে মক্কা সফরের সিদ্ধান্ত নেন। নবীজি চৌদ্দশ সাহাবায়ে কেরামের এক জামাত সঙ্গে নিয়ে মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। নবীপত্নী উম্মে সালামা রাযি.-ও সফরে নবীজির সঙ্গী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য যেহেতু কেবলই উমরা করা, তাই সাহাবায়ে কেরাম যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে কেবল আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র সঙ্গে নিয়েছিলেন। যুলহুলায়ফায় পৌঁছে নবীজি মক্কাবাসীর মনোভাব ও সংবাদ জানার জন্য একজন গুপ্তচরকে প্রেরণ করেন। ফিরে এসে সে নবীজিকে জানায়, আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে মক্কার কুরাইশরা বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে এবং আহাবিশ[৩৮] জোটকে সমবেত করেছে। তারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং

---

৩৮. জাহিলি যুগে মক্কা ও আশেপাশের বিভিন্ন গোত্র একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদন করেছিল। উক্ত চুক্তিকে আহাবিশ মৈত্রীচুক্তি বলা হয়। চুক্তিভুক্ত সম্প্রদায়গুলো ইতিপূর্বে উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয়েছিল।

যেকোনো মূল্যে আপনাকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দেবে বলে মনস্থির করেছে।

নবীজি তখন উপস্থিত সাহাবিদের সঙ্গে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ করেন। আবু বকর সিদ্দিক রাযি. বলেন, আমরা তো বায়তুল্লাহর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি; কাউকে হত্যা করতে বা কারও সঙ্গে লড়াই করতে আসিনি। সুতরাং আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে সফর অব্যাহত রাখুন। পথে কেউ যদি আমাদের বাধা দেয়, আমরা কেবল তাদের সঙ্গেই লড়াই করব। এরপর নবীজি সবাইকে আল্লাহর নাম নিয়ে পথচলা অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন। মুসলিম কাফেলা বিভিন্ন উপত্যকার মাঝ দিয়ে দুর্গম পথ অতিক্রম করে হুদায়বিয়ার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছায়।

নবীজির দরবারে কুরাইশ দূতদের আগমন

কুরাইশরা যেকোনো পন্থায় নবীজি ও সাহাবায়ে কেরামকে মক্কায় প্রবেশ ও উমরা আদায়ে বাধাদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা একের পর এক দূত প্রেরণ করতে থাকে। দূতদের আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম অভিযাত্রীদের শক্তি যাচাই করা, তাদেরকে লড়াইয়ে বাধ্য করা হলে তারা লড়াই করতে কতটা আগ্রহী—তা অনুমান করা এবং তৃতীয় কোনো পদ্ধতিতে শান্তিপূর্ণ পন্থায় মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশে বিরত রাখা। এ উদ্দেশ্যে যেসব দূত আগমন করে, তারা হলো—

- খুযাআ গোত্রের বুদায়ল বিন ওয়ারাকা।
- ছাকিফ গোত্রপ্রধান উরওয়া বিন মাসউদ।[৩৯]
- আহাবিশ জোট-প্রধান হুলায়স বিন আ'লকামা আল-কিনানি।
- মিকরায বিন হাফস।

---

৩৯. বুদায়ল বিন ওয়ারাকা মক্কাবিজয়ের দিন মাররায-যাহরানে ইসলামগ্রহণ করেন এবং নবীজির পূর্বেই ইন্তেকাল করেন।
অপরদিকে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরির জিলকদ মাসে যখন তায়েফ অভিযান শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করছিলেন, তখন উরওয়া বিন মাসউদ নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর তিনি নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে কওমকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করলে সকলে মিলে তাকে শহিদ করে দেয়।

মিকরায বিন হাফসকে আসতে দেখে নবীজি মন্তব্য করেন, এ হলো মিকরায, লোকটি দুরাচার প্রকৃতির। মিকরায এসে নবীজির সঙ্গে কথা বলতে থাকে। এরইমধ্যে উপস্থিত হয় সুহায়ল বিন আমর। তাকে আসতে দেখে নবীজি সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেন, সে আসছে তোমাদের বিষয়ে সহজ[৪০] সমাধান করতে।

মুসলমানদের দূত হিসেবে উসমান রাযি.-এর মক্কায় গমন

এরপর নবীজি নিজের ও মুসলমানদের অবস্থান সুস্পষ্ট করতে এবং উমরা করাই যে তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য—কুরাইশদের তা অবহিত করতে একজন দূত পাঠানোর মনস্থ করেন। নবীজি এ উদ্দেশ্যে হজরত উমর রাযি.-কে আহ্বান করলে তিনি সবিনয়ে অপারগতা পেশ করেন এবং তার পরিবর্তে উসমান রাযি.-কে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। এরপর নবীজি উসমান রাযি.-কে মক্কায় প্রেরণ করেন। উসমান রাযি.-কে আসতে দেখে প্রহরারত কুরাইশরা তাকে নবীজির বার্তা নিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়। পথিমধ্যে আবান বিন সাইদ বিন আস তাকে স্বাগত জানায় এবং নিরাপত্তা প্রদান করে। হজরত উসমান তার সঙ্গে মক্কায় প্রবেশ করে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের কাছে নবীজির বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন।

এ সময় কুরাইশরা কোনো সিদ্ধান্ত না জানিয়ে দীর্ঘ সময় হজরত উসমান রাযি.-কে অপেক্ষায় রাখে। তখন মুসলমানদের মাঝে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে যে, উসমানকে হত্যা করা হয়েছে। তখন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (এমন কিছু ঘটে থাকলে) আমরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরব না। এরপর নবীজি সকল সাহাবিকে (জিহাদ ও প্রতিশোধের) বায়আত গ্রহণের আহ্বান জানান। উপস্থিত সকলে হুদায়বিয়া প্রান্তরের একটি গাছের নিচে নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করে। ইতিহাসে এ বায়আত 'বায়আতুর রিজওয়ান' নামে খ্যাতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

---

৪০. আরবিতে সুহায়ল শব্দের মূল-ধাতু হচ্ছে 'সাহলুন', যার অর্থ সহজ হওয়া। নবীজি এ দিকেই ইঙ্গিত করেছিলেন।

নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি খুশি হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে তোমার হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিল। [সুরা ফাত্হ : ১৮]

পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে কুরাইশরা দ্রুত সুহায়ল বিন আমরকে সন্ধিচুক্তি করার জন্য প্রেরণ করে। তারা সুহায়লকে এ মর্মে তাকিদ দেয় যে, চুক্তি যেন এ বছর মুসলমানদের মক্কায় প্রবেশ না করে প্রত্যাবর্তনের শর্তেই হয়। অবশেষে নিম্নোক্ত ধারাসমূহের ওপর উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়—

- উভয় পক্ষের মধ্যে আগামী দশ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।
- নবীজি ও সাহাবায়ে কেরাম এ বছর উমরা আদায় না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর তারা উমরা আদায়ের জন্য এলে কুরাইশরা তাদেরকে তিন দিন মক্কায় অবস্থানের সুযোগ দেবে। মুসলমানরা এ সময়ের মধ্যে উমরা সম্পাদন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করবে।
- কুরাইশ গোত্রের কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নিজ অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত পালিয়ে মুহাম্মাদের কাছে চলে গেলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। বিপরীতে মুহাম্মাদের সঙ্গীরা কেউ তার কাছ থেকে পালিয়ে কুরাইশদের কাছে এলে তারা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না।
- চুক্তির দুই পক্ষ (মুসলমান ও কুরাইশ গোত্র) ব্যতীত অন্য কোনো গোত্র চাইলে চুক্তিবদ্ধ দুই পক্ষের কোনো এক পক্ষের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে।

চতুর্থ ধারার ভিত্তিতে বনু খুযাআ নবীজির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে আর বনু বকর মিত্রতা স্থাপন করে কুরাইশদের সঙ্গে।

বাহ্যিকভাবে এ চুক্তি ছিল মুসলমানদের জন্য চরম অবমাননাকর ও পরাজয়তুল্য। এ কারণেই হজরত উমর রাযি.-সহ কতক সাহাবির মনে এ চুক্তি নিয়ে দ্বিধা-আপত্তি ছিল। তারা এ চুক্তির মাধ্যমে মুসলমানদের অবমাননা ও মর্যাদাহানি হচ্ছে বলে মনে করছিলেন। কিন্তু বাস্তবে হুদায়বিয়ার চুক্তি ছিল মুসলমানদের জন্য এক সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য বিজয়। এ চুক্তির মাধ্যমেই মূলত কুরাইশ সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো মুসলমানদের শক্তি-সামর্থ্যের এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিজেদের

দুর্বলতার স্বীকৃতি প্রদান করে। এ চুক্তির কারণেই মুসলমানরা ভবিষ্যতের জন্য কুরাইশদের বিষয়ে আশঙ্কামুক্ত হয়ে যায় এবং আরবের ভেতরে-বাইরে বিভিন্ন গোত্র-শাখাগোত্র ও রাজন্যবর্গের মাঝে ইসলামের দাওয়াত প্রদানের অবকাশ-উপলক্ষ্য ও সময়-সুযোগ পেয়ে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ চুক্তিই দু-বছর পর মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। আর তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সুরা ফাত্হ-এ হুদায়বিয়ার চুক্তিকে 'প্রকাশ্য বিজয়' বলে অভিহিত করেছেন।

আরব উপদ্বীপে ইহুদিদের শেষ ঘাঁটি খায়বার বিজয়

হুদায়বিয়ার সন্ধির দু-মাসেরও কম সময় পর সপ্তম হিজরির মুহাররম মাসে (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) খায়বার অভিযান সংঘটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে খায়বার বিজয় ছিল হুদায়বিয়ার বরকতপূর্ণ চুক্তিরই ফসল।

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

খায়বারে বসবাসরত ইহুদিদের প্রতিনিধিদলই আরবের বিভিন্ন গোত্রকে খন্দক যুদ্ধের জন্য প্ররোচিত ও উত্তেজিত করেছিল। সুতরাং ইহুদিদের এই দুর্ভেদ্য ঘাঁটিটি ধ্বংস করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য ছিল। নবীজি খায়বার অভিযানে বের হওয়ার পূর্বে ঘোষণা করেন—যারা জিহাদে আগ্রহী, একমাত্র তারাই যেন নবীজির সঙ্গী হয়। ফলে নবীজির সঙ্গে বায়আতে রিজওয়ানে শরিক হওয়া চৌদ্দশ সাহাবিই রওনা হয়। অপরদিকে খায়বারের দুর্গসমূহের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী ইহুদি যোদ্ধা-পুরুষের সংখ্যা ছিল দশ হাজার। এদের সঙ্গে ছিল বনু গাতফানের আরও এক হাজার যোদ্ধা। সব মিলিয়ে প্রতিপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল এগারো হাজার। মুসলিম বাহিনী রাতে খায়বারের উপকণ্ঠে পৌঁছায় এবং সেখানেই রাত্রিযাপন করে। সকালে যখন খায়বারের ইহুদি কৃষকরা চাষাবাদের কাজে দুর্গের বাইরে বের হয়, তখন মুসলিম বাহিনীকে দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে এবং দ্রুত দুর্গের ভেতরে ঢুকে চিৎকার করতে থাকে, 'ওই যে মুহাম্মাদ! ওই যে মুহাম্মাদ-বাহিনী!'

তখন নবীজি বলেন, 'আল্লাহু আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক! আমরা যখন কোনো সম্প্রদায়ের আঙিনায় অবতরণ করি, তখন ওই সতর্ককৃতদের প্রভাত হয় কতই-না অশুভ!'

মুসলমানরা একের পর এক খায়বারের দুর্গসমূহ জয় করতে থাকে। শেষ পর্যায়ে ইহুদিরা আত্মসমর্পণ করে এবং নবীজির সঙ্গে নিম্নোক্ত শর্তাবলিতে সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হয়—

- ইহুদিরা তাদের সকল দুর্গ ছেড়ে দেবে।
- নিজেদের অস্ত্রশস্ত্রসহ দুর্গের অভ্যন্তরের সবকিছু তারা মুসলমানদের হাতে সোপর্দ করবে।
- তারা খায়বার ছেড়ে শামে চলে যাবে। যাওয়ার সময় তারা বাহনে যা নিয়ে যাওয়া সম্ভব, তা নিয়ে যাবে।
- তাদের গচ্ছিত ও গুপ্ত সম্পদ কোথায় রাখা আছে, তা মুসলমানদের অবহিত করবে।
- তাদের নারী ও শিশুদের দাসে পরিণত করা হবে না।

অবশ্য পরে নবীজি উৎপাদিত ফল-ফসলের অর্ধেক প্রদানের বিনিময়ে ক্ষেতে কাজ করার জন্য তাদেরকে খায়বারে থাকার অনুমতি প্রদান করেন। মুসলমানদের এ অধিকার রাখা হয় যে, যেকোনো সময় চাইলে তারা তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দিতে পারবে। এই অধিকারের ভিত্তিতেই দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে খায়বার থেকে ইহুদিদেরকে পুরোপুরি বিতাড়িত করা হয়।

খায়বার অভিযানে ষোলোজন সাহাবি শহিদ হন। অপরদিকে ইহুদিদের তিরানব্বইজন নিহত হয়। অভিযান যখন শেষ পর্যায়ে, তখন হজরত জাফর বিন আবু তালিব রাযি. হাবশার মুহাজিরদের সঙ্গে নিয়ে খায়বারে পৌঁছান। জাফরকে দেখে নবীজি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে মন্তব্য করেন, 'বুঝতে পারছি না কোনটিতে বেশি আনন্দিত হব—খায়বার বিজয়ে, নাকি জাফরের আগমনে?!'

মুতার যুদ্ধ

শায়খ মুবারকপুরি রহ. লিখেছেন,

> এ যুদ্ধ ছিল নবীজির জীবদ্দশায় সংঘটিত মুসলমানদের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। মূলত এ যুদ্ধের মাধ্যমেই পরবর্তী সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অঞ্চলসমূহ বিজয়ের পথ সুগম হয়েছিল। অষ্টম হিজরির জুমাদাল উলা মাসে (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।[৪১]

যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

নবীজি কাব বিন উমায়র রাযি.-এর নেতৃত্বে চৌদ্দ সদস্যের একটি কাফেলাকে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের জন্য শামের দক্ষিণাঞ্চলে প্রেরণ করেছিলেন। পথে রোমান সাম্রাজ্যের মিত্র (রোমান করদরাজ্য বুছরায় বসবাসকারী) গাসসানি সম্প্রদায় তাদের ওপর হামলা চালায়। অপরদিকে নবীজির প্রেরিত দূত হারিস বিন উমায়র রাযি.-কে জনৈক গাসসানি প্রশাসক হত্যা করে। অধিকন্তু সে মদিনায় হামলা চালানোর হুমকিও প্রদান করে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেন।

মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ও সেনাপতি নির্বাচন

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অভিযানের জন্য তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তিনি বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন যায়দ বিন হারিসা রাযি.-কে। এরপর বলেন, যদি যায়দ নিহত হয়, তাহলে জাফর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। জাফরও নিহত হলে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা। নবীজি মুসলিম বাহিনীকে হারিস বিন উমায়র রাযি.-এর শহিদ হওয়ার এলাকায় গমনের এবং সেখানকার অধিবাসীদের ইসলামের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন। নবীজি বলেন, তারা যদি দাওয়াত কবুল করে, তাহলে তো ভালো; অন্যথায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে।

---

৪১. সফিউর রহমান মুবারকপুরি, *আর-রাহিকুল মাখতুম*, পৃষ্ঠা : ৩৩৭।

মুসলিম বাহিনী সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে শামের বালকা অঞ্চলের মুতা নামক এলাকায় পৌঁছার পর শত্রুবাহিনী কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় সেখানেই শিবির স্থাপন করে। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছার পর সংবাদ পায় যে, রোমানরা মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য দুই লক্ষের অধিক সৈন্য সমবেত করেছে। এ সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনী নিজেদের করণীয় নির্ধারণ করতে পরামর্শে বসে। পরামর্শের বিষয় ছিল—বিশাল শত্রুবাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য মদিনা থেকে সাহায্য তলব করা হবে, নাকি উপস্থিত প্রস্তুতি নিয়েই শত্রুর মোকাবিলা করা হবে। যুদ্ধ তো সৈন্যসংখ্যার ওপর নির্ভর করে না। মুসলিম বাহিনী অতিরিক্ত সাহায্যের অপেক্ষায় থাকলে শত্রুবাহিনী তাদেরকে সে অবকাশ না-ও দিতে পারে। পরামর্শসভায় আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি. সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> আরে! যে শাহাদাতের মৃত্যুকে তোমরা আজ এড়িয়ে যেতে চাইছ, তার অন্বেষণেই তো বের হয়েছিলে! আমরা মুসলমানরা তো কারও বিরুদ্ধে সংখ্যা ও শক্তির বলে বলীয়ান হয়ে যুদ্ধ করি না। আমরা যুদ্ধ করি কেবল এই দ্বীনের বলে বলীয়ান হয়ে, যা দ্বারা আল্লাহ আমাদের মর্যাদাবান করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমি বদর যুদ্ধের দিন দেখেছি, আমাদের মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল, উহুদ যুদ্ধে ছিল মাত্র একটি ঘোড়া। সুতরাং (সব ধরনের অমূলক চিন্তা বাদ দিয়ে) সকলে সামনে অগ্রসর হও। আমাদের সামনে দুই নিশ্চিত সুপরিণতির একটি প্রতীক্ষা করছে—হয় শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে বিজয়; আমাদের নবী তো আমাদের এর প্রতিশ্রুতিই দিয়েছেন আর তার প্রতিশ্রুতি কক্ষনো ভুল হয় না, অথবা (চির আরাধ্য) শাহাদাতের মৃত্যু; তাহলে তো আমরা জান্নাতে আমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হব।

আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার বক্তব্য শুনে সকলেই নবোদ্যমে বলীয়ান হয়ে ওঠে এবং শত্রুর মোকাবিলায় অগ্রসর হয়।

শুরু হয় দীর্ঘ সাতদিনব্যাপী এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই। যেন এক অনিঃশেষ যুদ্ধ! মাত্র তিন হাজার সৈন্য মুখোমুখি হয়েছে দুই লক্ষ সৈন্যের! পৃথিবী অবাক বিস্ময়ে অবলোকন করছে এক বিস্ময়কর ঘটনা।

সকলে হতবাক! এ-ও কি সম্ভব! কিন্তু ঈমানের পুষ্পিত বসন্ত যখন আগমন করে, তখন তো এমন বিস্ময়ই উপহার দেয়!

একটানা যুদ্ধ চলতে থাকে। যুদ্ধের পাল্লা কখনো এদিকে হেলে পড়ে, কখনো ওদিকে। ষষ্ঠ দিনে এসে যুদ্ধ যেন চরমে পৌঁছায়। মুসলিম সেনাপতি যায়দ বিন হারিসা রাযি. শহিদ হয়ে যান। পতাকা তুলে নেন জাফর বিন আবু তালিব রাযি.। প্রবল বিক্রমে লড়াই করতে করতে কিছুক্ষণ পর তিনিও শহিদ হয়ে যান। এরপর পতাকা তুলে নেন আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রাযি.। লড়াই করতে করতে তিনিও যায়দ ও জাফরের সঙ্গী হন। তখন আজলান গোত্রের ছাবিত বিন আকরাম নামক জনৈক সাহাবি মুসলিম বাহিনীর ঝান্ডা তুলে নিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর হাতে সোপর্দ করেন। সেদিনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রোমান সৈন্যদের বিভ্রান্ত করতে ভিন্ন কৌশল অবলম্বনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মুসলিম বাহিনীর ডান বাহুর সৈন্যদের বাম বাহুতে, বাম বাহুর সৈন্যদের ডান বাহুতে, সামনের অংশের সৈন্যদের পেছনের অংশে এবং পেছনের অংশের সৈন্যদের সামনের অংশে বিন্যস্ত করেন। পাশাপাশি তিনি অশ্বারোহী বাহিনীর একটি অংশকে মুতার পেছনে সঙ্গোপনে লুকিয়ে থাকতে এবং পরের দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবির-ধ্বনি দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর প্রত্যাশা ছিল, এসব কৌশলের কারণে শত্রুপক্ষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে এবং মনে করবে যে, মুসলমানদের সহায়তায় মদিনা থেকে তাজাদম সৈন্যবাহিনী এসে পড়েছে। এর ফলে তাদের লড়াই-স্পৃহা ও মানসিক শক্তি ভেঙে পড়বে। বাস্তবেও তাই ঘটে। সপ্তম দিনের যুদ্ধ শেষে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. রোমান বাহিনীর মানসিক অবসন্নতার সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে আসতে সক্ষম হন। রোমান বাহিনী মনে করে, এটি তাদেরকে ফাঁদে ফেলার জন্য মুসলিম বাহিনীর কোনো কৌশল! তাই তারা সভয়ে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন থেকে বিরত থাকে।

এ বিষয়টি এখনো উল্লেখ করা হয়নি যে, দুই লক্ষ বনাম তিন হাজারের রক্তক্ষয়ী ও ঐতিহাসিক যে যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর তিন-তিনজন সেনাপতি শহিদ হয়েছিলেন, সে যুদ্ধে কতজন সাহাবি শহিদ হন।

মুতার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মাত্র বারোজন সাহাবি শহিদ হয়েছিলেন। বিপরীতে রোমান বাহিনীর নিহত হয়েছিল অনেক অনেক গুণ বেশি সৈন্য। আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কিছু নেই! এরই নাম ঈমান ও ঈমানি শক্তি! প্রথমে ঈমান, তারপর ঈমান, তারপরও ঈমান!

'মহাবিজয়' মক্কাবিজয়

হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. লিখেছেন,

> এটি সেই মহান বিজয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আপন দ্বীন ও রাসুলকে এবং তার বিশ্বস্ত বাহিনী ও জামাতকে মর্যাদাশীল করেছেন। এ মহান বিজয়ের মাধ্যমেই তিনি কাফির-মুশরিকদের থেকে দখলমুক্ত করেছেন তাঁর পবিত্র নগরীকে এবং তাঁর সেই মোবারক গৃহকে; যাকে তিনি পৃথিবীবাসীর জন্য হেদায়াতের মাধ্যম বানিয়েছেন। এটিই সেই মহান বিজয়, যার কারণে আকাশের অধিবাসীদের মাঝে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল। সুউচ্চ-সমুজ্জ্বল আর্দ্রা তারকার কক্ষপথে যেন এ বিজয়ের মর্যাদা-তাঁবু প্রোথিত! এ বিজয়ের ফলেই মানুষ দলে দলে আল্লাহ পাকের দ্বীনে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং ভূপৃষ্ঠ যেন আনন্দ ও চমকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।[৪২]

মক্কাবিজয়ের প্রেক্ষাপট

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—হুদায়বিয়া সন্ধির পর খুযাআ গোত্র নবীজির সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিল আর বনু বকর মিত্রতা স্থাপন করেছিল কুরাইশ গোত্রের সঙ্গে। কিছুদিন পর পুরোনো শত্রুতার জের ধরে বনু বকর খুযাআ গোত্রের ওপর হামলা চালায়। তখন কুরাইশরাও তাদের মিত্র বনু বকরের সঙ্গে মিলে বনু খুযাআর ওপর হামলায় অংশ নেয়, যা ছিল হুদায়বিয়া সন্ধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে এই শর্ত উল্লেখ ছিল যে, কুরাইশরা মুসলমানদের বা মুসলমানদের মিত্রদের ওপর আক্রমণ করবে না। মিত্রতার দাবিতে বনু খুযাআ নবীজির কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে নবীজি তাদেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন এবং

---

৪২. ইবনুল কায়্যিমিল জাওযিয়্যা, *যাদুল মাআদ ফি হাদয়ি খাইরিল ইবাদ*, ৩/৩৪৭।

মক্কাবিজয়ের প্রস্তুতি শুরু করেন। নবীজি বিশিষ্ট কয়েকজন সাহাবিকেও তার মক্কা-অভিযানের সংকল্পের কথা জানান এবং তাদেরকে প্রস্তুতি নিতে বলেন। নবীজি দোয়া করেন—

«اَللّٰهُمَّ خُذِ الْعُيُونَ وَالْأَخْبَارَ عَنْ قُرَيْشٍ حَتّٰى نَبْغَتَهَا فِيْ بِلَادِهَا»

হে আল্লাহ, যতক্ষণ না আমরা কুরাইশদের ভূমিতে (তাদের অগোচরে) হঠাৎ উপস্থিত হই, ততক্ষণ পর্যন্ত গুপ্তচর ও যুদ্ধবার্তা তাদের কাছে পৌঁছতে দেবেন না।

কৃতকর্মের জন্য কুরাইশদের অনুতাপ

এদিকে কুরাইশরা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করে যে, গোত্রের অবিবেচক কিছু লোক কী মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে। তারা এর প্রতিকারবিধানের মনস্থ করে এবং চুক্তি নবায়নের জন্য নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আবু সুফিয়ানকে মদিনায় প্রেরণ করে। কিন্তু নবীজি আবু সুফিয়ানের কৈফিয়ত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান।

৪০—দ্রষ্টব্য—০২

বদরি সাহাবিগণের অত্যুচ্চ মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য

সাহাবি হাতিব বিন আবু বালতাআ রাযি. জানতেন যে, নবীজি মক্কায় অভিযান পরিচালনার সংকল্প করেছেন। তিনি নবীজির সংকল্পের সংবাদ জানিয়ে মক্কাবাসীর উদ্দেশে একটি পত্র লেখেন এবং মুযায়না গোত্রের এক নারীর মাধ্যমে তা মক্কায় প্রেরণ করেন। মহিলাটি চুলের গোছার মধ্যে পত্রটি লুকিয়ে মক্কায় রওনা হয়। নবীজি ওহির মাধ্যমে বিষয়টি অবগত হয়ে হজরত আলি রাযি. ও হজরত যুবায়র রাযি.-কে পত্রটি উদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। সাহাবিদ্বয় নবীজির নির্দেশনা মোতাবেক নির্ধারিত স্থানে গিয়ে মহিলার কাছ থেকে পত্রটি উদ্ধার করে নবীজির দরবারে ফিরে আসেন। এরপর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতিবকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, 'আল্লাহর রাসুল, অনুগ্রহ করে দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। আল্লাহর শপথ! আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী। আমি মুরতাদও হইনি, আমার ঈমানে কোনো

পরিবর্তনও আসেনি। বিষয় হলো—আমি মক্কায় বসবাস করলেও কুরাইশ বংশীয় নই (তিনি ইয়ামেনি বংশোদ্ভূত ছিলেন)। আমার পরিবার বর্তমানে মক্কায় আছে; কিন্তু সেখানে আমার কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা আমার পরিবারের দেখাশোনা করবে। আপনার সঙ্গে অন্য যারা আছে, তাদের পরিবারের দেখাশোনার জন্য তো তাদের আত্মীয়স্বজন মক্কায় আছে। আমি চেয়েছিলাম, এই উপকারটুকুর বিনিময়ে আমি কুরাইশদের আস্থা লাভ করব এবং তারা আমার পরিবার-সন্তানদের দেখাশোনা করবে।'

এ সময় দরবারে উপস্থিত হজরত উমর রাযি. আরজ করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমাকে অনুমতি দিন, আমি এর শিরশ্ছেদ করি। এ তো আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে! এ তো মুনাফিক হয়ে গেছে!' তখন নবীজি উমরকে উত্তর দেন, উমর, হাতিব বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তুমি কি জানো, আল্লাহ তাআলা বদরিদের অন্তরের নিষ্ঠার বিষয়ে অবগত হয়েই তাদেরকে বলেছেন, 'যা ইচ্ছা করতে পারো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।'

নবীজির কথা শুনে উমরের দু-চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে। তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রাসুলই সর্বজ্ঞ।

দশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে নবীজি মক্কার উদ্দেশে রওনা হন। রাবিগের নিকটবর্তী জুহফা নামক স্থানে পৌঁছে নবীজি হজরত আব্বাস রাযি.-এর সঙ্গে মিলিত হন। আব্বাস রাযি. তখন হিজরত করে মদিনায় যাচ্ছিলেন। মাররায যাহরান-এ পৌঁছে নবীজি যখন অস্থায়ী ছাউনি স্থাপন করেন, তখন আবু সুফিয়ান নবীজির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হন। আব্বাস রাযি. তাকে দেখতে পেয়ে নবীজির দরবারে নিয়ে আসেন। আবু সুফিয়ান নবীজির সামনে উপস্থিত হয়ে ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এরপর আবু সুফিয়ান রাযি. মক্কায় ফিরে যান এবং মক্কাবাসীকে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হতে বারণ করেন।

নবীজি মুসলিম বাহিনীকে চারভাগে বিন্যস্ত করে যুবায়র ইবনুল আওয়াম, খালিদ বিন ওয়ালিদ, সাদ বিন উবাদা ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে বাহিনীগুলোর নেতৃত্ব প্রদান করেন। নবীজি তাদেরকে কেবল এমন লোকদের সঙ্গে লড়াই করতে নির্দেশ দেন, যারা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসবে। এরপর বলতে গেলে বিনা রক্তপাতে বিনা বাধায় মুসলিম বাহিনী বিজয়ীবেশে মক্কায় প্রবেশ করে। কেবল অল্পকিছু মক্কাবাসী খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি খণ্ডযুদ্ধের মাধ্যমে তাদেরকে পরাজিত করেন। তাদের তেরোজন নিহত হয়, বাকিরা পালিয়ে যায়। অষ্টম হিজরি সনের ২০ রমজান (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জানুয়ারি) শুক্রবার সকালে নবীজি মক্কায় প্রবেশ করেন। বাহনে নবীজির পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন উসামা বিন যায়দ রাযি.। এ সময় নবীজি মহান আল্লাহপ্রদত্ত বিজয়-নিয়ামত লাভ করে বিনয়াবনত ছিলেন।

মক্কার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর নবীজি ধনুক হাতে নিয়ে কাবাঘরের চারপাশ প্রদক্ষিণ করেন এবং মুশরিকদের স্থাপিত প্রতিমাসমূহ ভেঙে ফেলেন। এরপর নবীজি কাবাঘরের চাবিরক্ষক উসমান বিন তালহাকে ডেকে এনে চাবি নিয়ে কাবাঘরে প্রবেশ করেন এবং কাবার অভ্যন্তরে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে কাবাঘর থেকে বের হয়ে নবীজি দেখতে পান, মক্কাবাসী সকলে মসজিদে হারামে সমবেত হয়েছে এবং নবীজি তাদের সঙ্গে কী আচরণ করেন, তার অপেক্ষায় আছে। নবীজি উপস্থিত সকলকে প্রশ্ন করেন, 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের কী ধারণা; আমি তোমাদের সঙ্গে কীরূপ আচরণ করব?'

উপস্থিত কুরাইশরা সমস্বরে উত্তর দেয়, 'আপনি সদয় ব্যবহার করবেন, এটাই আমাদের ধারণা। কারণ, আপনি (আমাদের) দয়ালু ভ্রাতা, দয়ালু ভ্রাতার পুত্র।'

তখন নবীজি বলেন, আজ আমি তোমাদের সে কথাই বলছি, যা ইউসুফ তার ভাইদের বলেছিলেন,

﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ﴾

আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই।

যাও, তোমরা সকলে মুক্ত।

এরপর নবীজি উসমান বিন তালহাকে ডেকে বলেন, 'উসমান, নাও তোমার চাবি। আজ হচ্ছে আনুগত্য ও প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন।' আরেক বর্ণনায় আছে, নবীজি তাকে বলেন, 'নাও, কাবাগৃহের চাবি চিরদিন তোমার বংশের দায়িত্বেই থাকবে। জালিম ব্যতীত কেউ তোমাদের থেকে তা ছিনিয়ে নেবে না।'

হুনায়ন ও তায়েফ অভিযান

অভিযানের প্রেক্ষাপট

মক্কাবিজয়ের দু-সপ্তাহেরও কম সময় পর নবীজির কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, হাওয়াযিন ও ছাকিফ গোত্র মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্য সমবেত করেছে এবং বলাবলি করছে যে, মুসলমানরা আমাদের ওপর আক্রমণ করার পূর্বে আমরাই তাদের ওপর হামলা চালাব। পথিমধ্যে তাদের সঙ্গে কায়স ও আয়লান গোত্রের কিছু শাখাও মিলিত হয়েছে এবং ইতিমধ্যে তারা হুনায়ন প্রান্তরে পৌঁছে গেছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে মালিক বিন আওফ নাছরি। সংবাদ পেয়ে নবীজি সিদ্ধান্ত নেন—কাফির বাহিনী মক্কায় আকস্মিক হামলা চালিয়ে পবিত্র মক্কা নগরীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করার পূর্বেই তিনি তাদের ওপর আক্রমণ চালাবেন।

নবীজি বারো হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে রওনা হন। তাদের মধ্যে দু-হাজার ছিলেন নওমুসলিম, যাদের ইসলামগ্রহণের পর হাতেগোনা মাত্র কয়েকদিন অতিবাহিত হয়েছে। বিশাল মুসলিম বাহিনীর কেউ কেউ স্বগতোক্তি করে বলে ওঠে, আজ আর যাই হোক, সংখ্যাস্বল্পতার কারণে আমরা পরাভূত হব না।

হাওয়াযিন বাহিনী মুসলিম বাহিনীর পূর্বেই হুনায়ন প্রান্তরে পৌঁছে যায় এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করে। তারা হুনায়ন প্রান্তরের বিভিন্ন গিরিপথ, বাঁকা মোড় ও গাছপালার পাশে সৈন্যদল মোতায়েন করে এবং অগ্রবর্তী মুসলিম বাহিনীকে ফাঁদে ফেলার জন্য উপত্যকার সম্মুখ অংশে এবং বিভিন্ন ঝোপের আড়ালে গুপ্তবাহিনী মোতায়েন করে। মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী অংশ হুনায়ন প্রান্তরে প্রবেশ করতেই শত্রুপক্ষের তীব্র তিরবৃষ্টির মুখোমুখি হয়। আকস্মিক এই হামলায় মুসলিম বাহিনী আতঙ্কিত হয়ে বিক্ষিপ্ত ও ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। নবীজি ও

তার সঙ্গে আশিজন মুহাজির ও আনসারি সাহাবি শত্রুপক্ষের প্রবল হামলার মুখে রণক্ষেত্রে অটল-অবিচল থেকে লড়াই চালিয়ে যান। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—আবু বকর রাযি., উমর রাযি., আলি রাযি., আব্বাস রাযি., উসামা বিন যায়দ রাযি. ও আবু সুফিয়ান বিন হারিস রাযি.। নবীজি তখন বলছিলেন,

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ❋ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ»

আমিই সত্য নবী, মিথ্যাবাদী নই আমি। (বীর) আবদুল মুত্তালিবের পুত্র (বংশধর) আমি।

নবীজি তার চাচা আব্বাস রাযি.-কে উচ্চ আওয়াজে মুসলিম বাহিনীকে আহ্বান করতে নির্দেশ দেন। আব্বাস রাযি. ছিলেন দরাজ কণ্ঠের অধিকারী। তিনি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে বলতে থাকেন, হে আনসার, হে রিজওয়ানের বায়আতকারীগণ, ছুটে এসো। তার আহ্বান শুনে সকলে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে। আল্লাহ তাআলা সকলের অন্তরে প্রশান্তি সঞ্চার করেন এবং মুসলিম বাহিনীর সহায়তায় তার অদৃশ্য বাহিনী অবতীর্ণ করেন। মুসলিম বাহিনী একযোগে হামলা চালিয়ে মুশরিকদের পরাভূত করে। মুশরিক বাহিনী এবার তাদের নারী, শিশু, ধনসম্পদ ও যুদ্ধসামগ্রী সব ফেলে ময়দান থেকে পলায়ন করে। মুসলমানরা লাভ করে প্রভূত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ।

শত্রুবাহিনীর একটি অংশ আওতাস উপত্যকায় পুনরায় সমবেত হলে নবীজি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আবু আমির আশআরি রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযান চলাকালে আবু আমির আশআরি রাযি. শহিদ হলে তার ভ্রাতুষ্পুত্র আবু মুসা আশআরি রাযি. তার স্থলাভিষিক্ত হন। উক্ত বাহিনী শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

তায়েফ অবরোধ

হাওয়াযিন গোত্রপতি মালিক বিন আওফ ও তার কিছু সঙ্গী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে তায়েফে পৌঁছে যায় এবং সেখানে দুর্গে আশ্রয় নেয়। দুর্গের ভেতরে তারা প্রচুর খাদ্যদ্রব্যও মজুত করে নেয়। মুসলিম বাহিনী তাদের অবরোধ করলে তারা দুর্গের ভেতর থেকে বৃষ্টির ন্যায় তির নিক্ষেপ করতে থাকে। তিরের আঘাতে সাইদ বিন সাইদ ইবনুল আস রাযি. ও নবীজির

ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া রাযি. শহিদ হন, আহত হন আবু বকর রাযি.-এর পুত্র আবদুল্লাহ রাযি.।

মুসলিম বাহিনী আঠারো দিন তায়েফ দুর্গ অবরোধ করে রাখে। এরপর নবীজি অবরোধ প্রত্যাহার করে প্রস্থানের সিদ্ধান্ত নেন এবং ঘোষণা করেন, ইনশাআল্লাহ! (আগামীকাল) আমরা চলে যাব।

তখন কতক সাহাবি প্রশ্ন করেন, তায়েফ জয় না করেই আমরা ফিরে যাব?!

তাদের কথা শুনে নবীজি বলেন, ঠিক আছে; তাহলে কাল সকালে আমরা যুদ্ধ করব। পরদিন যুদ্ধে অনেকে আহত হয়। দিন শেষে নবীজি পুনরায় ঘোষণা করেন, আগামীকাল আমরা ফিরে যাব। এবার সকলে সন্তুষ্টচিত্তে নবীজির ঘোষণা মেনে নেয়। নবীজি তাদের অবস্থা দেখে মৃদু হাসেন।

কতক সাহাবি নবীজিকে বনু ছাকিফের বিরুদ্ধে বদদোয়া করতে অনুরোধ করলে নবীজি দোয়া করেন,

«اَللّٰهُمَّ اهْدِ ثَقِيْفًا وَائْتِ بِهِمْ مُسْلِمِيْنَ»

> হে আল্লাহ, বনু ছাকিফকে হেদায়েত দান করো। তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দাও।

বছর না ঘুরতেই আল্লাহ তাআলা বনু ছাকিফকে হেদায়েত দান করেন। নিজেদের ইসলামগ্রহণের কথা ঘোষণা করতে মদিনায় তারা একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে।[৪৩]

---

[৪৩]. বনু ছাকিফের প্রতিনিধিদল নবম হিজরির রমজান মাসে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে।

নবীজির আনসারপ্রীতি

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুনায়ন যুদ্ধে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মক্কার কুরাইশ সম্প্রদায় ও অন্যান্য নওমুসলিম গোত্রকে বণ্টন করে দিলেন; আনসারদের কিছুই দিলেন না, তখন আনসাররা মন খারাপ করল এবং বলল, আল্লাহ তার রাসুলকে ক্ষমা করুন, তিনি কুরাইশদের দিলেন, আমাদের দিলেন না। অথচ আমাদের তরবারি এখনো তাদের রক্তে রঞ্জিত!

নবীজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আনসারদের সমবেত হতে বললেন। সকলে নির্ধারিত স্থানে সমবেত হলো, সেখানে তারা ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। নবীজি তাদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে প্রথমে আল্লাহ তাআলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, হে আনসারগণ, তোমরা এরূপ মন্তব্য করেছ কি? এটা কি সত্য নয় যে, আমি যখন তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছি, তখন তোমরা ছিলে পথভ্রষ্ট; অনন্তর আল্লাহ তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে পথপ্রদর্শন করেছেন। তোমরা কি পরস্পরে বিচ্ছিন্ন ছিলে না; অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে প্রীতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি নিঃস্ব ও পরমুখাপেক্ষী ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে সচ্ছল জীবন দান করেছেন।

নবীজি যে প্রশ্নই করছিলেন, আনসারি সাহাবিরা উত্তর দিচ্ছিল, অবশ্যই! আমাদের ওপর আল্লাহ ও তার রাসুলের অপার দয়া, অগুনতি অনুগ্রহ। এরপর নবীজি বললেন, হে আনসারগণ, তোমরা কি আমাকে জবাব দেবে না? আনসারগণ বললেন, আল্লাহর রাসুল, আমরা কী জবাব দেবো? যাবতীয় করুণা ও অনুগ্রহ-দান তো আল্লাহ ও তার রাসুলেরই।

নবীজি বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরা চাইলে এ কথা বলতে পার যে, (মক্কাবাসী) আপনাকে অবিশ্বাস করার পর আপনি যখন

আমাদের কাছে এসেছিলেন, তখন আমরাই তো আপনাকে সত্যায়ন করেছি। আপনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় এসেছিলেন, আমরাই আপনার প্রতি সহায়তার হাত প্রসারিত করেছি। আপনাকে উপেক্ষা করা হয়েছিল, তখন আমরাই আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি। আপনি নিঃস্ব ছিলেন, আমরাই আপনার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছি।

হে আনসারগণ, তোমরা পার্থিব তুচ্ছ কিছু সম্পদের জন্য আল্লাহর রাসুলের প্রতি মনঃক্ষুণ্ন হয়েছ! আমি তো এ সম্পদ দ্বারা কিছু লোককে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছি, যেন তারা নিষ্ঠাবান মুসলমানে পরিণত হয়। আর তোমাদেরকে তোমাদের (মহাসম্পদ) ইসলামের ওপর সোপর্দ করেছি।

হে আনসাররা, তোমরা কি এতে খুশি নও যে, অন্যরা উট-বকরি নিয়ে বাড়ি ফিরবে আর তোমরা বাড়ি ফিরবে আল্লাহর রাসুলকে সঙ্গে নিয়ে? ওই মহান সত্তার শপথ, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যদি হিজরত না হতো, তবে আমিও একজন আনসার হতাম (আমার জন্ম হতো আনসারদের মধ্যেই)। মনে রেখো, যদি সকল মানুষ এক পথে চলে আর আনসাররা চলে অন্য পথে, তাহলে আমি আনসারদের পথেই চলব। হে আল্লাহ, আপনি আনসারদের রহম করুন, আনসার-সন্তানদের প্রতি দয়ার আচরণ করুন এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মদের প্রতিও দয়া ও করুণা করুন।

নবীজির বক্তব্য শেষ হতে উপস্থিত আনসারি সাহাবিরা কান্নায় ভেঙে পড়ল। অশ্রুতে তাদের মুখমণ্ডল ও দাড়ি সিক্ত হয়ে গেল। তারা সমস্বরে বলল, বণ্টনে আল্লাহ ও তার রাসুলকে পেয়ে আমরা সন্তুষ্ট।

—০—

তাবুক অভিযান

নবম হিজরির রজব মাসে (৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে) তাবুক অভিযান সংঘটিত হয়। মদিনায় তখন চলছিল গ্রীষ্মের মৌসুম। গরমও ছিল প্রচণ্ড।

অভিযানের প্রেক্ষাপট

নবীজি সংবাদ পান যে, রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতিগণ মদিনায় হামলা চালাতে বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে এবং আরব ভূখণ্ডের যেসব খ্রিষ্টান গোত্র তাদের অধীনস্থ ছিল, তারাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। মদিনার বাতাসে রোমানদের আসন্ন হামলার নানা সংবাদ উড়ে বেড়াতে থাকে। নবীজি সাহাবায়ে কেরামকে যুদ্ধে বের হতে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সকলে যেন যথাযথ প্রস্তুতি নিতে পারে, এ উদ্দেশ্যে আপন নীতির ব্যতিক্রম করে ঘোষণার মাধ্যমে গন্তব্যের কথা জানিয়ে দেন।

তখন ছিল ফল পাকার মৌসুম, কিছুদিন পরই পাকা ফল সংগ্রহ করতে হবে। গরমও ছিল প্রচণ্ড। মদিনায় তখন প্রচণ্ড অভাব ও দুর্ভিক্ষ। বাহনজন্তুরও বড় অভাব। এমন সময় সবাই ফল-ফসল ও ছায়ার মাঝেই থাকতে চাচ্ছিল। তাৎক্ষণিকভাবে কেউ যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিল না। তদুপরি ছিল পথের দূরত্ব ও দুর্গমতা।

অভিযান-প্রস্তুতির জন্য নবীজি সকলকে ত্যাগ-কুরবানি ও দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে মুমিনগণ আপন আপন সম্পদ ব্যয়ে অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হয়। হজরত উসমান বিন আফফান রাযি., আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি., আবু বকর সিদ্দিক রাযি., উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি., আব্বাস রাযি., তালহা রাযি., মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি. প্রমুখ শ্রেষ্ঠ সাহাবিগণ এ ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। প্রত্যেকেই আল্লাহর কাছে আজর ও প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় সামর্থ্যের সর্বোচ্চটুকু দান করে দেন।

মদিনার মুনাফিকরা গরমের অজুহাত দেখিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় যুদ্ধ হতে দূরে থাকার কথা ঘোষণা করে এবং অন্যদেরকেও অভিযানে যোগ না দিতে প্ররোচিত করে। বিপরীতে নিষ্ঠাবান অনেক মুসলমান প্রচণ্ড দরিদ্রতা সত্ত্বেও নবীজির সঙ্গে জিহাদে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তারা নবীজির

দরবারে যুদ্ধযাত্রার জন্য সাওয়ারির ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানায়। নবীজি অপারগতা প্রকাশ করলে তারা যখন বিফল মনোরথে ফিরে যাচ্ছিল, তখন দুঃখে তাদের দু-চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। বস্তুত তাবুক অভিযান ছিল মুনাফিকদের কপটতা ও মুখলিস-একনিষ্ঠ মুমিনদের ঈমানি পরিচয় যুগপৎ উন্মোচনকারী।

ত্রিশ হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে নবীজি রওনা হন। প্রতি দু-তিনজনের জন্য পালাক্রমে আরোহণের জন্য একটি করে উট ছিল। মুসলিম বাহিনীর মূল ঝান্ডা ছিল আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর হাতে। মুহাজিরদের পতাকা ছিল যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর হাতে, আওস গোত্রের পতাকা ছিল উসায়দ বিন হুযায়র রাযি.-এর হাতে এবং খাযরাজ গোত্রের পতাকা ছিল হুবাব ইবনুল মুনযির রাযি.-এর হাতে। বাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত করা হয় আব্বাদ বিন বিশর রাযি.-কে।

মুসলিম বাহিনী তাবুকে পৌঁছার পর রোমানদের সৈন্যসমাবেশের কোনো লক্ষণ দেখতে না পেয়ে দশ-বারো দিন সেখানে অবস্থান করে। এরই মধ্যে (রোমান করদরাজ্য) আয়লা অঞ্চলের প্রশাসক ইউহান্না এবং জারবা ও আযরুহ-এর অধিবাসীগণ নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধি করে। নবীজি তাদেরকে সন্ধিনামা প্রদান করেন।

মদিনা হতে তায়েফ গমন, তায়েফ হতে মদিনায় প্রস্থান এবং তায়েফে অবস্থান—সবমিলিয়ে তাবুক অভিযানে পঞ্চাশ দিন সময় লেগেছিল। মুসলিম বাহিনী নবম হিজরির রমজান মাসে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে।

নবম হিজরিতে আবু বকর রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলমানদের হজ সম্পাদন

তাবুক অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবীজি হজ আদায়ের মনস্থ করেন। কিন্তু পরে নবীজি ইরশাদ করেন, হজের সময় মুশরিকরাও (মসজিদে হারামে) উপস্থিত হবে এবং বিবস্ত্র হয়ে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে। এ অবস্থার নিরসন না হওয়া পর্যন্ত আমি হজ করতে চাচ্ছি না। নবীজি আবু বকর রাযি.-কে হজে প্রেরণ করেন। এরপর আলি রাযি.-কে এই মর্মে প্রেরণ করেন যে, তিনি ও আবু বকর রাযি. যেন ঘোষণা করে দেন—আগামী বছর থেকে মুশরিকরা হজ করতে পারবে না। আর মুশরিকদের ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার জন্য চার মাসের সুযোগ দেওয়া

হচ্ছে। চারমাস শেষ হওয়ার পর মুশরিকদের সঙ্গে লড়াই ব্যতীত ভিন্ন কোনো পথ থাকবে না।

আরবের বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের আগমন ও ইসলামগ্রহণ

মক্কাবিজয় ও তাবুক অভিযানের পর ছাকিফ গোত্র ঈমান আনে এবং নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করে। এরপর আরবের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একে একে প্রতিনিধিদল নবীজির দরবারে আগমন করতে থাকে। মূলত পুরো আরব ইসলামের অনুপম আদর্শের সামনে মাথা নত করতে আরও আগ থেকেই উন্মুখ ছিল। কুরাইশরা কী করে, তারা তা দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। কারণ, কুরাইশ সম্প্রদায় ছিল আরবের নেতৃত্বের আসনে, তারাই ছিল বায়তুল্লাহ ও হারামের তত্ত্বাবধায়ক। যখন মক্কা বিজিত হয় এবং কুরাইশ গোত্র ইসলামের বশীভূত হয়, তখন সমগ্র আরব উপলব্ধি করে যে, ইসলামের নবীর সঙ্গে শত্রুতা বা যুদ্ধ করার শক্তি তাদের নেই। তাই তারা দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে সমবেত হতে থাকে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন—

﴿إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ ۙ وَ رَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ
اَفْوَاجًا ۙ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا﴾

যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে এবং আপনি মানুষকে দেখবেন আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে, তখন আপনি আপন প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তার পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অতি ক্ষমাশীল।

[সুরা নাস্‌র : ১-৩]

বিদায় হজ

দশম হিজরি সনে (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে) নবীজি ঘোষণা করেন—তিনি এ বছর হজে গমন করবেন। ফলে মদিনায় এক লক্ষের অধিক মুসলমানের সমাবেশ ঘটে। সকলেই চাচ্ছিলেন নবীজির অধীনে হজ করে নবীজির হজকর্ম অনুসরণ করতে। নবীজি ২৫ জিলকদ মদিনা হতে রওনা হন এবং যুলহুলায়ফা হতে হজ ও উমরার ইহরাম করেন।

> "বড় চিত্তাকর্ষক ও গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী ও আবেগপূর্ণ এক দৃশ্য! হৃদয় যেন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়, নয়নযুগল অশ্রুতে সিক্ত হয়! ইতিহাস যেন থমকে দাঁড়ায়, শ্রদ্ধায় ও মর্যাদায় অবনত হয়ে যায়! তিনিই তো সেই ব্যক্তি, যিনি তার দাওয়াতের মিশন শুরু করেছিলেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ-একাকী, পুরো আরব দাঁড়িয়েছিল তার বিরুদ্ধে। সবাই তার বিরুদ্ধে লড়েছে সামর্থ্য ও শক্তির সবটুকু দিয়ে। আজ তারাই সকলে তার পেছনে সমবেত হয়েছে এবং তার অনুসরণ করছে! আর সেদিনের সেই নিঃসঙ্গ 'তিনি' আজ আপন রবের সামনে বিনয়ে অবনত হয়ে, দয়া ও প্রীতির বন্ধনে সকলকে আবদ্ধ করে চলছেন সকলকে নেতৃত্ব দিয়ে।"

ইহরাম শেষে নবীজি পুনরায় পথ চলা শুরু করেন। তিনি সকলকে হজের বিধিবিধান, সুন্নাহ ও করণীয় শিখিয়ে দেন। নবীজি আরাফার দিন সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সুসমৃদ্ধ এক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি ইসলামের ভিত্তি ও বিধানসমূহ বর্ণনা করেন, শিরক ও জাহিলিয়াতের ভিত্তি ও প্রথাসমূহ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং অন্যের জানমাল, ইজ্জত-আবরুসহ যেসব বিষয়ের মর্যাদারক্ষার বিধান সকল আসমানি ধর্মে ছিল, সেগুলোর মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেন। নবীজি জাহিলি যুগের সকল কুপ্রথার মূলোৎপাটন করেন, নারীদের সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন ফিতনা সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করেন। সবশেষে নবীজি সকল মুসলমানকে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরার আহ্বান জানান। কেননা, এ দুটিই হলো ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতা থেকে উম্মাহর নিষ্কৃতির প্রকৃত অবলম্বন।

হজের যাবতীয় কর্ম সম্পাদন করে নবীজি মদিনায় ফিরে আসেন। রিসালাতের দায়িত্ব, দ্বীনি আমানতের যথার্থ সংরক্ষণ, উম্মাহর প্রতি কল্যাণকামিতা, উম্মাহর উদ্বেগ-দুশ্চিন্তা দূরীকরণ এবং উম্মাহকে আঁধার হতে আলোর পথে আনয়ন—আল্লাহপ্রদত্ত সকল দায়িত্বপালন ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। বাকি কেবল আপন প্রতিপালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও মিলনের প্রস্তুতি!

নবীজির শেষ পদক্ষেপ

উসামা বিন যায়দ রাযি.-এর নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ

হজ সমাপ্ত করে মদিনায় ফিরে আসার পরই নবীজি সকলকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। তিনি আসন্ন অভিযানের জন্য সেনাপতি নির্ধারণ করেন উসামা বিন যায়দ রাযি.-কে। নবীজি তাকে তার পিতা যায়দ বিন হারিসা রাযি.-এর শাহাদাতের স্থানে যাওয়ার এবং বালকা ও ফিলিস্তিনভূমির দারুম অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। অথচ ততদিনে নবীজির অন্তিম রোগযন্ত্রণা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

যেহেতু উসামা বিন যায়দ রাযি. ছিলেন নবীন-যুবক সাহাবি[৪৪], তাই কেউ কেউ তাকে সেনাপতি নির্ধারণ করায় সমালোচনা করে মন্তব্য করে, প্রবীণ মুহাজির ও আনসার সাহাবিগণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও নবীজি একজন অল্প বয়সী ছেলেকে সেনাপতি নির্ধারণ করলেন! সমালোচনার কথা শুনে নবীজি তীব্র শিরপীড়া সত্ত্বেও মাথায় পট্টি বেঁধে মসজিদে উপস্থিত হন এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এখন যদি তোমরা উসামা বিন যায়দের নেতৃত্বের বিষয়ে সমালোচনা ও আপত্তি করো (তাহলে আশ্চর্যের কী আছে), ইতিপূর্বে তো তোমরা তার পিতার নেতৃত্ব নিয়েও সমালোচনা করেছিলে। আল্লাহর শপথ! সে অবশ্যই নেতৃত্বদানের উপযুক্ত ছিল। লোকজনের মধ্যে সে আমার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র ছিল। তার অবর্তমানে উসামাও আমার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র।'

---

৪৪. উসামা বিন যায়দ রাযি. হিজরতের সাত বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। নবীজি যখন তাকে আসন্ন অভিযানের সেনাপতি নির্ধারণ করেন, তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।

এরপর সকলে দ্বিধাহীন চিত্তে উসামার নেতৃত্বে সমবেত হয়। মুসলিম বাহিনী রওনা হয়ে মদিনা হতে এক ফারসাখ দূরে জারফ নামক স্থানে পৌঁছার পর নবীজির রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাওয়ার সংবাদ আসায় অভিযান স্থগিত হয়। আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল, উসামার নেতৃত্বাধীন এ অভিযান হবে ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর খিলাফত আমলে প্রেরিত প্রথম অভিযান।

নবীজির ইন্তেকাল, পরম বন্ধুর সান্নিধ্যে গমন

হজ সম্পন্ন করে মদিনায় প্রত্যাবর্তনের দু-মাস পরই নবীজি অসুস্থতা অনুভব করতে থাকেন। মাঝেমধ্যেই তিনি প্রচণ্ড শিরপীড়া অনুভব করতেন এবং বলতেন, আহ! মাথাব্যথা! অসুস্থতার প্রথম দিকে নবীজি প্রচণ্ড কষ্ট করে মসজিদে উপস্থিত হতেন এবং নামাজে ইমামতি করতেন। এরপর রোগযন্ত্রণা আরও বৃদ্ধি পেলে নবীজি আবু বকর রাযি.-কে ইমামতি করার নির্দেশ দেন।

ধীরে ধীরে নবীজির রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে উপস্থিত হয় পার্থিব জীবনের শেষ দিন। একাদশ হিজরি সনের ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাস) সোমবার। সকলে মসজিদে আবু বকর রাযি.-এর পেছনে ফজর নামাজে দণ্ডায়মান। সবার অগোচরে নবীজি আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-এর কামরার পর্দা সরিয়ে সারিবদ্ধ সাহাবিদের দিকে তাকান এবং মৃদু হাসেন। নবীজির উপস্থিতি অনুভব করে আবু বকর রাযি. ইমামের স্থান ছেড়ে পেছনে কাতারের দিকে সরে আসতে উদ্যত হন। তিনি ভেবেছিলেন, নবীজি জামাতে শরিক হতে চাচ্ছেন। আনাস রাযি. বলেন, সাহাবায়ে কেরাম নবীজিকে দেখে নামাজের মধ্যেই আনন্দিত হয়ে পড়েন। নবীজি হাতের ইশারায় তাদেরকে নামাজ সমাপ্ত করতে বলেন। এরপর নবীজি পর্দা ছেড়ে দিয়ে কামরায় ফিরে যান। নবীজির জীবদ্দশায় এরপর আর কোনো নামাজের ওয়াক্ত আসেনি।

চাশতের সময় নবীজির মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়। আম্মাজান আয়েশা রাযি. নবীজিকে তার শরীরের সঙ্গে হেলান দিয়ে শোয়ান। এ সময় আবদুর রহমান বিন আবু বকর রাযি. মিসওয়াক হাতে কামরায় প্রবেশ করেন। আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন—

আমি নবীজিকে (আমার শরীরে) ভর দিয়ে রেখেছিলাম। আমি দেখলাম, তিনি মিসওয়াকের দিকে তাকিয়ে আছেন। বুঝাতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিসওয়াকটি আপনার জন্য নেব? নবীজি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমি মিসওয়াকটি নবীজির হাতে দিলে তার কাছে মিসওয়াকটি শক্ত মনে হলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি চিবিয়ে নরম করে দেবো? নবীজি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে আমি মিসওয়াকটি চিবিয়ে নরম করে নবীজির হাতে দিলাম। নবীজির সামনে একটি পাত্রে পানি রাখা ছিল। তিনি পানিতে হাত ভিজিয়ে চেহারায় বোলাচ্ছিলেন আর বলছিলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। নিঃসন্দেহে মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় কঠিন![৪৫]

মিসওয়াক শেষ করেই নবীজি তার আঙুল উত্তোলন করেন এবং ছাদের দিকে তাকান। নবীজির ঠোঁট মোবারক নড়ছিল। আম্মাজান আয়েশা রাযি. কান পেতে শুনতে পান যে, নবীজি বলছেন, 'নবী, সিদ্দিক, শহিদ ও সৎকর্মশীল—যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গে (আমাকে মিলিত করুন)। হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, আমার প্রতি দয়ার আচরণ করুন। আমাকে পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করুন। হে আল্লাহ, আমাকে পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত করুন।

নবীজি শেষ বাক্যটি তিনবার বলেন। এরপর নবীজির হাত ঝুঁকে পড়ে, তিনি পরম বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হন।

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য, আর আমরা তার কাছেই প্রত্যাবর্তন করব।

ইন্তেকালের সময় প্রিয় নবীজির বয়স ছিল তেষট্টি বছর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

খোলাফায়ে রাশিদিন

রাযিয়াল্লাহু আনহুম

[১১-৪০ হিজরি—৬৩২-৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফত

﴿وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِى اخْتِلَافًا شَدِيْدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِىْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ﴾

আমার অবর্তমানে অচিরেই তোমরা কঠিন মতবিরোধ প্রত্যক্ষ করবে। তখন তোমাদের কর্তব্য আমার সুন্নাহ ও হেদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশিদিনের আদর্শের ওপর অবিচল থাকা। [সুনানে ইবনে মাজা, হাদিস নং ৪২]

ইসলামি ইতিহাসের এই অধ্যায়ে আমরা পাঠ করব এমন এক সোনালি কাফেলার কথা, যাদের হৃদয়জগতের বন্ধন ছিল আল্লাহর ঘর মসজিদের সঙ্গে; যারা তৃপ্তি খুঁজে পেতেন ইবাদতে ও ইবাদতের ক্লান্তিতে; যারা ছিলেন আল-কুরআনের ধারক ও প্রচারক।

নিজেদের স্বাধীন পরিচয়ে এবং দেশ ও জাতির স্বাধিকার ও সমুন্নত মর্যাদায় তারা আত্মতুষ্ট ছিলেন না। বরং তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন দেশ হতে দেশান্তরে, আল্লাহর জমিনের প্রান্তে-প্রান্তে। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে তারা পাড়ি দিয়েছেন সাগর-মরুভূমি। ইসলামের ছোঁয়ায় নিজেরা যেমন পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্ত হয়ে লাভ করেছিলেন স্বাধীনতা ও সৃষ্টির দাসত্বমুক্ত জীবন, তেমনই পৃথিবীর জাতিবর্গকেও তারা স্বাধীন জীবন উপহার দিয়েছেন। আল্লাহ-প্রদত্ত হেদায়েতের যে নুরের সন্ধান তারা পেয়েছিলেন, জগদ্‌বাসীকেও তারা সে নুরের সন্ধান দিয়েছেন। তাদের হাত ধরেই অন্ধকার পৃথিবী পেয়েছে ইহকালীন-পরকালীন সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির পথ। তারা পৃথিবী জয় করেছেন; কিন্তু আত্মসাৎ ও প্রতারণা করেননি। তারা পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু জুলুম ও সীমালঙ্ঘন করেননি। স্বাধীন পরিচয়ে জন্মগ্রহণকারী মানব সন্তানদের তারা ক্রীতদাসে পরিণত করেননি।

তারাই আমাদের পূর্বসূরি! আল্লাহ তাদেরকে আপন সন্তুষ্টির চাদরে আচ্ছাদিত করে রাখুন।

হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত

[রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি—জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি]
[জুন ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ—আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

খলিফা হজরত আবু বকর রাযি.-এর বংশপরিচয়

হজরত আবু বকর রাযি. হস্তিবাহিনীর ঘটনার দুবছর ছয় মাস পর জন্মগ্রহণ করেন। জাহিলি যুগে তার নাম ছিল আবদুল কাবা। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম পরিবর্তন করে আবদুল্লাহ রাখেন এবং তাকে আতিক ও সিদ্দিক উপাধি প্রদান করেন।[৪৬] অবশ্য তিনি তার উপনাম 'আবু বকর' দ্বারা সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার দিক থেকে হজরত আবু বকর রাযি.-এর বংশপরম্পরা নিম্নরূপ—

> আবু বকর আবদুল্লাহ বিন আবু কুহাফা উসমান বিন আমির বিন আমর বিন কাব বিন সাদ বিন তাইম বিন মুর্‌রা বিন কাব ...।

মুর্‌রা বিন কাব হতে তার বংশপরম্পরা নবীজির বংশপরম্পরার সঙ্গে মিলে গেছে।

---

৪৬. আতিক শব্দের অর্থ মুক্ত। নবীজি তাকে বলেছিলেন, 'তুমি জাহান্নাম হতে মুক্ত।' অপরদিকে সিদ্দিক শব্দের অর্থ সত্যবাদী। তিনি নবীজির ইসরা ও মেরাজের সংবাদ শোনামাত্র সত্যায়ন করেছিলেন বলে নবীজি তাকে সিদ্দিক উপাধি প্রদান করেন।

কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হজরত আবু বকর রাযি. সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

«مَا لأَحَدٍ عِنْدَنَا يَدٌ إِلاَّ وَقَدْ كَافَيْنَاهُ مَا خَلاَ أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّ لَه عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللهُ بِه يَوْمَ القِيَامَةِ، وَمَا نَفَعَنِيْ مَالُ أَحَدٍ قَطُّ مَا نَفَعَنِيْ مَالُ أَبِي بَكْرٍ»

> আবু বকর ব্যতীত এমন কারও অনুগ্রহ আমার ওপর নেই, যা আমি পরিশোধ করিনি। আবু বকরের অনুগ্রহ আমার ওপর এমন, যার বদলা আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন নিজে প্রদান করবেন। আর কারও সম্পদ দ্বারা আমার ততটুকু উপকার হয়নি, যতটুকু উপকার আবু বকরের সম্পদ দ্বারা আমার হয়েছে।[৪৭]

আবু বকর রাযি. নবীজির সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাবুকের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মূল ঝান্ডা তার হাতেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। আশারায়ে মুবাশশারার (পৃথিবীতেই জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবি) পাঁচজন তার হাতে ইসলামগ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রথম সংকলন তার তত্ত্বাবধানেই সম্পন্ন হয়। তিনি বিলাল রাযি., আমির বিন ফুহাইরা রাযি., যিন্নিরা রুমিয়া রাযি., উম্মে উবায়স রাযি. ও নাহদিয়া রাযি.-সহ সাতজন নির্যাতিত সাহাবি-সাহাবিয়াকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর নির্বাচন

রাসুলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর সাহাবায়ে কেরামের অনেকে শোক ও ভালোবাসার আতিশয্যে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না যে, নবীজির ইন্তেকাল হয়েছে। কেউ বলছিলেন, নবীজি ইন্তেকাল করেছেন; কেউ বলছিলেন, নবীজি মারা যাননি। সংবাদ পেয়ে হজরত আবু বকর রাযি. নবীজির হুজরায় উপস্থিত হন এবং কাপড় সরিয়ে নবীজির চেহারা মোবারকে চুম্বন করেন। নবীজির ইন্তেকাল সম্বন্ধে

---

৪৭. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬৬১।

নিশ্চিত হয়ে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং সমবেত সকলের উদ্দেশে বলেন—

> হামদ ও সালাতের পর, কেউ যদি মুহাম্মাদের উপাসনা করে থাকে, তাহলে তার জন্য সংবাদ হলো—মুহাম্মাদ ইন্তেকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর ইবাদত করে, তাদের মনে রাখতে হবে—আল্লাহ চিরঞ্জীব, তার মৃত্যু নেই। আল্লাহ তাআলা তো ইরশাদ করেছেন—
>
> ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ﴾
>
> আর মুহাম্মাদ একজন রাসুলমাত্র। তার পূর্বে বহু রাসুল গত হয়েছে। তার যদি মৃত্যু হয়ে যায় কিংবা তাকে হত্যা করে ফেলা হয়, তবে কি তোমরা উল্টো পথে ফিরে যাবে?
>
> [সুরা আলে ইমরান : ১৪৪]

উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হজরত উমর রাযি.-ও ছিলেন। হজরত আবু বকর রাযি.-এর মুখে এ আয়াত শুনে সকলের মনে হচ্ছিল, আয়াতটি বুঝি আজই তারা প্রথম শুনছেন। আবু বকর রাযি.-এর কথায় সকলের মন শান্ত-প্রশান্ত হয় এবং দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে যায়। এরপর সকলে বনু সাইদার ছায়া-ছাউনিতে সমবেত হয় এবং নবীজির অবর্তমানে কে মুসলমানদের নেতৃত্ব দেবেন, এ বিষয়ে পরামর্শ করে। মতবিনিময়ের পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, হজরত আবু বকর রাযি.-ই হবেন নবীজির খলিফা। সকলে এ সিদ্ধান্তে ঐকমত্য পোষণ করে। এ ধারণা মোটেও সঠিক নয় যে, হজরত আলি রাযি. আবু বকর রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণে বিলম্ব করেছিলেন। বরং তিনিও সকলের সঙ্গে শুরুতেই বায়আত গ্রহণ করেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হাফেজ ইবনে কাছির রহ. লিখেছেন—

> হজরত আলি রাযি. নবীজির ওফাতের পর প্রথম বা দ্বিতীয় দিনই আবু বকর রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কখনোই আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি এবং তার খিলাফতকালের কোনো অংশেই তার পেছনে কোনো সালাতে অনুপস্থিত থাকেননি। আবু বকর রাযি. (খিলাফতের

শুরুর দিকে) ধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহদমন অভিযানে কোষমুক্ত তরবারি নিয়ে যুলকাসসা অভিমুখে রওনা হলে আলি রাযি.-ও তার সহযোদ্ধা হয়েছিলেন। উক্ত অভিযানের বিশদ আলোচনা পরে আসছে। তবে আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে ফাতিমা রাযি.-এর মনোমালিন্য দেখা দিলে আলি রাযি. নবী-তনয়ার খাতিরে সাময়িকভাবে বাহ্যত সম্পর্কহীনতার ভাব অবলম্বন করেছিলেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ—ফাতেমা রাযি.-এর ধারণা ছিল যে, তিনি কন্যা হিসেবে নবীজির (ব্যক্তি-অধিকারে সংরক্ষিত খাস ভূমির) মিরাসপ্রাপ্তির অধিকার রাখেন।[৪৮] তিনি আবু বকর রাযি. কর্তৃক অবহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত এ কথা জানতেন না যে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'আমরা (নবী-রাসুলরা) মিরাসরূপে কোনো কিছু রেখে যাই না; আমরা যা রেখে যাই, তা সদকা।'[৪৯] ফাতেমা রাযি. আপন ধারণার ভিত্তিতে মিরাস দাবি করলে আবু বকর রাযি. উক্ত সুস্পষ্ট নববি নির্দেশনার আলোকে তা প্রদানে অস্বীকৃতি জানান। এ বিধানবলেই তিনি নবীজির স্ত্রীগণ ও তার চাচা (আব্বাস রাযি.)-কেও কোনোরূপ অধিকার বা মিরাস প্রদান করেননি।[৫০] এরপর ফাতেমা রাযি. আবু বকর রাযি.-এর কাছে খায়বার ও

---

৪৮. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিরাস হিসেবে দিনার-দিরহাম, দাস-দাসী, বকরি-উট বা অন্য কিছুই রেখে যাননি। তিনি কিছু জমি রেখে গিয়েছিলেন; যার পুরোটাই তিনি আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে গিয়েছিলেন। এমনকি ইন্তেকালের সময় নবীজির বর্মটি জনৈক ইহুদির কাছে ত্রিশ দিনারে বন্ধক রাখা ছিল। [মূল গ্রন্থের টীকা]

৪৯. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৪৫৭৮।

৫০. হজরত ফাতেমা রাযি.-এর পাশাপাশি উম্মাহাতুল মুমিনিন নবী-পত্নীগণ ও নবীজির চাচা আব্বাস রাযি.-ও খলিফা আবু বকর রাযি.-এর কাছে একই দাবি জানিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফাতেমা রাযি.-সহ তারা সকলে নবীদের মিরাস সংক্রান্ত হাদিসটি জানতেন; তবে তাদের ধারণা ছিল—খায়বারের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং নবীজি যেমন জীবদ্দশায় সেখান থেকে উৎপাদিত ফসলের অংশ তাদেরকে প্রদান করতেন, তারা নবীজির মৃত্যুর পরও তা লাভ করবেন। পরে আবু বকর রাযি. সকলকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন যে, নবীজির হাদিসটি ব্যাপক এবং খায়বার ও ফাদাক-ভূমিও এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর ফাতেমা রাযি.-সহ সকলে আপন আপন দাবি প্রত্যাহার করে নেন। সুতরাং শিয়াদের এ দাবি মোটেও সঠিক নয় যে, আবু বকর রাযি. ফাতেমা রাযি.-কে ফাদাকের ভূসম্পদের অধিকার হতে বঞ্চিত করেছেন।

ফাদাক[৫১]-এর (সদকার) ভূ-সম্পত্তিতে হজরত আলি রাযি.-কে তত্ত্বাবধায়করূপে দায়িত্বপ্রদানের আবেদন জানান। কিন্তু আবু বকর রাযি. এ আবেদন গ্রহণেও সম্মত হননি। তার যুক্তি ছিল, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতেন এবং যেসব অধিকার সংরক্ষণ করতেন, রাসুলের খলিফা হিসেবে সেসব দায়িত্ব-কর্তব্য ও অধিকার তার নিজের ওপরই বর্তায়। হজরত আবু বকর রাযি.-এর উক্ত সিদ্ধান্তের কারণে হজরত ফাতেমা রাযি.-এর মনে (স্বভাবজাত) উষ্মা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। এসব কারণে আলি রাযি. কিছু ক্ষেত্রে ফাতেমা রাযি.-এর মনস্তুষ্টি প্রয়োজনীয় মনে করেন। নবীজির ইন্তেকালের ছয়মাস পর হজরত ফাতেমা রাযি.-এর ইন্তেকাল হয়। ইতিপূর্বে আলি রাযি. আবুবকর রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে থাকলেও এ সময় তিনি বায়আতের নবায়ন সমীচীন মনে করেন।[৫২]

খলিফা নির্ধারিত হওয়ার পর হজরত আবু বকর রাযি. তার প্রথম ভাষণে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> হামদ ও সালাতের পর, উপস্থিত লোকসকল, যদিও আমাকে তোমাদের ওপর কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে; কিন্তু বাস্তব কথা হলো, আমি তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি নই। সুতরাং আমি যদি কল্যাণ আচরণ করি, তবে তোমরা আমার সহযোগিতা করবে, আর মন্দ করলে আমাকে সোজা করে দেবে। (মনে রেখো) সত্যবাদিতা হচ্ছে আমানত ও বিশ্বস্ততা আর মিথ্যাচার হচ্ছে খেয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা। তোমাদের দুর্বলতম ব্যক্তি আমার কাছে সবল, যতক্ষণ না আমি তার দুর্বলতার সমাধান করে দিই আর তোমাদের সবলতম ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল, যতক্ষণ না আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার নিকট হতে হক ও প্রাপ্য উসুল করে নিই। যখনই কোনো জাতি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা পরিত্যাগ করবে, তখনই আল্লাহ তাদের জন্য লাঞ্ছনা

---

৫১. **ফাদাক :** খায়বারের নিকটবর্তী একটি সবুজ-শ্যামল এলাকার নাম।

৫২. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৫/২৬৩।

অবধারিত করে দেবেন। যখনই কোনো জাতি অশ্লীলতার বিস্তার ঘটাবে, আল্লাহ তাদেরকে ব্যাপক দুর্যোগ ও মহাবিপদে আক্রান্ত করবেন। আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তার রাসুলের আনুগত্য করব, ততক্ষণ তোমরা আমার অনুগত থাকবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্যতা করি, তাহলে তোমাদের ওপর আমার কোনো অধিকার থাকবে না।

ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের ফিতনা

নবীজির জীবদ্দশায়ই ইরতিদাদ ও ধর্মত্যাগের অশুভ ফিতনার আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। ইয়ামামায় মুসায়লামা বিন হাবিব আল-কাজ্জাব মুরতাদ হয়ে যায়। ইয়ামেনে ধর্মত্যাগ করে আসওয়াদ আল-আ'নাসি। বনু আসাদের তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ এবং বনু তামিমের সুজা নাম্নী জনৈকা নারীও মুরতাদ হয়ে যায়। নবীজি তাদের সকলকে দমন করার জন্য বাহিনী প্রেরণের মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

আপন আপন কওমের নেতৃত্বধারী এসব লোক মূলত নিজেদের নেতৃত্ব টিকিয়ে রাখতেই মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের ধর্মত্যাগ করতে দেখে তাদের কওমের লোকেরাও কোনো প্রকার চিন্তাভাবনা ব্যতিরেকে মুরতাদ হয়ে যায়। আবু বকর রাযি. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর আরব উপদ্বীপের প্রতিটি প্রান্তে ধর্মত্যাগের ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে।[৫৩] নিঃসন্দেহে এটি ছিল আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালের সবচেয়ে বড় সংকট। বরং বলা ভালো, মুসলিম উম্মাহ তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে কখনো এ ধরনের ভয়াবহ ফিতনার সম্মুখীন হয়নি।

উসামা রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে অভিযানে প্রেরণ

এই ভয়াবহ ফিতনার মধ্যেও খলিফা আবু বকর রাযি. প্রথমেই প্রিয় নবীজির অসিয়ত বাস্তবায়নের সংকল্প করেন। প্রথমেই তিনি উসামার নেতৃত্বাধীন বাহিনীকে অভিযানের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোমান

---

[৫৩]. কেবল মক্কা, মদিনা ও আধুনিক বাহরাইন রাষ্ট্রের অন্তর্গত 'হাজার' নামক ছোট্ট একটি জনপদ বাদে সর্বত্রই ইরতিদাদের ফিতনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার জন্য এ বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন।

বিস্ময়ের বিষয় হলো, আবু বকর রাযি.-এর গৃহীত এ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কেবল নবীজির অসিয়ত বাস্তবায়নই হয়নি; বরং ধর্মত্যাগ-ফিতনার ভয়াবহতা হ্রাসকরণেও এই সিদ্ধান্ত বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর এক বর্ণনা দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

আবু হুরায়রা রাযি. বলেন—মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই! যদি আবু বকর খলিফা নিযুক্ত না হতেন, তাহলে (পৃথিবীতে) আল্লাহর ইবাদত করার মতো অবস্থা থাকত না। এ কথা তিনি পরপর তিনবার বলেন। তখন তাকে বলা হয়, থামুন! হে আবু হুরায়রা। এরপর তিনি বলেন, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাতশ সৈন্যের এক বাহিনী গঠন করে উসামা বিন যায়দের নেতৃত্বে শামের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। বাহিনী যুখুশুব এলাকায় (মদিনা হতে এক দিন দূরত্বের পথে অবস্থিত একটি উপত্যকা) পৌঁছতেই সংবাদ আসে যে, নবীজি ইন্তেকাল করেছেন। নবীজির ইন্তেকালের পরই মদিনার চারপাশের আরব গোত্রগুলো মুরতাদ হয়ে যায়। তখন সাহাবিগণ হজরত আবু বকরের কাছে সমবেত হয়ে নিবেদন করে, 'আবু বকর, আপনি উসামার বাহিনীকে ফিরিয়ে আনুন। মদিনার চারপাশে আরব গোত্রগুলো মুরতাদ হয়ে গেছে আর আপনি রোমান সাম্রাজ্য অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করতে চাচ্ছেন!' তখন আবু বকর উত্তর দেন, 'ওই সত্তার শপথ, যিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই! কুকুরপাল এসে নবীপত্নীগণের পা টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো ভয়াবহ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও আমি সেই বাহিনীকে ফিরিয়ে আনব না, যা স্বয়ং নবীজি প্রেরণ করেছেন; আমি সেই ঝান্ডার বাঁধন খুলব না, যা স্বয়ং নবীজি বেঁধেছেন।' তারপর তিনি উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করেন। উসামার বাহিনী যখনই কোনো মুরতাদ কওমের জনপদ অতিক্রম করত, তারা বলাবলি করত—দেখো, মুসলমানদের যদি শক্তি ও প্রতাপ না-ই থাকত, তাহলে তারা এমন একটি বাহিনী অভিযানে পাঠাতে পারত না। আমরা তাদের প্রতিরোধ না করে বরং তাদেরকে রোমানদের জন্য ছেড়ে দিই। মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরকে পরাজিত করে, অনেককে হত্যা করে। এরপর

নিরাপদে মদিনায় ফিরে আসে। রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের এই বিজয় ও শক্তির পরিচয় পেয়ে সেসব গোত্র ধর্মত্যাগ পরিহার করে ইসলামের ওপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নেয়।[৫৪]

এভাবেই আল্লাহ তাআলা হজরত আবু বকর রাযি.-এর সিদ্ধান্তে কল্যাণ ও বরকত দান করেন। কারণ, প্রকৃতপক্ষে এটি আবু বকর রাযি.-এর একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। তিনি ভালো করেই জানতেন যে, এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থতামুক্ত নববি নির্দেশনা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় ইজতিহাদ ও ব্যক্তিগবেষণা কিংবা মোশাওয়ারা ও সামষ্টিক সিদ্ধান্তের চিন্তা করার কোনো অবকাশ নেই।

অল্পবয়সী তরুণ উসামা বিন যায়দ রাযি.-এর বাহিনীকে বিদায় জানাতে খলিফা হজরত আবু বকর রাযি. নিজেই বেরিয়ে আসেন এবং তাদেরকে রওনা হওয়ার নির্দেশ দেন। সেনাপতি উসামা রাযি. ছিলেন বাহনে উপবিষ্ট আর খলিফা পায়ে হেঁটে কাফেলাকে এগিয়ে দিচ্ছিলেন। বিব্রত উসামা রাযি. খলিফাকে অনুরোধ করেন—আল্লাহর রাসুলের খলিফা! হয় আপনি আরোহণ করুন, নয়তো আমি নেমে আসি। আবু বকর রাযি. উত্তর দেন, আল্লাহর শপথ! না তুমি নামবে, আর না আমি আরোহণ করব! কিছু সময়ের জন্য হলেও আল্লাহর রাস্তার ধুলায় পদযুগলকে ধূসর করা আমার কর্তব্য। এরপর হজরত আবু বকর রাযি. সেনাপতি উসামা রাযি.-এর কাছে হজরত উমর রাযি.-কে নিজের সঙ্গে রাখার অনুমতি চান। উমর রাযি.-ও উসামার বাহিনীতে শামিল ছিলেন। সেনাপতি উসামা রাযি. অনুমতি প্রদান করেন।

পুনরায় ধর্মত্যাগ-ফিতনা সংক্রান্ত আলোচনায় ফিরে আসছি। খলিফা আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে দু-ধরনের ইরতিদাদি ফিতনার আবির্ভাব হয়েছিল। বনু তাঈ, বনু হানিফা, বনু আসাদ, বনু তামিম ও ইয়ামেনের একদল লোক ইসলাম ধর্ম পুরোপুরি ত্যাগ করে বিভিন্ন মিথ্যা নবী-দাবিদারদের অনুসরণ করছিল। অপরদিকে আরেক দল সরাসরি ইসলাম ত্যাগ না করলেও ইসলামের একটি অকাট্য বিধানকে অস্বীকার করছিল। তাদের দাবি ছিল—ইসলামের জাকাত-বিধান কেবল নবীযুগেই কার্যকর

---

৫৪. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৬/২৯৪।

ছিল; নবীজির ইন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গে জাকাতের বিধানও রহিত হয়ে গেছে। যুক্তি হিসেবে তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করত—

﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾

হে নবী, তাদের সম্পদ থেকে সদকা গ্রহণ করুন, যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন এবং যা তাদের পক্ষে বরকতের কারণ হবে। আর তাদের জন্য দোয়া করুন।

[সুরা তাওবা : ১০৩]

তারা এই আয়াত হতে এই ভুল মর্ম উদ্ধার করে যে, আয়াতে কেবল নবীজিকেই জাকাত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। এখন নবী নেই, তো জাকাতও নেই!

এই অপব্যাখ্যার ভিত্তিতে তারা নবীজির ইন্তেকালের পর খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-কে জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। এই দ্বিতীয় প্রকারের ধর্মত্যাগীদের সম্পর্কেই হজরত উমর রাযি. খলিফা আবু বকর রাযি.-কে তার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার অনুরোধ করেছিলেন।

উমর রাযি. খলিফাতুল মুসলিমিনকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি কীভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন? অথচ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই) বলবে। আর যখন তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, তখন তারা আমার কাছ থেকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। তবে আল্লাহর কোনো হক পরিত্যাগ করলে ভিন্ন কথা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।[৫৫]

---

৫৫. *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং ৩০৯৩।

তখন হজরত আবু বকর রাযি. উত্তর দেন, আল্লাহর শপথ! তারা নবীযুগে প্রদান করত, এমন (সামান্য) একটি বকরির বাচ্চাও যদি আমাকে প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। জাকাত তো সম্পদের হক। আল্লাহর শপথ! যারা সালাত ও জাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।[৫৬]

উমর রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই আবু বকরের অন্তরে বিষয়টির সুস্পষ্ট উপলব্ধি দান করেছেন। পরে আমি বুঝতে পারি যে, এটিই (আবু বকর রাযি.-এর সিদ্ধান্তই) সঠিক।

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য খলিফা আবু বকর রাযি. এগারোটি ক্ষুদ্র বাহিনী গঠন করেন।

১. খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী। খালিদ রাযি.-কে প্রথমে নজদের মুযার গোত্রের উপকণ্ঠে গমন করে বনু আসাদের মিথ্যা-নবী তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের বিরুদ্ধে, তারপর সেখান থেকে বুতাহ অঞ্চলে গিয়ে বনু তামিমের সর্দার মালিক বিন নুওয়াইরা-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।

২. আবু জাহল-পুত্র ইকরিমা রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী বনু হানিফা অধ্যুষিত এলাকায় মিথ্যা-নবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইয়ামামা গমন করে।

---

৫৬. হজরত উমর রাযি.-এর উল্লেখকৃত হাদিসের প্রত্যুত্তরে আবু বকর রাযি.-এর প্রদত্ত এই উত্তর কুরআন-সুন্নাহর মর্মজ্ঞান ও শরিয়ত সম্পর্কে তার অনন্যসাধারণ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট এক দলিল। আবু বকর রাযি. উমর রাযি.-কে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, নবীজির বর্ণিত 'আল্লাহর হক পরিত্যাগ' কথাটির অর্থগত ব্যাপকতায় নামাজ ও জাকাত উভয়টি অন্তর্ভুক্ত। কারণ, নামাজ হলো দৈহিক হক আর জাকাত হলো আর্থিক হক। আবু বকর রাযি. নামাজের যুক্তি দিয়ে উমর রাযি.-কে বুঝিয়েছেন যে, নামাজ পরিত্যাগকারীর ক্ষেত্রে তো তুমি-আমি সকলেই মানি যে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে। আর জাকাত তো নামাজের মতোই আল্লাহর হক। সুতরাং উভয়টি পরিত্যাগের বিধান একই হবে।
পবিত্র কুরআনের এক আয়াতেও হজরত আবু বকর রাযি.-এর এই দাবির সমর্থন পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন—

﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

তারা যদি তাওবা করে, নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে, তাহলে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

[সুরা তাওবা : ০৫]

৩. শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি.-এর নেতৃত্বে আরও একটি বাহিনী ইয়ামামা গমন করে।

৪. তারিফা বিন হাজিয রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বনু সালিমের জনপদ এবং তাদের সঙ্গে অবস্থানকারী হাওয়াযিন গোত্রের মুরতাদদের দমনে গমন করে।

৫. আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী উত্তরে কুযাআ, ওয়াদিআ ও হারিস গোত্রের দমনে গমন করে।

৬. খালিদ বিন সাইদ রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী গমন করে শামের উচ্চভূমিতে।

৭. আলা ইবনুল হাযরামি রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বাহরাইনে বনু আবদুল কায়স ও বনু রবিআ'র ধর্মত্যাগীদের সঙ্গে অবস্থানকারী হাতাম বিন যাবিআকে দমনের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়।

৮. হুযায়ফা বিন মিহছান রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী গমন করে আম্মানের দাবা অঞ্চলে।

৯. আরফাজা বিন হারছামা রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী গমন করে মাহরাবাসীর উদ্দেশে।

১০. মুহাজির বিন উমাইয়া রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী মিথ্যা-নবী আসওয়াদ আল-আ'নাসিকে দমনের উদ্দেশ্যে ইয়ামেনের সানআ'য় এবং সেখান থেকে হাযারামাওতে প্রেরিত হয়।

১১. সুওয়াইদ বিন মুকাররিন রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী গমন করে ইয়ামেনের তিহামা অঞ্চলে।

আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে প্রতিটি বাহিনীই সফলভাবে ধর্মত্যাগ-ফিতনা দমন করতে সক্ষম হয়। এসব অভিযানের মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর বাহিনীর অভিযান। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মিথ্যা নবী-দাবিদার তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের নেতৃত্বাধীন চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ইতিহাসে এ যুদ্ধ বুযাখার যুদ্ধ[৫৭] নামে খ্যাত। যুদ্ধে তুলায়হা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। পরবর্তী সময়ে (দ্বিতীয় খলিফা

---

[৫৭]. বুযাখা : নজদের বনু তাঈ বা বনু আসাদের একটি জলাধারের নাম।

উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে) তিনি তাওবা করে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হন এবং শাম ও ইরাকে বিভিন্ন অভিযানে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পর নিহাবন্দের যুদ্ধে শহিদ হন।

হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালের আরেকটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ হলো ইয়ামামার যুদ্ধ। অত্যন্ত রক্তক্ষয়ী ও কঠিন এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ইকরিমা বিন আবু জাহল। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়ামামার উদ্দেশে দুটি বাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। খলিফা আবু বকর রাযি. ইকরিমা রাযি.-কে শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি.-এর সহায়ক বাহিনী পৌঁছার পূর্বে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিবার্য কোনো কারণে ইকরিমা রাযি. খলিফার নির্দেশ রক্ষা করতে পারেননি। ফলে প্রথম দিকের লড়াইয়ে তিনি পরাভূত হন। পরবর্তী সময়ে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তার সঙ্গে যোগ দেন এবং সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। যুদ্ধে ধর্মত্যাগীদের নেতা মিথ্যা-নবী মুসায়লামাসহ বিশ হাজার মুরতাদ ইহধাম ত্যাগ করে। মুসলিম বাহিনীর বারোশ যোদ্ধা শহিদ হন, যাদের মাঝে চারশ ছিলেন কুরআনের হাফেজ মুহাজির-আনসার সাহাবি। ইতিপূর্বে কোনো যুদ্ধে এত সাহাবি শহিদ হননি।

ইয়ামামার যুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং ত্যাগ ও আত্মনিবেদনের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত প্রকাশ পায়। যেমন :

- প্রচণ্ড যুদ্ধ চলাকালে রণক্ষেত্রে অটল-অবিচল থাকতে সাহাবায়ে কেরাম একে অপরকে উৎসাহ জোগাচ্ছিলেন এবং পরস্পরকে 'হে (সুরা) বাকারাওয়ালা' বলে আহ্বান করছিলেন।
- আনসারি সৈনিকদের ঝান্ডাবাহী ছাবিত বিন কায়স রাযি. কর্পূরমাখা কাফনের কাপড় পরিধান করে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং মাটিতে গর্ত খুঁড়ে দু-পায়ের অর্ধেক নলা মাটিতে প্রোথিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান ছিলেন। শহিদ হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এভাবেই আপন স্থানে অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যান।
- যুদ্ধে হজরত যায়দ বিন খাত্তাব রাযি.-এর শাহাদাতের পর আবু হুযায়ফা রাযি.-এর আজাদকৃত দাস সালিম মুসলিম বাহিনীর ঝান্ডা তুলে নেন। তখন মুহাজিরগণ তাকে বলে, সালিম! আমরা তোমার দিক থেকে কাফিরদের আক্রমণের আশঙ্কা করছি। উত্তরে সালিম

বলেন, (যদি আমার দিক থেকে কাফিররা আক্রমণ করতে সক্ষম হয়) তাহলে তো আমি কুরআনের নিকৃষ্ট বাহক সাব্যস্ত হব।

- যুদ্ধ চলাকালে আবু হুযায়ফা রাযি. সঙ্গীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলেন, 'হে কুরআনের ধারকগণ, নিজেদের কীর্তি দ্বারা কুরআনকে সজ্জিত করো।' এরপর তিনি মুরতাদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং শহিদ হয়ে যান।

- যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত দেখে মুরতাদ-বাহিনী একটি প্রাচীরবেষ্টিত বাগানে[৫৮] আশ্রয় নেয় এবং প্রবেশদ্বার বন্ধ করে দেয়। তখন বারা বিন মালিক রাযি. মুসলিম সৈন্যদের বলেন, তোমরা আমাকে উঠিয়ে বাগানের ভেতর ফেলে দাও। তার বারংবারের অনুরোধে সহযোদ্ধারা তাকে বর্শার সাহায্যে উঁচু করে প্রাচীরের ওপর দিয়ে ভেতরে ফেলে দেয়। তিনি একাই প্রাচীরদ্বারের সম্মুখে মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দরজা খুলে দেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর ভেতরে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়।

- ইয়ামামার যুদ্ধে মুহাজির সাহাবি আবু হুযায়ফা বিন উতবা রাযি. ও আনসারি সাহাবি আব্বাদ বিন বিশর রাযি. একই দিন শহিদ হন। নবীজি ইতিপূর্বে তাদের দুজনের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন জুড়ে দিয়েছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আলা ইবনুল হাযরামি রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বাহরাইনে প্রেরিত হয়েছিল। এই মহান বুজুর্গ সেনাপতি শত্রুবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়ে তার বাহিনী নিয়ে নির্দ্বিধায় সাগরবক্ষে নেমে গিয়েছিলেন।

বিশিষ্ট সাহাবি আবু হুরায়রা রাযি. উক্ত অভিযানে শরিক ছিলেন। তিনি বর্ণনা করেন—

> মুরতাদ-বাহিনী নৌযানের মাধ্যমে সাগর পাড়ি দিয়ে পালিয়ে গেল। এদিকে আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করতে সাগর পাড়ি দেওয়ার জন্য কোনো নৌযান খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তখন সেনাপতি

---

[৫৮]. বাগানটির অভ্যন্তরে প্রচুর সৈন্য নিহত হওয়ায় বাগানটিকে 'মৃত্যুর বাগিচা' নামকরণ করা হয়।

আলা ইবনুল হাযরামি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন এবং বাহিনীকে সমুদ্রে নেমে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি দোয়া করেছিলেন,

«يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ! يَا حَكِيْمُ! يَا كَرِيْمُ! يَا أَحَدُ! يَا صَمَدُ! يَا حَيُّ! يَا مُحْيِيْ! يَا قَيُّوْمُ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ! لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ. يَا رَبَّنَا! أَجِزْنَا مِنْ هٰذَا الْبَحْرِ».

হে মহান দয়াময়! হে প্রজ্ঞার আধার! হে করুণাময়! হে একক-অমুখাপেক্ষী ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা! হে চিরঞ্জীব! হে জীবনদাতা! হে চিরস্থায়ী! হে মহা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। হে আমাদের রব! আমাদেরকে এ সমুদ্র পার করিয়ে দিন।

তিনি সৈন্যদেরকেও এ দোয়া পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং সবাইকে সাগরে নেমে যেতে আদেশ করলেন। সকলে তার নির্দেশ পালন করল। আমরা পানির ওপর দিয়ে চলতে লাগলাম। আল্লাহর শপথ! আমাদের কারও পা বা ঘোড়ার খুর পর্যন্ত পানিতে ভেজেনি।

একাদশ হিজরি সনের বাকি অংশ মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেই অতিবাহিত হয়। সাহাবায়ে কেরাম এ সময় মোট এগারোটি বাহিনীতে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেন। আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতের পথে তারা কোনো প্রকার ক্লান্তি বা অবসাদের শিকার হননি। পুরো পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হচ্ছিল খলিফা আবু বকর রাযি., উমর রাযি., আলি রাযি. ও খলিফার পরামর্শগুরার সুদক্ষ তত্ত্বাবধানে। মহান আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি দয়ার আচরণ করুন, তাদেরকে আপন রহমতে সিক্ত করুন।

এরপর শুরু হয় দ্বাদশ হিজরি সন। বিশেষ করে ইয়ামামার যুদ্ধসহ ধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন যুদ্ধে বহু সংখ্যক কুরআনের হাফেজ-কারি সাহাবি শহিদ হওয়ায় হজরত উমর রাযি. অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখনও পুরো কুরআন একত্রে সংকলিত হয়নি; বরং সাহাবায়ে কেরামের কাছে লিখিত বিভিন্ন অংশ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় সংরক্ষিত ছিল। সাহাবিদের অনেকের পূর্ণ কুরআন মুখস্থ থাকলেও লিপিবদ্ধ ছিল না। আর নবীজি

যাদেরকে ওহি লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তারা যদিও যথাযথভাবে এ দায়িত্ব আদায় করেছিলেন; কিন্তু পুরো কুরআন তাদের কারও কাছে একত্রে সংরক্ষিত ছিল না; বরং বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল। এ কারণে হজরত উমর রাযি. তার সংশয় ও দুশ্চিন্তার কথা খলিফা আবু বকর রাযি.-কে অবগত করেন।

আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকালে কুরআনের প্রথম সংকলন

ইমাম বুখারি রহ. ওহি-লিপিকার বিশিষ্ট সাহাবি যায়দ বিন ছাবিত রাযি.-এর সূত্রে কুরআন সংকলনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। নিম্নে রেওয়ায়েতটি উল্লেখ করা হলো।

যায়দ বিন ছাবিত রাযি. বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু লোক শহিদ হওয়ার পর আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় উমরও তার কাছে উপস্থিত ছিলেন। আবু বকর আমাকে বললেন, উমর এসে আমাকে বলেছেন, 'ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাতপ্রাপ্তদের মধ্যে কারিদের সংখ্যা অনেক। আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এভাবে যদি কারিগণ শহিদ হয়ে যায়, তাহলে কুরআনের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনার কুরআন সংকলনের নির্দেশ দান করা উচিত।' উত্তরে আমি উমরকে বলেছি, 'যে কাজ স্বয়ং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, আমি কীভাবে তা করতে পারি?' প্রত্যুত্তরে উমর আমাকে বলেছেন, 'আল্লাহর শপথ! এটি কল্যাণকর হবে।' উমর আমাকে বারবার একই অনুরোধ করেছেন। একপর্যায়ে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আমিও বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। এ বিষয়ে এখন আমার অভিমত উমরের মতোই।

উমর সেখানে নীরব বসে ছিলেন, কোনো কথা বলছিলেন না। এরপর আবু বকর আমাকে বললেন, দেখো, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তোমার ব্যাপারে আমাদের কোনো সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসুলের নির্দেশে ওহি লিপিবদ্ধ করতে। সুতরাং তুমি কুরআন শরিফের বিক্ষিপ্ত আয়াতগুলোকে সংগ্রহ করে একত্রিত করো।

যায়দ বিন ছাবিত রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! তিনি যদি আমাকে একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দিতেন, তাহলে তা-ও আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চেয়ে কঠিন বলে মনে হতো না। আমি

তখন বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসুল করেননি, আপনারা সে কাজ কীভাবে করবেন? উত্তরে আবু বকর বললেন, আল্লাহর শপথ! এটি একটি কল্যাণকর কাজ হবে। এ কথাটি আবু বকর আমাকে বারবার বলতে থাকেন। অবশেষে আল্লাহ পাক আমার বক্ষকেও সেই কাজের জন্য প্রসন্ন ও প্রশস্ত করে দেন, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর ও উমরের বক্ষকে প্রসন্ন ও প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন।[৫৯]

খলিফার নির্দেশ মোতাবেক যায়দ বিন ছাবিত রাযি. কাজ শুরু করেন। অত্যন্ত জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য তিনি হাফেজ সাহাবিগণের সহায়তা গ্রহণ করেন এবং নিখুঁতভাবে কাজটি সম্পাদনের জন্য অতি সূক্ষ্ম ও আদর্শ একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

তিনি নিজে যদিও কুরআনের হাফেজ ছিলেন; কিন্তু কুরআন সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি আপন স্মৃতিশক্তির ওপর নির্ভর করেননি। এমনকি এ কাজে তিনি যাদের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের স্মৃতিশক্তির ওপরও নির্ভর করেননি। অথচ হজরত যায়দ বিন ছাবিত রাযি. ও সহযোগী সকল সাহাবিই ছিলেন বিশ্বস্ত হাফেজে কুরআন। এর পরিবর্তে তিনি নির্ভর করেন সাহাবায়ে কেরামের কাছে সংরক্ষিত কুরআন-লিপির ওপর। লিপি গ্রহণ করার জন্য তিনি দুটি শর্ত আরোপ করেন—

১. সাহাবায়ে কেরাম নবীযুগে যেসব আয়াত লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছেন, তিনি তা স্বচক্ষে দেখবেন।

২. কমপক্ষে দুজন সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে যে, তারা নবীযুগে এই লিখিত অংশটি দেখেছেন এবং তা স্বয়ং নবীজি লিখিয়েছেন।

হজরত যায়দ বিন ছাবিত রাযি. এই পদ্ধতিতে একটি একটি করে আয়াত যাচাই করে লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। সাহাবায়ে কেরামের হৃদয়-পিঞ্জরে সংরক্ষিত থাকার পাশাপাশি আয়াতগুলো খেজুর-বাকল, প্রস্তর-ফলক, চামড়া, হাড় ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ ছিল।

কুরআন সংকলন করতে গিয়ে যায়দ বিন ছাবিত রাযি. দুটি আয়াতের ক্ষেত্রে নবীযুগে লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রত্যক্ষদর্শী দুজন সাক্ষী পাননি। বরং একমাত্র খুযায়মা বিন ছাবিত আনসারি রাযি. আয়াতদুটি সম্পর্কে নবীযুগে

---

[৫৯]. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬৭৯।

লিপিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে সাক্ষ্যদান করেন। তারপরও যায়দ রাযি. আয়াতদুটি লিপিবদ্ধ করে নেন। কারণ, স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুযায়মা রাযি.-কে বিশেষ মর্যাদা দান করে ইরশাদ করেছিলেন, তোমার একার সাক্ষ্য দুজনের সাক্ষ্যের সমকক্ষ হবে। নবীজির এই শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে উক্ত আয়াতদুটিও[৬০] যায়দ রাযি.-এর নির্ধারিত শর্তের মানদণ্ডে উন্নীত হয়।

যায়দ রাযি.-এর কুরআন সংকলন সমাপ্ত হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরাম তা নিরীক্ষণ করেন এবং সকলের ঐকমত্যে উক্ত সংকলন গৃহীত হয়। সুতরাং লিপিবদ্ধ কুরআন হৃদয়ে সংরক্ষণের দিক থেকে যেমন মুতাওয়াতির[৬১] স্তরের, লিপির দিক থেকেও মুতাওয়াতির স্তরের। পৃথিবীতে কুরআন ব্যতীত অন্য কোনো গ্রন্থের এই বিশুদ্ধ-মর্যাদা নেই। আল্লাহ তাআলা আপন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তার পবিত্র কালামকে এভাবেই হেফাজত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾

বস্তুত এ উপদেশবাণী (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর রক্ষাকর্তা। [সুরা হিজর : ০৯]

---

৬০. আয়াতদুটি ছিল সুরা তাওবার শেষ দুই আয়াত। দ্রষ্টব্য : *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৬৭৯ ও জালালুদ্দিন সুয়ুতি, *আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন*, ১/২০৩।

৬১. সনদের প্রতি স্তরে নিরবচ্ছিন্ন সংখ্যাধিক্য হেতু যে বর্ণনা সুনিশ্চিতরূপে বক্তার সঙ্গে সংযুক্ত বলে সুপ্রমাণিত হয়, তাকে মুতাওয়াতির বলে। অর্থাৎ যদি কোনো একটি বাণী বা কর্ম মূল বর্ণনাকারী হতে এত অধিক পরিমাণ ব্যক্তি বর্ণনা করে, যাদের একজোট হয়ে মিথ্যা বর্ণনা করা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব মনে হয়, আর পরিমাণের এই আধিক্য বর্ণনা পরম্পরার পরবর্তী প্রত্যেক স্তরে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়, শাস্ত্রীয় পরিভাষায় তাকে 'মুতাওয়াতির' বলা হয়। মুতাওয়াতির স্তরের বর্ণনাসমূহে বর্ণিত মর্ম শরিয়ত ও বিবেকের দৃষ্টিতে অকাট্যভাবে প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনের মুখস্থকরণ প্রথম যুগ হতে নিয়ে প্রতি যুগে যেরূপ অধিক পরিমাণ মুসলমানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে, লিপিবদ্ধ কুরআনও লিপিবদ্ধ হওয়ার যুগ থেকে নিয়ে প্রতি যুগে সেরূপ অধিক পরিমাণ মুসলমানের শুদ্ধতা-স্বীকৃতি নিয়ে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে। পৃথিবীর আর কোনো গ্রন্থের এরূপ বিশুদ্ধতা-মর্যাদা নেই।

পবিত্র কুরআনের রক্ষাকর্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা। অবশ্য তিনি এর মাধ্যম হিসেবে এমন এক মোবারক কাফেলাকে কাজে লাগিয়েছেন, যাদের জীবনমরণ এবং জীবনের প্রতিটি স্পন্দন ছিল আল্লাহ ও তার দ্বীনের তরে নিবেদিত। তাদের কর্মপ্রচেষ্টায়ই সম্পন্ন হয়েছে কুরআনের প্রথম সংকলন। সকল অনুগ্রহ ও প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর।

* * *

ইসলামি বিজয়াভিযানের সূচনা

[এক] (পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত) ইরাক অঞ্চলে বিজয়াভিযান

পারস্য সাম্রাজ্য ও ইরাক পরিচিতি[৬২]

পারস্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম রাষ্ট্র। কালগত বিবেচনায় পারস্য সাম্রাজ্য পৃথিবীর প্রাচীনতম সাম্রাজ্যগুলোর একটি। মাঝে গ্রিক বিজয়ের সময়কালটুকু বাদ দিয়ে এর ব্যাপ্তি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হতে শুরু করে খ্রিষ্টপরবর্তী সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। অর্থাৎ সুদীর্ঘ প্রায় তেরো শতাব্দী পারস্য সাম্রাজ্য সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সামরিক শক্তিবলে পৃথিবীজুড়ে টিকে ছিল।

কালের পরিক্রমায় ২২৪ খ্রিষ্টাব্দে পারস্যে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের (The Parthian Empire) পতন ঘটে এবং সাসানি সাম্রাজ্য (The Sasanian Empire) প্রতিষ্ঠিত হয়। সাসানি সাম্রাজ্যের অধিপতিকে কিসরা বলা হতো। সাসানি রাজবংশের প্রথম কিসরা ছিলেন ১ম আরদ্‌শির (Ardashir I)। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত আমলে ৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে (৩১ হিজরি সনে) শেষ সাসানি সম্রাট ৩য় ইয়াযদিগার্‌দ (Yazdegerd III)-এর মৃত্যুর মাধ্যমে পারস্যে চূড়ান্তভাবে সাসানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অবশ্য এর বছরদশেক পূর্বে দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত আমলেই পুরো পারস্য অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

খ্রিষ্টপরবর্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের সাসানি সাম্রাজ্য আপন সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়। এ সময় সম্রাট নওশেরওয়া বা প্রথম খসরু (Khosrow I) আপন কীর্তি ও যোগ্যতাবলে পারস্য সাম্রাজ্যকে খ্যাতি ও

---

৬২. ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও শক্তিশালী সাম্রাজ্য ছিল পারস্য (সাসানি) সাম্রাজ্য ও রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য। যেহেতু ইতিহাসের পরবর্তী ধারাবর্ণনায় অনিবার্যভাবেই এই দুই সাম্রাজ্যের আলোচনা বারবার আসবে, তাই এখানে পারস্য সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হচ্ছে। সামনে যথাস্থানে রোমান সাম্রাজ্যের পরিচিতিও তুলে ধরা হবে। 'পারস্য সাম্রাজ্য ও ইরাক পরিচিতি' অংশটুকু অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত।

বিস্তৃতির শীর্ষ স্তরে উন্নীত করেন। তার শাসনামলেই বর্তমান সিরিয়া, ইয়ামেন ও মধ্য এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চল পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের নয় বছর পর ৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম খসরু মৃত্যুবরণ করেন।

সাসানি শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল পশ্চিমে গ্রিসের উত্তরাংশ থেকে শুরু করে পূর্বে পাঞ্জাব পর্যন্ত। আরব উপদ্বীপের উত্তর সীমান্তের অংশবিশেষ, বর্তমান ইরান, ইরাক, আর্মেনিয়া ও আফগানিস্তানের বৃহদংশ, তুরস্কের পূর্ব অংশ এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশ পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

অবশ্য আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক ড. হুসাইন মুনিস (মৃত্যু : ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) লিখেছেন, 'সাসানি আমলের পারস্য সাম্রাজ্যের আয়তন বর্ণনায় অতিরঞ্জন পাওয়া যায়। ইসলামপূর্ব পারস্য সাম্রাজ্য ইতিহাসের কোনো যুগেই সুনির্দিষ্ট সীমানার অধিকারী ছিল না। বরং শক্তিশালী শাসকের আমলে সাম্রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি পেত আর দুর্বল শাসকের আমলে হ্রাস পেত।'

তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল ছিল ইরাক। ইরাকও পৃথিবীর প্রাচীনতম জনপদসমূহের একটি। পারস্যে সাসানি রাজপরিবারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অনেক পূর্বে খ্রিষ্টপূর্ব ৫৩৯ সনে আখমিনি শাসক কুরুশ (Cyrus the Great)-এর আমলে ইরাক পারস্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কালের পরিক্রমায় সাসানিরা যখন পারস্যের অধিকারী হয়, তখন ইরাকও তাদের অধিকারে আসে। সাসানি শাসনামলেই ইরাকে জরথুস্ত্রবাদ (Zoroastrianism), ইহুদিবাদ (Judaism) ও সবশেষে খ্রিষ্টধর্মের (Christianity) প্রসার ঘটে। অবশ্য সাসানি রাজপরিবার ও পারস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী ছিল।

সাসানি আমলেই পারস্যের অভ্যন্তরে বিভিন্ন করদরাজ্যের আবির্ভাব ঘটে। করদরাজ্যগুলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের মর্যাদা ভোগ না করলেও সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অধিক স্বাধীনতা ভোগ করত। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকেন্দ্রিক আরব লাখমি রাজ্যের কথা। আরবরা সেখানে পারস্য কিসরার সামন্ত হিসেবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করত। ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে

(১২ হিজরি সনে) মুসলমানদের হাতে হিরা নগরীর পতন হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ইরাকে লাখমি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সম্পদ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিবেচনায় ইরাকভূমি ছিল সাসানি রাজপরিবারের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। বর্তমান ইরাকের দুই বিখ্যাত নগরী কুফা ও বসরার তখন অস্তিত্বই ছিল না। বাগদাদ ছিল দজলা (The Tigris) তীরের ছোট একটি বসতি। তৎকালীন ইরাকের বিখ্যাত দুই নগরী ছিল মাদায়েন ও হিরা। বর্তমানে নগরীদুটির অস্তিত্বই নেই। মাদায়েন ছিল সাসানি আমলে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী। দজলা নদীর উভয় তীর ঘেঁষে এর বিস্তৃতি ছিল।[৬৩] অপরদিকে হিরা নগরীর অবস্থান ছিল ফুরাত (The Euphrates) নদীর তীরে। হিরা ছিল লাখমি করদরাজ্যের রাজধানী। ইরাকের উবুল্লা[৬৪] ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের প্রধান বন্দর। ভারত ও চীনসহ প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বাণিজ্যিক জাহাজগুলো এখানেই নোঙর করত।

পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত সাওয়াদ[৬৫] অঞ্চল ও আরব উপদ্বীপে বনু তাগলিব, বনু বকর, বনু শায়বান, বনু রাবিআ, বনু তাই-সহ বিভিন্ন আরব গোত্র বসবাস করত। এসব গোত্রের মধ্যে বনু তাগলিবসহ কিছু গোত্র ছিল খ্রিষ্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পর নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরবের বাইরের বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধিপতি ও বিভিন্ন করদরাজ্যের রাজন্যবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত সংবলিত পত্র প্রেরণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় নবীজি সপ্তম হিজরি সনে বিশিষ্ট সাহাবি আবদুল্লাহ বিন হুযাফা রাযি.-এর মাধ্যমে তৎকালীন পারস্য অধিপতি পারভেজ বা দ্বিতীয় খসরুর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু পত্রপাঠ শুরু করতেই পারভেজ নবীজির পত্র ছিঁড়ে ফেলেন এবং

---

৬৩. **মাদায়েন** : বর্তমান বাগদাদ থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সালমান পাক (Salman Pak) নামক এলাকায় ছিল তৎকালীন মাদায়েন বা টেসিফোন নগরী।

৬৪. **উবুল্লা** : আধুনিক বসরার যে অংশটি 'আশার' নামে পরিচিত, সেখানেই ছিল উবুল্লার অবস্থান। ইবনে সিরিন রহ.-এর মতে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুসা আ. ও খিযির আ.-এর জনপদবাসীর কাছে খাবার প্রার্থনার ঘটনা উবুল্লাতেই সংঘটিত হয়।

৬৫. **সাওয়াদ** : ফুরাতের পূর্ব তীর ও দজলার পশ্চিম তীরের মধ্যে অবস্থিত সুবিস্তৃত সবুজ-শ্যামল গ্রামীণ ভূমিকে সাওয়াদ বলা হতো।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আমার এক তুচ্ছ প্রজা তার পত্রে আমার পূর্বে তার নাম লিখেছে!' নবীজি এ সংবাদ পাওয়ার পর বদদোয়া করেন, 'আল্লাহ তার রাজত্বকেও ছিন্নভিন্ন করে দিন।' এর অল্প কদিন পরই পারভেজ তার পুত্র শিরওয়াইহ-এর হাতে নিহত হন।

নবীজির জীবদ্দশায় পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে মুসলমানদের কোনো সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। পারস্যের সঙ্গে মুসলমানদের সশস্ত্র লড়াইয়ের সূত্রপাত হয় মুসান্না বিন হারিসা রহ.[৬৬]-এর মাধ্যমে। মুসান্না ছিলেন আরব উপদ্বীপের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী বনু শায়বান গোত্রের অন্যতম সর্দার ও দুঃসাহসী বীর সেনানী। ইয়ামামার যুদ্ধের পরই মুসান্না তার স্বগোত্রীয় অনুসারীদের নিয়ে উবুল্লার বিভিন্ন অংশে ঝটিকা হামলা শুরু করেন। প্রাথমিক সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি ১১ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) মদিনায় খলিফা আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং ইরাকে পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি প্রার্থনা করেন। খলিফা তাকে বনু বকরের মুসলমানদের সেনাপতি নির্ধারণ করে অভিযান পরিচালনার অনুমতিপত্র প্রদান করেন। মুসান্না ফিরে এসে তার গোত্রের আরও কিছু লোককে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম হন এবং প্রায় দুই হাজার সদস্যের একটি বাহিনী তৈরি করে পারস্যের অভ্যন্তরে হামলা অব্যাহত রাখেন। তিনি তার বাহিনী নিয়ে বিভিন্ন জনপদে হামলা চালিয়ে দ্রুত মরুভূমিতে ফিরে আসতেন। মুসান্নার সাক্ষাতের পরই মূলত খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর অন্তরে পারস্য অভিযানের চিন্তা জাগ্রত হয়। তবে সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে খলিফা গোটা পারস্য সাম্রাজ্য জয়ের পরিকল্পনা করার পরিবর্তে প্রথমে পারস্য সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রাণকেন্দ্র এবং আরব

---

৬৬. মুসান্না বিন হারিসা শায়বানি নবম মতান্তরে দশম হিজরি সনে ইসলামগ্রহণ করেন। ইবনে হিব্বান রহ. তাকে সাহাবি গণ্য করলেও প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধ মতানুসারে তিনি ইসলামগ্রহণ করার পর নবীজির সাক্ষাৎ-সৌভাগ্য লাভ করেননি। যদিও তিনি আপন কওমের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে নবীজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন; কিন্তু তখন তিনি ইসলামগ্রহণ করেননি। পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলমান হওয়ার পর মদিনায় আগমন করার পূর্বেই নবীজি ইন্তেকাল করেন।

উপদ্বীপের তুলনামূলক নিকটবর্তী অঞ্চল ইরাকে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন।

বিজয়াভিযানের সূচনা

ধর্মত্যাগ-ফিতনা দমনে পরিচালিত অভিযানসমূহের মাধ্যমে আরব উপদ্বীপে স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ফিতনা পুরোপুরি নির্মূল হয়ে যায়। আরব ভূখণ্ড আবারও ফিরে আসে সরল-সঠিক দ্বীনের পথে। এবার খলিফা আবু বকর রাযি. ইসলামি বিজয়াভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। দ্বাদশ হিজরি সনের শুরুতে তিনি প্রথমে ইরাক অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং এ উদ্দেশ্যে দুটি বাহিনী প্রস্তুত করেন।

প্রথম বাহিনীর সেনাপতি নির্ধারণ করা হয় খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে। খালিদ রাযি. তখন ইয়ামামায় ছিলেন। খলিফা বার্তা পাঠিয়ে তাকে ইরাকের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে অভিযান শুরু করার নির্দেশ দেন এবং উবুল্লা থেকে শুরু করে ইরাকের নিম্নভূমি হয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হতে বলেন।

দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি নির্ধারণ করা হয় ইয়ায বিন গুনম রাযি.-কে। তিনি তখন মক্কা ও বসরার মধ্যবর্তী নিবাজ নামক এলাকায় ছিলেন। খলিফা তাকে ইরাকের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন এবং বার্তায় উল্লেখ করেন—মুছাইয়াখ পৌঁছে সেখান থেকে অভিযান শুরু করবে। এরপর ইরাকের উচ্চভূমি দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করে খালিদের সঙ্গে মিলিত হবে। বাহিনীর কেউ যদি ফিরে আসতে চায়, তাকে ফিরে আসার অনুমতি দেবে। যার ইচ্ছা, অভিযানে শরিক হবে; যার ইচ্ছা, চলে আসবে। অনাগ্রহী ব্যক্তিদের নিয়ে বিজয়াভিযান শুরু করবে না।

খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. উভয় সেনাপতিকে দ্রুত ইরাকের হিরা অঞ্চলে পৌঁছতে চেষ্টা করার নির্দেশ দেন এবং জানিয়ে দেন যে, যিনি প্রথমে হিরা পৌঁছবেন, তিনি অপরজনের আমির বিবেচিত হবেন। তিনি আরও নির্দেশ দেন—তোমরা উভয়ে যখন আপন আপন দিক থেকে পেছনের পারসিক ঘাঁটিসমূহের পতন ঘটিয়ে হিরায় পৌঁছবে এবং পেছনের দিক থেকে মুসলিম বাহিনীর নিরাপত্তা সম্পর্কে পূর্ণ নিশ্চিত হবে, তখন একজন হিরায় থেকে মুসলিম বাহিনী ও হিরা অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান

করবে, অপরজন আল্লাহ ও মুসলমানদের দুশমন পারসিকদের গৌরবের প্রতীক (রাজধানী) মাদায়েন নগরীতে অভিযান পরিচালনা করতে অগ্রসর হবে।

খলিফা উভয়কে প্রত্যেক অঞ্চলের জনসাধারণের সঙ্গে কোমল আচরণ করার এবং তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেন। খলিফা বার্তায় উল্লেখ করেন—তারা যদি তোমাদের দাওয়াত কবুল করে নেয়, তাহলে তো ভালো। অন্যথায় তাদের কাছ থেকে জিজিয়া গ্রহণ করবে। যারা জিজিয়া প্রদানেও রাজি হবে না, কেবল তাদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করবে।

পাশাপাশি খলিফা ইতিপূর্বে যারা একবার ইসলামগ্রহণ করার পর মুরতাদ হয়ে গেছে, তারা নতুন করে ইসলামে দীক্ষিত হলেও অভিযানে তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

খলিফা আবু বকর রাযি. এই দুই মহান সেনাপতিকে ইরাকে প্রেরণ করার আগে থেকেই খলিফার নির্দেশনায় শায়বান গোত্রের বিশিষ্ট সর্দার বিখ্যাত তাবেয়ি সেনাপতি মুসান্না বিন হারিসা রহ. তার সঙ্গীদের নিয়ে ইরাকে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। খলিফা এবার তাকে তার সৈন্যদের নিয়ে খালিদের বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দেন। খলিফা তার কাছে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> হামদ ও সালাতের পর,
>
> আমি খালিদ বিন ওয়ালিদকে তোমার কাছে ইরাক-ভূমিতে পাঠালাম। তোমার কওমের সঙ্গীদেরকে নিয়ে তাকে স্বাগত জানাবে। এরপর তাকে সর্বাত্মক সাহায্য-সহায়তা করবে, কোনো বিষয়ে কিছুতেই তার অবাধ্যতা করবে না এবং তার মতের বিরোধিতা করবে না। মনে রাখবে, খালিদ সেসব মহান ব্যক্তির একজন, যাদের পরিচয় দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ তার মহাগ্রন্থে বলেছেন—'মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল। তার সঙ্গে যারা আছে, তারা কাফিরদের বিরুদ্ধে কঠোর এবং আপসের মধ্যে একে অন্যের প্রতি দয়ার্দ্র।' সে যতদিন তোমার সঙ্গে থাকবে, ততদিন সে-ই আমির। যদি সে কখনো চলে আসে, তখন তুমি পূর্বের ন্যায় আপন দায়িত্বে থাকবে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে একাদশ হিজরির রজব মাসে মতান্তরে দ্বাদশ হিজরির মুহাররম মাসে (৬৩২/৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) ইরাকে প্রেরণ করা হয়। তার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল আঠারো হাজার। তিনি ইরাক অভিযানে এগারোটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং মহান আল্লাহর অনুগ্রহে প্রতিটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন।

ইরাকে পরিচালিত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর অভিযানসমূহ

১. শিকলের যুদ্ধ

[মুহাররম, দ্বাদশ হিজরি]

খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তার বাহিনী নিয়ে উবুল্লা রওনা হয়ে যান। প্রথমে তিনি ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পারস্য সাম্রাজ্যের সীমান্তনগরী উবুল্লার গভর্নর হরমুযের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> হামদ ও সালাতের পর, ইসলামগ্রহণ করো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। অথবা নিজের ও আপন কওমের জন্য নিরাপত্তাচুক্তি করে নাও এবং জিজিয়া প্রদান করো। দুটির একটিও গ্রহণ না করলে পরিণতির জন্য নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। কারণ, আমি এমন একদল সৈন্য নিয়ে তোমাদের উদ্দেশে এসেছি, যারা মৃত্যুকে ততটাই ভালোবাসে, যতটা তোমরা ভালোবাসো জীবনকে।

খালিদ বিন ওয়ালিদ তার বাহিনীকে তিন ভাগে বিভক্ত করেন। তিনি অগ্রবর্তী অংশের নেতৃত্ব প্রদান করেন মুসান্না বিন হারিসা রহ.-কে, মধ্যবর্তী অংশের নেতৃত্ব প্রদান করেন আদি বিন হাতিম তাঈ রাযি.-কে আর শেষ অংশটির নেতৃত্ব রাখেন নিজের হাতে। তিনি নির্দেশ জারি করেন যে, প্রতিটি অংশ ভিন্ন ভিন্ন পথে সামনে অগ্রসর হবে।

উবুল্লার গভর্নর ও শত্রুবাহিনীর প্রধান হরমুয খালিদের বাহিনীর আগমন-সংবাদ এবং খালিদের বার্তা পেয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় নিজেই অগ্রসর হয়। যুদ্ধ শুরু হলে আল্লাহর অনুগ্রহে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পারস্য-সেনাপতি হরমুয খালিদকে হত্যা করার জন্য শঠতা ও প্রতারণার আশ্রয় নিলেও মহান আল্লাহর অনুগ্রহে কা'কা' বিন আমর রাযি.

তার কূটকৌশল ধরে ফেলেন এবং খালিদকে উদ্ধার করেন। এরপর হরমুয খালিদের হাতে নিহত হয়।

পারসিক বাহিনী এ যুদ্ধে এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেছিল। সৈন্যরা যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে না যায়, এজন্য তারা পরস্পরকে শিকল দ্বারা বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের এই কৌশল তাদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। এ কারণেই এ যুদ্ধের নামকরণ করা হয় 'যাতুস সালাসিল' বা শিকলের যুদ্ধ।[৬৭]

২. মাযারের যুদ্ধ

[সফর, দ্বাদশ হিজরি]

দ্বাদশ হিজরির সফর মাসে (৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে) এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো—যাতুস সালালিলের যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সেনাপতি হরমুয পারস্য-সম্রাটের নিকট দূত পাঠিয়ে খালিদ বিন ওয়ালিদের বার্তা সম্পর্কে অবগত করে এবং অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের আবেদন জানায়। তখন পারস্য সম্রাট তার বিখ্যাত সেনাপতি কারিনের নেতৃত্বে সহায়ক বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু কারিন পৌঁছার পূর্বেই হরমুয তার মূল বাহিনী নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

পরাজিত বাহিনীর বেঁচে যাওয়া সৈন্যরা পালিয়ে কারিনের সঙ্গে মিলিত হয়। কারিন মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য মাযার নামক এলাকায় শিবির স্থাপন করে।

শিকলের যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মুসলিম সেনাপতি খালিদ রাযি. মুসান্না বিন হারিসা ও তার ভাই মুআন্নার নেতৃত্বে একদল মুসলিম সৈন্যকে শত্রুবাহিনীর পলায়নরত অংশের পশ্চাদ্ধাবনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারা বেশ কয়েকটি দুর্গ জয় করতে সক্ষম হয় এবং মাযার এলাকায় পারস্য বাহিনীর সৈন্যসমাবেশ সম্পর্কে অবগতি লাভ করে।

---

৬৭. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও যাতুস সালাসিল নামে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উক্ত যুদ্ধে নবীজির প্রেরিত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন হজরত আমর ইবনুল আস রাযি.।

মুসান্নার মাধ্যমে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে অবগত হয়ে মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ খলিফাতুল মুসলিমিনকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেন এবং তার বাহিনী নিয়ে মাযারে পৌঁছান। খালিদ যেকোনো পরিস্থিতিতে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। পারসিক বাহিনীর সেনাপতি কারিন খালিদকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানালে খালিদ অগ্রসর হন। কিন্তু তার পূর্বেই মা'কাল ইবনুল আ'শা ইবনুন নাব্বাশ অগ্রসর হয়ে কারিনকে হত্যা করেন। কারিনের বাহিনীর ডানবাহুর নেতৃত্বে ছিল কুবায আর বামবাহুর নেতৃত্বে ছিল আনুশজান। তারা উভয়ে শিকলের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিল। এবার মুসলিম বাহিনী তাদের দুজনকেও হত্যা করে। আসিম বিন আমর তামিমি আনুশজানকে এবং আদি বিন হাতিম কুবাযকে হত্যা করেন। অবশেষে আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে পারসিক বাহিনী পরাজিত হয়; নিহত হয় প্রায় ত্রিশ হাজার সৈন্য, আর পালিয়ে যাওয়ার সময় সলিল সমাধি ঘটে আরও অনেক সৈন্যের। বাকিরা নৌযানে চড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ যুদ্ধে শত্রুবাহিনীর প্রচুর সংখ্যক সৈন্য মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দিও হয়, যাদের মধ্যে বিখ্যাত তাবেয়ি হাসান বসরির পিতা হাবিবও ছিলেন। তিনি তখন খ্রিষ্টান ছিলেন।

৩. ওয়ালাজার যুদ্ধ

[সফর, দ্বাদশ হিজরি]

তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের অধিপতি (কিসরা) তৃতীয় আরদ্‌শিরের কাছে মাযারের যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার আরেক বিখ্যাত সেনাপতি আনদাযগিরকে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রেরণ করেন। আনদাযগিরের নেতৃত্বাধীন পারসিক বাহিনী ওয়ালাজা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে। পারসিক বাহিনীর সেনাসমাবেশ ও ওয়ালাজায় ঘাঁটি স্থাপনের সংবাদ পেয়ে খালিদ রাযি.-ও তার বাহিনী নিয়ে ওয়ালাজায় চলে যান। তিনি মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে সুওয়াইদ বিন মুকাররিন রাযি.-কে বিজিত অঞ্চলে অবস্থানের নির্দেশ দেন এবং পারসিক বাহিনীর ওপর পেছন দিক ও দুপাশ থেকে হামলা করার জন্য দুটি দলকে গোপনে অন্য পথে প্রেরণ করেন।

মূল মুসলিম বাহিনী ওয়ালাজায় পৌঁছার পর যুদ্ধ শুরু হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই চলতে থাকে। দু-পক্ষই যখন যুদ্ধ করে কিছুটা ক্লান্ত, ঠিক তখনই গোপনে ওত পেতে থাকা মুসলিম বাহিনীর অপর দুটি অংশ পারসিক বাহিনীর পেছন দিক থেকে হামলা করে। সামনের দিক থেকে খালিদ বিন ওয়ালিদও পূর্ণ উদ্যমে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। দিশেহারা পারসিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং কঠিন ভীতির শিকার হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। পারস্য-সেনাপতি আনদাযগির পালিয়ে মরুভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলে এবং তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মারা যায়। পারসিক বাহিনীর বহু সৈন্য নিহত হয়, বন্দিও হয় প্রচুর। কথিত আছে, এ যুদ্ধে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. এমন এক অনারবি ব্যক্তির সঙ্গে মল্লযুদ্ধে মুখোমুখি হয়েছিলেন, যে একহাজার ব্যক্তির শক্তি রাখত। তিনি তাকে হত্যা করেন এবং তার লাশে হেলান দিয়ে সেদিনের আহার সারেন।[৬৮]

৪. উল্লায়স (বা আমগিশায়া)-এর যুদ্ধ

[সফর, দ্বাদশ হিজরি]

ওয়ালাজার যুদ্ধে পারসিকদের পক্ষে আরব সীমান্তে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব-খ্রিষ্টান গোত্রও অংশ নিয়েছিল। তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিল জনৈক গোত্রপ্রধান আবদুল আসওয়াদ আজালি। যুদ্ধশেষে খালিদ বিন ওয়ালিদের কাছে সংবাদ পৌঁছায়—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া আরব-খ্রিষ্টানরা পুনরায় পারসিকদের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং সম্রাট তৃতীয় আরদ্‌শিরের প্রেরিত আরেকটি বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। নতুন এই বাহিনীটির নেতৃত্বে ছিল পারস্য-সেনাপতি জাবান। আরব-পারসিক সম্মিলিত বাহিনী আবদুল আসওয়াদ ও জাবানের নেতৃত্বে তৎকালীন ইরাকের অন্যতম বিখ্যাত নগরী আমগিশায়ার প্রবেশদ্বার উল্লায়স নামক এলাকায় অবস্থান করছিল।

---

৬৮. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৩/৪৫৪।
উল্লেখ্য, হজরত খালিদ রাযি.-এর এই আচরণ বাহ্যত দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল কাফির প্রতিপক্ষের গর্ব ও দম্ভ ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার একটি কার্যকর প্রচেষ্টা। শত্রুপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার ও তাদের যুদ্ধস্পৃহা দমন করার জন্য ইসলামে এ ধরনের আচরণের অবকাশ রয়েছে।

সংবাদ পেয়েই খালিদ তার বাহিনী নিয়ে উল্লায়সে উপস্থিত হন। মুসলিম বাহিনীকে দেখতে পেয়ে সেনাপতি জাবান তার সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলে। কিন্তু সৈন্যরা মুসলিম বাহিনীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আহারের প্রস্তুতি নিতে থাকে। যেন মুসলিম বাহিনী কোনো বিষয়ই নয়! মুসলিম সেনাপতি খালিদ কালবিলম্ব না করে পারসিক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় দু-বাহিনীর মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ।

শুরুর দিকে পারসিক বাহিনী দৃঢ়তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকে। তাদের আশা ছিল, শীঘ্রই রাজধানী মাদায়েন থেকে বিখ্যাত সেনাপতি বাহমানের নেতৃত্বে বিরাট সহায়ক বাহিনী পৌঁছে যাবে। মুসলিম বাহিনী প্রবল বিক্রম ও ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। সেনাপতি খালিদ রাযি. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, আমাদের সাহায্য করা আপনার ইখতিয়ার। আপনি যদি শত্রুবাহিনীকে আমাদের কর্তৃত্বে এনে দেন, তাহলে তাদের সকলকে নিশ্চিহ্ন করব; এমনকি তাদের রক্তে নদী প্রবাহিত করব।

আল্লাহ পাক মুসলিম বাহিনীর প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং মুসলিম বাহিনী পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়। সেনাপতি খালিদের নির্দেশে যুদ্ধক্ষেত্রে ঘোষণা করা হয়—শত্রুদেরকে হত্যা করো না, জীবিত আটক করো। কেবল তাকেই হত্যা করো, যে বাধা প্রদান করে। সেনাপতির নির্দেশে মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনী পারসিক সৈন্যদের বন্দি করতে থাকে। এরপর খালিদ তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। এ যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর সত্তর হাজার সৈন্য নিহত হয়।

সেনাপতি খালিদ রাযি. বিজয়ের সুসংবাদ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশসহ বনু আজাল গোত্রের জুনদুল নামক জনৈক ব্যক্তিকে খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর নিকট প্রেরণ করেন। বার্তাবাহকের কাছ থেকে বিস্তারিত অবগত হয়ে আবু বকর রাযি. উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন—

> 'হে কুরাইশ সম্প্রদায়, তোমাদের সিংহ আরেক সিংহের ওপর জয়ী হয়েছে এবং তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। হায়! আজকের নারীরা তো খালিদের ন্যায় সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে পড়েছে!'

৫. হিরা বিজয়

[রবিউল আউয়াল, দ্বাদশ হিজরি]

আমগিশায়ায় খালিদ-বাহিনীর নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংবাদ হিরা নগরীর পারসিক মারযাবান (প্রশাসক)[৬৯] আযাযবেহর কাছে পৌঁছে যায়। তিনি নিশ্চিত উপলব্ধি করেন যে, খালিদের হিরা-অভিযান অত্যাসন্ন। আযাযবেহ জানতেন—খালিদ নদীপথে হিরায় আগমন করবেন। মুসলিম বাহিনীর নৌপথে অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে তিনি তার পুত্রের নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণ করেন এবং তাদেরকে কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করে ফুরাত নদীর স্রোতধারা বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর তিনি নিজে মূল বাহিনী নিয়ে হিরা নগরীর বাইরের অংশে এসে শিবির স্থাপন করেন এবং খালিদের অপেক্ষা করতে থাকেন।

এদিকে খালিদ তার বাহিনী নিয়ে নৌপথে উত্তরে হিরা-অভিমুখে রওনা হন। কিন্তু নদীতে বাঁধ দেওয়ায় পানিস্বল্পতার কারণে নৌযানগুলো নদীর তলদেশে আটকে যায়। ক্রুদ্ধ খালিদ শত্রুপক্ষের খোঁজ করতেই আযাযবেহর পুত্রকে পেয়ে যান এবং তাকে হত্যা করেন। এরপর তিনি দ্রুত নদী থেকে উঠে এসে তীরে অবস্থানরত বাহিনীর মুখোমুখি হন এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সকলকে হত্যা করেন। খালিদ আযাযবেহর অবগতির পূর্বেই দ্রুত হিরায় পৌঁছতে চাচ্ছিলেন। এরপর তিনি বাঁধ কেটে দেন। ফলে নদীর প্রবাহ পুনরায় স্বাভাবিক হয়ে যায়। খালিদ তার বাহিনী নিয়ে হিরা-অভিমুখে অগ্রসর হন। এদিকে আযাযবেহ পুত্রের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পড়েন এবং লড়াইয়ের পরিবর্তে ফুরাত পাড়ি দিয়ে পালিয়ে চলে যান। খালিদ নজফ হয়ে হিরায় পৌঁছে শিবির স্থাপন করেন। তিনি জানতে পারেন—হিরাবাসী সকলে দুর্গে আশ্রয় নিয়েছে। হিরা নগরীতে মোট চারটি দুর্গ ছিল। খালিদ তৎক্ষণাৎ দুর্গগুলো অবরোধ করার জন্য প্রতিটি দুর্গের জন্য একজন করে সেনাপতিকে দায়িত্ব প্রদান করেন।

- শ্বেতপ্রাসাদ অবরোধের দায়িত্ব প্রদান করা হয় যিরার বিন আযওয়ার রাযি.-কে। এ প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নেতৃত্বে ছিল আরব-খ্রিষ্টান সরদার ইয়াস বিন কুবায়ছা তাঈ।

---

৬৯. মারযাবান কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়; বরং তৎকালীন পারস্যের বিভিন্ন নগরীর গভর্নর, সেনাপতি ও বীরযোদ্ধাদের আরবরা 'মারযাবান' অভিহিত করত।

- আদাসিন প্রাসাদ অবরোধের দায়িত্ব প্রদান করা হয় যিরার বিন খাত্তাব রাযি.-কে। এ প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নেতৃত্বে ছিল আদি বিন আদি আবাদি।

- বনু মাযিনের প্রাসাদ অবরোধের দায়িত্ব প্রদান করা হয় যিরার বিন মুকাররিন রাযি.-কে। এ প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নেতৃত্বে ছিল হিরি বিন আক্কাল।

- ইবনে বুকায়লার প্রাসাদ অবরোধের দায়িত্ব প্রদান করা হয় মুসান্না বিন হারিছা রহ.-কে। এ প্রাসাদে আশ্রয়গ্রহণকারীদের নেতৃত্বে ছিল আমর বিন আবদুল মাছিহ।

খালিদ রাযি. প্রত্যেক সেনাপতিকে নির্দেশ দেন—অবরুদ্ধদের প্রথমে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করতে হবে। যদি তারা তা গ্রহণ করে, তাহলে তা সানন্দে গৃহীত হবে। আর যদি তারা অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদেরকে চিন্তাভাবনা করার জন্য এক দিনের অবকাশ দেওয়া হবে। এরপর তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে।

অবরুদ্ধ হিরাবাসী ইসলামগ্রহণ বা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে যুদ্ধকেই বেছে নেয়। তারা অবরোধকারী মুসলিম বাহিনীর ওপর প্রাচীরের ভেতর থেকে পাথর ছুড়তে থাকে। মুসলিম বাহিনী তির ছুড়ে পাল্টা জবাব প্রদান করে। একপর্যায়ে অবরুদ্ধ হিরাবাসী নতি স্বীকার করে এবং মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি খালিদের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানায়। খালিদের সম্মতিতে প্রত্যেক প্রাসাদের অধিবাসীরা পৃথকভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভর্ৎসনা করেন। এরপর হিরাবাসী বার্ষিক এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহাম জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করে[৭০] এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করে। খালিদ বিন

---

৭০. আমর বিন আবদুল মাছিহ এই সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে মূল ভূমিকা রেখেছিল। সে খালিদ রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময় একটি থলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। খালিদ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'থলের মধ্যে কী আছে?' উত্তরে সে জানায় যে, থলের মধ্যে বিষ রাখা আছে। খালিদ তাকে সঙ্গে বিষ রাখার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে উত্তর দেয়, 'আমার কওম যদি কোনো দুরবস্থার শিকার হয়, তাহলে আমি এটা খেয়ে ফেলব। কারণ, কওমের দুরবস্থা দেখার চেয়ে মৃত্যুই আমার জন্য শ্রেয়। তখন খালিদ বিষটুকু হাতে নিয়ে আল্লাহর নাম নিয়ে খেয়ে ফেলেন এবং বলেন, 'কোনো মানুষ আল্লাহ-নির্ধারিত সময়ের পূর্বে=

ওয়ালিদ রাযি. বিজয়ের সুসংবাদ জানাতে জনৈক বার্তাবাহককে উপঢৌকনসহ খলিফার দরবারে পাঠিয়ে দেন।

৪০—দ্রষ্টব্য—৩৫

মুসলমানদের চারিত্রিক মহত্ত্ব, উদারতা ও সম্পদ-বিরাগ

খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর কাছে হিরাবাসীর প্রেরিত উপহার-উপঢৌকন পৌঁছলে তিনি তা গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি একে উপহার গণ্য না করে হিরাবাসীর জিজিয়ার অংশ হিসেবে গণ্য করেন। খলিফার উদ্দেশ্য ছিল একদিকে শরিয়তনিষিদ্ধ লেনদেন থেকে আত্মরক্ষা করা, অপরদিকে জনগণের সম্পদ হাদিয়া-উপঢৌকনের নামে আত্মসাৎ করার অনারবি কুপ্রথার মূলোৎপাটন করা।

৪০—০—৩৫

সেনাপতি খালিদ রাযি. হিরাবাসীকে প্রদত্ত সন্ধিচুক্তিতে লেখেন—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

এটি খালিদ বিন ওয়ালিদের পক্ষ থেকে আদিপুত্র আমর ও আদি, আমর বিন আবদুল মাছিহ, ইয়াছ বিন কুবায়ছা ও হিরি বিন আক্কালের সঙ্গে কৃত চুক্তিনামা। তারা প্রত্যেকে হিরাবাসীর প্রতিনিধি। হিরাবাসী এ চুক্তিতে রাজি আছে এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে উল্লিখিত ব্যক্তিদেরকে নির্বাচিত করেছে। খালিদ তাদের সঙ্গে বার্ষিক এক লক্ষ নব্বই হাজার দিরহামের বিনিময়ে সন্ধিচুক্তি করছে। এই জিজিয়া তাদের সাধু-পুরোহিতসহ সকলের দুনিয়াপ্রীতির শাস্তি এবং তাদের নিরাপত্তাপ্রদানের বিনিময়। অবশ্য যারা দুনিয়াবিমুখ ও দুনিয়া পরিত্যাগকারী, তাদের কথা ভিন্ন। মুসলিম বাহিনী যদি

=কখনো মারা যায় না।' আমর বিন আবদুল মাছিহ এ দৃশ্য দেখে হতবাক হয়ে যায় এবং মন্তব্য করে, 'এমন একজন লোকও যদি আরবদের মধ্যে থাকে, তাহলে তারা যেকোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হবে।' এরপর আমর অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করে।

হিরাবাসীকে নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে আর তাদের জিজিয়া প্রদান করতে হবে না। আর যদি তারা কথা-কাজে কোনো প্রকার প্রতারণার আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদের প্রদত্ত নিরাপত্তা বহাল থাকবে না।

পারস্যের মূল কেন্দ্রস্থল ও রাজধানী মাদায়েনে আক্রমণ করার প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে ইরাকজয়ের যে স্বপ্ন খলিফা আবু বকর রাযি.-এর ছিল, হিরা বিজয়ের মাধ্যমে তার একটি অংশ বাস্তবায়িত হয়। সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেন এবং বিস্ময়কর স্বল্পতম সময়ে হিরায় পৌঁছতে সক্ষম হন। তিনি ইরাক অভিযান শুরু করেন দ্বাদশ হিজরির মুহাররম মাসে আর একই বছরের রবিউল আউয়াল মাসে হিরা বিজয় করেন। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসেরও কম সময়ে খালিদের এই অভিযান পূর্ণতায় পৌঁছায়।

৬. আনবার বিজয় (চোখের যুদ্ধ)

হিরা বিজয়ের পর খালিদ রাযি. হিরাতেই ঘাঁটি স্থাপন করেন এবং পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। মুসলিম বাহিনীর পৃষ্ঠদেশের নিরাপত্তা সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়ার পর তিনি কা'কা' বিন আমরকে হিরার দায়িত্ব প্রদান করে নিজে রওনা হন ইয়ায বিন গুনম রাযি.-এর বাহিনীকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—খলিফা আবু বকর রাযি. ইয়াযকে তার বাহিনী নিয়ে উত্তর দিক থেকে ইরাকের বিভিন্ন নগরী জয় করে খালিদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উট

পথিমধ্যে আনবার-এ পৌঁছার পর খালিদ দেখতে পান—সেখানে পারসিক সৈন্যরা সমবেত হয়েছে এবং নিজেদের দুর্গের চারপাশে পরিখা খনন করে সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করেছে। মুসলিম বাহিনীকে দেখতে পেয়ে পারসিক সৈন্যরা দুর্গ-প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে তামাশা দেখতে থাকে। মুসলিম বাহিনী আনবারের দুর্গ অবরোধ করে এবং খালিদের নির্দেশে প্রাচীরের ওপরে অবস্থানরত আনবারবাসীর চোখ লক্ষ্য করে তির ছুড়তে থাকে। প্রথমবারের নিক্ষেপেই প্রায় একহাজার সৈন্য চোখে আক্রান্ত হয়। এ কারণে এ যুদ্ধের নাম হয় 'চোখের যুদ্ধ'। আক্রান্ত পারসিক বাহিনী

শর্তসাপেক্ষে সন্ধির আবেদন জানালে মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ শর্তযুক্ত সন্ধিপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর খালিদ তার বাহিনী নিয়ে পরিখা পাড়ি দিয়ে দুর্গে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেন। তিনি বাহিনীর সঙ্গে থাকা দুর্বল ও বয়স্ক উটগুলো জবাই করেন এবং সেগুলোর মৃতদেহ ফেলে পরিখার তুলনামূলক সংকীর্ণ স্থানটি পূর্ণ করে ফেলেন। এরপর মুসলিম বাহিনী পরিখা পাড়ি দিয়ে দুর্গের কাছে চলে যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে পারসিক সৈন্যরা দুর্গের ভেতরে আশ্রয় নেয়। পারসিক বাহিনীর প্রধান শিরযাদ খালিদের প্রদত্ত শর্তেই সন্ধি করতে সম্মত হন। সিদ্ধান্ত হয়—শিরযাদ তার অশ্বারোহী সৈন্যদের প্রহরায় দুর্গ ছেড়ে চলে যাবেন; তবে কোনো সম্পদ বা আসবাবপত্র সঙ্গে নিতে পারবেন না।

৭. আইনুত তামারের অভিযান

যিব্‌রিকান বিন বদর রাযি.-কে আনবার এলাকার দায়িত্ব দিয়ে সেনাপতি খালিদ সামনে অগ্রসর হন। আইনুত তামারে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, সেখানে তামার, তাগলিব, ইয়াদ প্রভৃতি আরব-খ্রিষ্টান গোত্র তাদের মিত্রদের নিয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আক্কা বিন আবু আক্কা। আরব-খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মেহরানের নেতৃত্বে একদল পারসিক সৈন্যও ছিল। আক্কা মেহরানের কাছে দাবি জানায় যে, খালিদ-বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য আরব-খ্রিষ্টান বাহিনীই যথেষ্ট, পারসিকদের কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। সে মেহরানকে বলে, আরবদের সঙ্গে কীভাবে যুদ্ধ করতে হয়, তা আরবরাই ভালো জানে। সুতরাং খালিদের দফারফার দায়িত্ব আমাদের হাতেই ছেড়ে দিন। মেহরান এ প্রস্তাবকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সম্মতি জানিয়ে বলে, ঠিক আছে, যাও, তোমরাই খেলা শেষ করে এসো। মেহরান তার সঙ্গীদের নিয়ে দুর্গের অভ্যন্তরেই অবস্থান করে যুদ্ধপরিস্থিতির সংবাদ নিতে থাকে।

খালিদ তার বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হয়ে আক্কার বাহিনীর মুখোমুখি হন। শত্রুবাহিনীকে অগ্রসর হতে দেখে খালিদ তার সৈন্যদের বলেন, তোমরা আপন আপন স্থানে দাঁড়িয়ে থাকো। আমিই অগ্রসর হচ্ছি। তিনি তার ব্যক্তিগত দেহরক্ষীদের তার পেছনে থাকতে বলেন। খালিদ চাচ্ছিলেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দীর্ঘ পন্থাকে এড়িয়ে অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করে দিতে।

খালিদ কী করলেন?!

তিনি ধীর পদে আক্কার দিকে এগিয়ে গেলেন। আক্কা তখন তার সৈন্যদের সারিবিন্যাসে ব্যস্ত। খালিদ আক্কাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বন্দি করে ফেললেন।

এভাবে বিনাযুদ্ধেই আক্কার বাহিনী পরাজিত হয়। অনেকেই বন্দি হয়, বাকিরা পালিয়ে ছোটে আইনুত তামারের দুর্গের দিকে। দুর্গে পৌঁছে তারা দেখতে পায়, আক্কা-বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে মেহরান পারসিক সৈন্যদের নিয়ে দুর্গ ছেড়ে পালিয়েছে। শূন্য দুর্গে আক্কার অবশিষ্ট সৈনিকরা আশ্রয় নিয়ে দুর্গের দ্বার বন্ধ করে দেয়।

খালিদ এবার তার বাহিনী নিয়ে দুর্গ অবরোধ করেন। একসময় দুর্গে আশ্রয়গ্রহণকারীরা নতি স্বীকার করে এবং খালিদের নির্দেশে দুর্গ ছেড়ে নেমে আসে। খালিদ দুর্গের সামনেই আক্কা ও তার বন্দি সৈনিকদের শিরশ্ছেদের নির্দেশ দেন। দুর্গে গচ্ছিত সকল সম্পদ মুসলিম বাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে লাভ করে। খালিদ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত গির্জার একটি কক্ষ হতে চল্লিশটি কিশোরকে উদ্ধার করেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষটিতে এসব কিশোরকে ইঞ্জিলের পাঠদান করা হতো। খালিদ তাদেরকে মুসলিম বাহিনীর সম্ভ্রান্ত আমিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন। এসব কিশোরের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হজরত উসমান রাযি.-এর আজাদকৃত দাস হামরান, বিখ্যাত তাবেয়ি মুহাম্মাদ বিন সিরিন রহ.-এর পিতা সিরিন প্রমুখ।

৮. দুমাতুল জানদালের অভিযান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. ইয়ায বিন গুনম রাযি.-এর নেতৃত্বে ইরাকের উদ্দেশে আরেকটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি ইয়াযের বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ওয়ালিদ বিন উকবাকে প্রেরণ করেন। ইয়ায তখন তার বাহিনী নিয়ে দুমাতুল জানদাল[৭১] অবরোধ করেছিলেন। ওয়ালিদ উপস্থিত হয়ে দেখতে পান যে, ইয়ায ইরাকের একপ্রান্তে এক গোত্রকে অবরোধ করে রেখেছেন আর তারাও ইয়াযের বাহিনীর পথ আগলে রেখেছে। অর্থাৎ ইয়াযও যেন

---

[৭১]. দুমাতুল জানদাল : আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশের একটি নগরী।

অবরুদ্ধ হয়ে আছেন! ওয়ালিদকে পেয়ে ইয়ায বলেন, অনেক সময় একটি সুপরামর্শ এক বিরাট বাহিনীর চেয়েও বেশি উপকার করে! বলুন তো, আমরা এ পরিস্থিতিতে কী করতে পারি?

ওয়ালিদ উত্তর দেন, আপনি খালিদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে তাকে তার বাহিনী নিয়ে আপনার সহায়তায় চলে আসতে বলুন। ওয়ালিদের পরামর্শে ইয়ায খালিদের কাছে সহায়তা চেয়ে বার্তা পাঠান। আইনুত তামারের অভিযান শেষ হতেই খালিদের কাছে ইয়াযের বার্তা এসে পৌঁছায়। উত্তরে খালিদ লিখে পাঠান—

খালিদের পক্ষ হতে ইয়াযের প্রতি। আমি তো আপনার কাছেই আসছি।

لَبِّثْ قَلِيْلًا تَأْتِكَ الْخَلَائِبُ ❋ يَحْمِلْنَ آسَادًا عَلَيْهَا الْقَاشِبُ

كَتَائِبُ تَتْبَعُهَا كَتَائِبُ

> সামান্য ধৈর্য ধরুন, বাহনগুলো তো আপনার কাছেই চলে আসছে। বহন করে নিয়ে আসছে বিষধারী সিংহদেরকে। তারা আসছে দলে দলে, একের পর এক।

খালিদ এবার তার বাহিনী নিয়ে দুমাতুল জানদাল অভিমুখে রওনা হন। এদিকে খালিদের আগমন-সংবাদ জানামাত্র দুমাতুল জানদালের অধিবাসীদের মনে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। তারা দ্রুত তাদের মিত্র বাহরা, কাল্‌ব, গাসসান ও তানুখ গোত্রের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। দুমাতুল জানদালের অন্যতম সর্দার উকায়দার পালিয়ে যাওয়ার পথে খালিদ-বাহিনীর হাতে বন্দি হয়। উকায়দার ইতিপূর্বে নবীজির জীবদ্দশায় তাবুক অভিযানের সময় খালিদের কাছে আনুগত্যের অঙ্গীকার করেছিল। অঙ্গীকার ভঙ্গ করে প্রতারণা করায় খালিদ ধৃত উকায়দারকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

উকায়দারের মৃত্যুর পর দুমাতুল জানদালের অধিবাসীরা জুদি বিন রাবিআ, ইবনুল হাদারজান ও ইবনুল আবহামের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর মুখোমুখি হয়। খালিদ ও ইয়াযের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাভূত করে এবং প্রতিপক্ষের বহু সৈন্য নিহত হয়। আর দুমাতুল জানদালের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে মুসলিম বাহিনীর হাতে।

কৌশলগত দিক থেকে দুমাতুল জানদালের নিয়ন্ত্রণ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দুমাতুল জানদালে এসে মিলিত হয়েছিল—

- দক্ষিণ দিক থেকে আরব উপদ্বীপ।
- উত্তর-পূর্ব দিকে থেকে ইরাক।
- উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে শাম অঞ্চল।

এ কারণেই খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর কাছে এই নগরীর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি। দুমাতুল জানদাল মুসলমানদের অধিকারে না এলে ইরাকে তাদের অবস্থান নিঃসন্দেহে ঝুঁকির মুখে পড়ত।

৯. হুসায়দের যুদ্ধ

আরবের খ্রিষ্টান গোত্রগুলো তাদের নিহত নেতা আক্কার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারসিকদের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করে। তখন জারমেহের ও রোজবেহ নামক দুজন পারসিক সেনাপতি আনবারের উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল হজরত খালিদ রাযি. কর্তৃক আনবারে নিযুক্ত মুসলিম প্রশাসক যিব্‌রিকান বিন বদর রাযি.-কে হত্যা করে আনবার পুনরুদ্ধার করা। সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনীও রওনা হয়ে যায়। পথিমধ্যে হুসায়দে উভয় বাহিনীর সাক্ষাৎ হলে মুসলিম বাহিনী পারসিক-খ্রিষ্টান সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং শত্রুপক্ষের প্রধান জারমেহের ও রোজবেহসহ প্রচুর সৈন্যকে হত্যা করে। এখানেও মুসলিম বাহিনী প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ অর্জন করে। এ যুদ্ধকে খানাফিসের যুদ্ধও বলা হয়।

১০. মুছাইয়াখের যুদ্ধ

এরপর খালিদ সংবাদ পান যে, হুসায়দে পরাজিত সৈন্যরাসহ পারসিক বাহিনী এবার মুছাইয়াখে সমবেত হয়েছে। এবার তিনি এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করে তিনটি ভিন্ন পথে এক রাতের মধ্যে শত্রুপক্ষের অবস্থানস্থলে পৌঁছার নির্দেশ দেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে মুসলিম বাহিনী শত্রুপক্ষকে ঘুমন্ত অবস্থায় পেয়ে যায়। মুসলিম বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে শত্রুপক্ষ বিশাল ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এরপর খালিদ জানতে পারেন যে, দিয়ারে বকরের মুছনা ও যুমায়ল অঞ্চলে কিছু আরব-খ্রিষ্টান গোত্র পুনঃসংগঠিত হয়ে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সংবাদ পেয়ে তিনি পূর্বের ন্যায় তিন দিক থেকে মুছনায় হঠাৎ আক্রমণ চালান এবং শত্রুপক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে দেন। এরপর তিনি একই কায়দায় যুমায়লে অতর্কিত হামলা চালিয়ে সেখানেও শত্রুপক্ষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেন।

১১. ফিরাযের যুদ্ধ

[জিলহজ, দ্বাদশ হিজরি]

দ্বাদশ হিজরির জিলহজ মাসের মধ্যভাগে (ফেব্রুয়ারি, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) ফিরাযের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী প্রথমবারের মতো তৎকালীন বিশ্বের প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ শক্তি পারস্য সাম্রাজ্য ও প্রতীচ্যের সর্ববৃহৎ শক্তি রোমান সাম্রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনীর মুখোমুখি হয়। পারস্য ও রোমান বাহিনীর সঙ্গে তাদের আরব মিত্র তাগলিব, ইয়াদ ও নামির গোত্রও যোগ দিয়েছিল।[৭২]

ফুরাতের দুই তীরে উভয় পক্ষের সৈন্যরা সমবেত হয়। দক্ষিণ তীরে মুসলিম বাহিনী আর উত্তর তীরে রোমান-পারসিক-আরব খ্রিষ্টান সম্মিলিত বাহিনী। শত্রুপক্ষ মুসলিম বাহিনীকে জিজ্ঞেস করে, তোমরা এপারে আসবে, নাকি আমরাই ওপারে গিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করব? খালিদ উত্তর দেন, তোমরাই এপারে চলে এসো। তখন সম্মিলিত বাহিনীর পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়—তাহলে তোমরা নদীর তীর হতে দূরে সরে আমাদের পার হওয়ার জায়গা করে দাও। খালিদ উত্তর দেন, না, তোমরা বরং কিছুটা দূরে সরে গিয়ে নদী পার হও। আমরা এখান থেকে সরছি না।

খালিদের উত্তর শুনে সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃবৃন্দ চিন্তায় পড়ে যায়। নদী পাড়ি দেওয়া নিয়ে তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে থাকে। একদল লোক বলে, 'আমাদের জন্য এই পারে নিজেদের এলাকায় অবস্থান করাই

---

৭২. ফুরাত নদীর তীরে অবস্থিত ফিরায নগরী পারস্য ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত ছিল। আর তাই ফিরাযে উভয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তির একটি করে দুর্গ ছিল। পূর্বে কয়েক দশক ধরে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে নিয়মিত যুদ্ধ করলেও এ সময় তারা মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোটবদ্ধ হয়।

কল্যাণকর হবে। কারণ, এই লোক আপন দ্বীনের মর্যাদা রক্ষার জন্য লড়াই করছে আর সে যথেষ্ট প্রজ্ঞা ও রণকুশলতার অধিকারী। আল্লাহর শপথ! অবশ্যই সে বিজয়ী হবে আর আমরা পরাজিত হয়ে অপদস্থ হব।' অবশ্য শেষ পর্যন্ত নদী পাড়ি দেওয়ারই সিদ্ধান্ত হয় এবং সম্মিলিত বাহিনী কিছুটা দূরে সরে গিয়ে তারপর নদী পার হয়। নদী পাড়ি দেওয়া শেষ হলে রোমান বাহিনীর নেতৃবৃন্দ অন্যদেরকে বলে, আমরা রোমান, পারসিক ও আরব গোত্রগুলো পরস্পর পৃথক হয়ে যুদ্ধ করব। এর ফলে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেক দলের ভূমিকা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে এবং অপ্রীতিকর ফলাফল হলে বোঝা যাবে, কারা এর জন্য দায়ী।

উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান করেন। শত্রুপক্ষের হাজার হাজার সৈন্য নিহত হয়। যুদ্ধশেষে সেনাপতি খালিদ দশদিন তার বাহিনী নিয়ে ফিরাযে অবস্থান করেন। এরপর তিনি সকলকে হিরায় প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন।

ফিরাযের যুদ্ধ ছিল ইরাকে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে একাদশ যুদ্ধ। আর এই অভিযানের মাধ্যমেই ইরাকে তার অভিযান সমাপ্ত হয়।

* * *

[দুই] (রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত) শাম অঞ্চলে বিজয়াভিযান

রোমান সাম্রাজ্য ও শাম পরিচিতি[৭৩]

রোমান সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সাম্রাজ্য। রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে খ্রিষ্টপরবর্তী পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার বছর। রোমানদের উৎপত্তি যেহেতু ইতালির রোম নগরীতে, তাই তাদের নামকরণ করা হয়েছে রোমান।

রোমান সাম্রাজ্য ছিল বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানী ছিল রোম। প্রথম পাঁচ শতক সাম্রাজ্যটি সিনেটর বা প্রতিনিধি পর্ষদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। খ্রিষ্টপূর্ব ২৩ সনে প্রতিনিধি পর্ষদের নির্ধারিত ডিক্টেটর অগাস্টাস (Augustus) রোম প্রজাতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘোষণা করে রাজতন্ত্রকেন্দ্রিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এ কারণে তাকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট বিবেচনা করা হয়। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে (৮৫৭ হিজরি সনে) উসমানি সাম্রাজ্যের হাতে চূড়ান্ত পতনের পূর্ব পর্যন্ত পরবর্তী প্রায় পনেরোশ বছর রোমান সাম্রাজ্য রাজতন্ত্রের অধীনেই পরিচালিত হয়।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন বিশাল আকার ধারণ করায় শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তৎকালীন সম্রাট ডিয়োক্লেটিয়ান (Diocletian) সাম্রাজ্যকে পূর্ব-পশ্চিম দু-ভাগে বিভক্ত করেন। পরে সম্রাট কনস্টান্টাইন (Constantine the Great) রোম নগরীর নিরাপত্তাজনিত দুর্বলতাসহ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সাম্রাজ্যের রাজধানী রোম হতে বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত বাইজান্টিয়ামে (Byzantium) স্থানান্তরিত করেন। ৩৩০ খ্রিষ্টাব্দে বাইজান্টিয়ামের সংস্কারকাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তার নামানুসারে নগরীটির নতুন নামকরণ করা হয় কনস্টান্টিনোপল। এ সময় কিছুদিন সাম্রাজ্যের উভয় অংশ একই সম্রাটের অধীনে শাসিত হলেও ৩৯৫ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ১ম থিয়োডোসিয়াস (Theodosius I)-এর মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্য চিরস্থায়ীভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

---

৭৩. 'রোমান সাম্রাজ্য ও শাম পরিচিতি' শিরোনামের অংশটুকু অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে।

পশ্চিম অংশের রাজধানী হয় রোম আর পূর্ব অংশের রাজধানী হয় কনস্টান্টিনোপল। মূল অংশ বা পশ্চিম অংশটি পরিচিত হয় পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য নামে আর নবগঠিত পূর্ব অংশটি পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নামের পাশাপাশি রাজধানীর প্রাচীন নামানুসারে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামেও পরিচিতি লাভ করে।

বিভক্ত হওয়ার পরবর্তী দুই শতাব্দী পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পার্শ্ববর্তী হান, গোথ ও ভ্যান্ডাল জনগোষ্ঠীর উপর্যুপরি আক্রমণের শিকার হয়ে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকে এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হাতছাড়া হতে থাকে। অবশেষে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তখন থেকেই রোমের অধিবাসী না হয়েও রোমান সভ্যতা-সংস্কৃতি, সাম্রাজ্য ও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ায় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যই রোমান সাম্রাজ্য নামে পরিচিতি লাভ করে। যেহেতু ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে, তাই নবীযুগেও রোমান সাম্রাজ্য বলতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যকেই বোঝানো হতো। পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরিফে রোমান বলে বাইজান্টাইনদের এবং 'রোম'-ভূমি দ্বারা বাইজান্টাইন রাজধানী কনস্টান্টিনোপলকেই বোঝানো হয়েছে।[৭৪]

শুরুতে রোমান সাম্রাজ্যের পরিধি ইতালিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও ধীরে ধীরে ইতালির বাইরেও প্রসারিত হতে থাকে। কালক্রমে সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ভূমধ্যসাগরের ওপারে উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং আধুনিক মরক্কো ও আলজেরিয়ার উত্তর উপকূল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ডিক্টেটর জুলিয়াস সিজার-এর আমলে (শাসনকাল : খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯-৪৪ সন) মিশরও রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ফলে রোমানরা পরিণত হয় ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের একচ্ছত্র অধিপতিতে। রোমান সাম্রাজ্য আয়তনের দিক থেকে তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছায় সম্রাট ট্রাজানের (Trajan) আমলে (শাসনকাল : ৯৮-১১৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তার আমলে রোমান সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্রাটের আমলে সাম্রাজ্যের আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটলেও ইসলামের

---

৭৪. হিজরি সপ্তম শতাব্দীর (খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর) প্রখ্যাত কবি ও সুফিসাধক মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহ. ছিলেন বর্তমান তুরস্কের কোনিয়া অঞ্চলের অধিবাসী। তিনিও এই ব্যাপকতর অর্থের ভিত্তিতেই রোমের অধিবাসী না হয়েও 'রুমি' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

আবির্ভাবের কয়েক দশক পূর্বে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট ১ম জাস্টিনিয়ান (Justinian I)-এর সময় বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আবারও বিশালাকার ধারণ করে। এ সময় সাম্রাজ্যের আয়তন ছিল প্রায় পয়তাল্লিশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। ঐতিহাসিক শাম অঞ্চল, মিশর, এশিয়া মাইনর[৭৫] ও ইউরোপের বিশাল অঞ্চল তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেহেতু রোমান সাম্রাজ্য ও সাসানি সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন বিশ্বের মহাশক্তিধর দুই রাষ্ট্র, তাই রাজ্য বিস্তৃতি নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সব সময় সংঘাত চলত এবং উভয় সাম্রাজ্যের আয়তনেও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটত। ইসলামের আবির্ভাবকালে রোমান সাম্রাজ্য ছিল পারসিক সাসানি সাম্রাজ্যের পর পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্য।

প্রাচীন রোমানরা ছিল প্যাগানিজম (Paganism) বা পৌত্তলিকতাবাদের অনুসারী। তারা বিভিন্ন দেবতার পূজা করত। রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম আটশ বছর প্যাগানিজমই ছিল সাম্রাজ্যের মূল ধর্ম। রোমান রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা অগাস্টাসের আমলে আল্লাহর নবী হজরত ঈসা আ.-এর আগমনের মাধ্যমে পৃথিবীতে খ্রিষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। যেহেতু একদিকে খ্রিষ্টধর্মের একত্ববাদের শিক্ষা ছিল রোমানদের পৌত্তলিকতাবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক, অপরদিকে ঈসা আ.-এর প্রচারিত ন্যায় ও সাম্যের শিক্ষা ভোগবাদে বিশ্বাসী রোমান রাজপরিবারের অধীনস্থ জনগণের মাঝে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তাই রোমান রাজপরিবার খ্রিষ্টধর্মকে গ্রহণ করার পরিবর্তে শত্রুতা ও দমনের নীতি অবলম্বন করে এবং খ্রিষ্টধর্মাবলম্বীদের ওপর প্রচুর নির্যাতন চালায়। তবে কালের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে খ্রিষ্টধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সর্বস্তরে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়। চতুর্থ শতকের গোড়ার দিকে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। তার আমল হতেই রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি কঠোরতা হ্রাস করে সহনশীলতা প্রদর্শন শুরু হয়। এরপর সম্রাট ১ম থিয়োডোসিয়াসের সময় খ্রিষ্টধর্মকে রোমান সাম্রাজ্যের একমাত্র বৈধ ধর্মের

---

৭৫. এশিয়া মহাদেশের একটি বিশেষ অংশের নাম এশিয়া মাইনর। ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ অঞ্চলটি আনাতোলিয়া নামেও পরিচিত ছিল। এ অঞ্চলটিই বর্তমানে আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র। অঞ্চলটির উত্তরে কৃষ্ণসাগর, পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, দক্ষিণে আধুনিক সিরিয়া ও ভূমধ্যসাগর। আর পূর্ব সীমান্তে আছে বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চল, যা আধুনিক রাষ্ট্রসীমায় আর্মেনিয়া ও ইরানের মধ্যে পড়েছে।

মর্যাদা প্রদান করা হয়। তখন থেকে পতনের পূর্ব পর্যন্ত রোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর বুকে খ্রিষ্টধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক।

রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ ও সমৃদ্ধ অংশ ছিল শাম। বর্তমানে যদিও আধুনিক সিরিয়াও শাম নামে পরিচিত; কিন্তু প্রাচীন শাম একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম, যার বিস্তৃতি ছিল ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীর হতে মেসোপটেমিয়া[৭৬] অঞ্চল পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান, ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন[৭৭] (ইসরাইল অধিকৃত অঞ্চলসহ পশ্চিম তীর ও গাজা) এবং আধুনিক সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশ ও উত্তর সীমান্ত অঞ্চল শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও ১৯২১ সালে ফ্রান্স ও তুরস্কের মধ্যে স্বাক্ষরিত আঙ্কারা চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্কের যেসব এলাকা তুরস্কের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেগুলোও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তুরস্কের সানজাকে ইসকানদার (The Sanjak of Alexandretta) অঞ্চলও[৭৮] শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ ছাড়াও বর্তমান মিশরের সিনাই উপদ্বীপ ও বর্তমান ইরাকের মসুল অঞ্চলের কিছু অংশ শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। একদল ঐতিহাসিকের মতে পুরো সিনাই উপদ্বীপ ও সাইপ্রাসও ঐতিহাসিক শামের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য খ্রিষ্টপূর্ব ৬৪ সালে রোমানরা শাম অধিকার করার বহু পূর্বে মেসোপটেমিয়া অঞ্চল শাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে যায় এবং পরবর্তীকালে পার্সিয়ান সাম্রাজ্যের স্থলাভিষিক্ত সাসানি সাম্রাজ্যের হাতে আসে। এর ফলে শামের আয়তনে পরিবর্তন ঘটে এবং শাম সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে ভূমধ্যসাগরের তীর

---

৭৬. **মেসোপটেমিয়া :** দজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী সুবিস্তৃত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম। আধুনিক ইরাক, সিরিয়ার উত্তরাংশ, তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চল এবং ইরানের খুজেস্তান প্রদেশ মিলে ছিল তৎকালীন বিলাদুর রাফিদাইন বা মেসোপটেমিয়া (Mesopotamia)। মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশকে বলা হতো জাযিরাতুল ফুরাত (সংক্ষেপে জাযিরা) বা মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি (Upper Mesopotamia)। জাযিরার পরিচিতি সামনে যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে।

৭৭. ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চল মূলত শাম অঞ্চলেরই একটি অংশ। তবে ঐতিহাসিক পটভূমিসহ বিভিন্ন গুরুত্ব বিবেচনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকায় অঞ্চলটি আলাদাভাবেও আলোচিত হয়। অতীতে ফিলিস্তিন শব্দটি শাম অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের জন্য ব্যবহৃত হতো। শামের এ অংশটি এশিয়া মহাদেশের পশ্চিম অংশে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। সাধারণত ফিলিস্তিন বলে পশ্চিমের ভূমধ্যসাগর হতে পূর্বের মৃত সাগর ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী ভূখণ্ডকে বোঝানো হতো।

৭৮. সিরিয়া উক্ত অঞ্চলটিকে নিজেদের অংশ দাবি করে থাকে।

হতে ফুরাত নদীর তীর পর্যন্ত এলাকায়। বর্তমান সউদি আরবের আল-জাওফ প্রদেশের অন্তর্গত দুমাতুল জান্দাল এলাকা ছিল তৎকালীন শামের দক্ষিণ সীমান্ত আর উত্তর সীমান্ত ছিল দক্ষিণ তুরস্কের তোরোস পবর্তমালা (The Taurus Mountains)। প্রাক-ইসলামি যুগ ও ইসলামি যুগে শাম বলে উল্লিখিত অঞ্চলকেই বোঝানো হতো।

ইসলামের আবির্ভাবের শতাধিক বছর পূর্বে গাসসানি সম্প্রদায় ইয়ামেন থেকে শামে এসে বসবাস শুরু করে। শামে আগমনের কিছুদিনের মধ্যেই তারা রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রোমান রাজপরিবার গাসসানিদের সামরিক কুশলতা ও যুদ্ধ-মনোবল প্রত্যক্ষ করে তাদেরকে কিছুটা স্বাধিকার প্রদান করে করদরাজ্যের অধিপতি হিসেবে শামে বসবাসের অনুমতি প্রদান করে। এর ফলে গাসসানিরা রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রভাবশালী রাজবংশে পরিণত হয় এবং বুছরাকে রাজধানী করে শামের দক্ষিণাঞ্চল শাসন করতে থাকে। ইসলামের আবির্ভাবের সময়ও এ অঞ্চলে গাসসানি শাসন চলছিল।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর বিভিন্ন শাসক ও রাজন্যবর্গের কাছে দাওয়াতি পত্রপ্রেরণের ধারাবাহিকতায় নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবি দিহইয়াতুল কালবি রাযি. মারফত তৎকালীন রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস (Heraclius)-এর কাছেও পত্র প্রেরণ করেন। নবীজির পত্র পাঠ ও নবীজির বিস্তারিত বিবরণ জেনে হিরাক্লিয়াস ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হলেও সাম্রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচণ্ড বিরোধিতার কারণে তা গোপন রাখেন।

পত্রপ্রেরণের ধারাবাহিকতায় নবীজি রোমান করদরাজ্য বুছরার গাসসানি প্রশাসক শুরাহবিল বিন আমর গাসসানির কাছে পত্র প্রেরণ করলে সে পত্রবাহক সাহাবি হারিস বিন উমায়র আজদি রাযি.-কে হত্যা করে। এর প্রতিকারবিধানে নবীজি মুসলিম বাহিনীকে উক্ত অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং সেখানে অষ্টম হিজরি সনের জুমাদাল উলা মাসে (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে) মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুতার যুদ্ধের মাধ্যমেই রোমান-মুসলিম সামরিক সংঘাতের সূচনা হয়। পরের বছর মুসলমানরা রোমানদের মোকাবিলায় তাবুকে সৈন্যসমাবেশ ঘটালেও রোমান বাহিনী অগ্রসর না হওয়ায় যুদ্ধের ঘটনা ঘটেনি। ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে নবীজি রোমান সাম্রাজ্যে অভিযান পরিচালনার জন্য উসামা বিন যায়দ

রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রস্তুত করেছিলেন। নবীজির ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাযি. উসামার বাহিনীকে প্রেরণ করেন। উক্ত বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যের শাম অঞ্চলের বালকা এলাকায় সফলতার সঙ্গে অভিযান পরিচালনা করে। এর কিছুদিন পর দ্বাদশ হিজরির রজব মাসে (সেপ্টেম্বর, ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দ) খলিফা আবু বকর রাযি. শাম অঞ্চলে বাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যে ইসলামি বিজয়াভিযানের ধারা শুরু করেন।

বিজয়াভিযানের সূচনা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে—খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. তার ইরাক অভিযানে শেষ যুদ্ধটি করেছিলেন দ্বাদশ হিজরির জিলকদ মাসে। এর অল্প কিছুদিন পূর্বে খলিফা আবু বকর রাযি. রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত শাম অঞ্চলে ইসলামি বিজয়াভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন। নিঃসন্দেহে ইসলামের প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাযি.-এর গৃহীত এই সিদ্ধান্ত ছিল অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে পারসিক-রোমান উভয় পক্ষের অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল প্রচণ্ড প্রভাব-ভীতি। আর প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চার মুসলমানদের যুদ্ধজয়ের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক একটি কার্যকারণ। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ إلخ»

> আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে প্রদান করা হয়নি। এক. আমাকে এমন প্রভাব-ভীতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যা এক মাসের দূরত্বেও প্রতিফলিত হয়। .... [৭৯]

খলিফা আবু বকর রাযি. দ্বাদশ হিজরি সনের রজব মাসে শাম অভিমুখে পৃথক চারটি বাহিনী প্রেরণ করেন।

১. ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী দামেশকের উদ্দেশে প্রেরিত হয়।

---

৭৯. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৩৫।

২. শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী জর্ডানের উদ্দেশে প্রেরিত হয়।

৩. আবু উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী হিমসের উদ্দেশে প্রেরিত হয়।

৪. আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী ফিলিস্তিনের উদ্দেশে প্রেরিত হয়।

৪০—দ্রষ্টব্য—৩৪

সাহাবায়ে কেরামের সৈনিকসুলভ মনোভাব

বিশিষ্ট সাহাবি আমর ইবনুল আস রাযি. এ সময় বনু কুযাআর জনপদে সদকা উসুলের দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। খলিফা আবু বকর রাযি. তাকে শাম-অভিযানে প্রেরণের মনস্থ করে নিম্নোক্ত বার্তা প্রেরণ করেন—

> আল্লাহর রাসুল আপনাকে যে দায়িত্ব (অর্থাৎ সদকা উসুলের দায়িত্ব) প্রদান করতে চেয়েছিলেন এবং আপন ইচ্ছার কথা পুনরাবৃত্তিও করেছিলেন, আমি আপনাকে সে দায়িত্বই প্রদান করেছি। তবে (হে আবু আবদুল্লাহ,) এখন আমি আপনাকে এমন একটি কাজে নিয়োজিত করতে চাচ্ছি, যা আপনার জন্য উভয় জগতে অধিক কল্যাণকর হবে। অবশ্য আপনি এখন যে দায়িত্বে আছেন, তা আপনার কাছে বেশি ভালো মনে হলে সেখানেও থাকতে পারেন।

উত্তরে আমর ইবনুল আস রাযি. লিখে পাঠান—

> আমি ইসলামের একটি তির আর আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ইসলামের তিরসমূহ নিক্ষেপ ও সংগ্রহের দায়িত্বশীল। সুতরাং আপনার দৃষ্টিতে যেখানে তির নিক্ষেপ করা বেশি জরুরি ও বেশি কল্যাণকর এবং পরিস্থিতি যেখানে বেশি নাজুক ও গুরুতর, আপনি 'আমি তির'কে সেখানেই নিক্ষেপ করুন।

শামে প্রাথমিক অভিযান

মুসলিম বাহিনী প্রথমে ফিলিস্তিন অঞ্চলের 'আরাবা' নামক এলাকায় ছয়জন রোমান সেনাপতির নেতৃত্বাধীন তিন হাজার সদস্যবিশিষ্ট একটি বাহিনীর মুখোমুখি হয়। মুসলমানরা তাদেরকে পরাজিত করে এবং একজন সেনাপতিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। পরাজিত রোমান সৈন্যরা দাছিনা নামক স্থানে পুনরায় সমবেত হলে মুসলিম বাহিনী সেখানেও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

পরপর দুটি যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং মুসলিম বাহিনীর দফারফার জন্য ব্যাপক সৈন্যসমাবেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি. খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ও তার বাহিনীর একটি অংশকে ইরাকফ্রন্ট থেকে সরিয়ে শাম অঞ্চলে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! খালিদের মাধ্যমে আমি রোমানদেরকে শয়তানের কুমন্ত্রণা ভুলিয়ে দেবো।'

এটি ত্রয়োদশ হিজরি সনের সফর মাসের (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের) ঘটনা।

খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর নির্দেশ পাওয়ামাত্র খালিদ রাযি. নয় হাজার সৈন্য নিয়ে শাম অভিমুখে রওনা হয়ে যান। দ্রুততম সময়ে শামে পৌঁছার জন্য তিনি সামাওয়া মরুভূমি নামে পরিচিত শামের মরু অঞ্চল পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পথের দুর্গমতা ও পানিস্বল্পতার কারণে খালিদের বাহিনীর পূর্বে কোনো বাহিনী এই পথ পাড়ি দেয়নি। কিন্তু শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও শামে গমনের জন্য খালিদ এই দুর্গম পথটিই বেছে নেন। তিনি চাচ্ছিলেন দ্রুততম সময়ে শত্রুপক্ষের কাছে উপস্থিত হয়ে পেছন থেকে অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা করতে।

সুদীর্ঘ ও সুকঠিন পথ পাড়ি দিয়ে খালিদ শামে পৌঁছান এবং ইতিপূর্বে খলিফা আবু বকর রাযি. কর্তৃক প্রেরিত চারটি বাহিনীর সেনাপতিদের সঙ্গে মিলিত হন। এ সময় খালিদ অনুভব করেন যে, সবগুলো বাহিনীকে এক নেতৃত্বের অধীনে নিয়ে এসে একটি বৃহৎ একক বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন। কিন্তু এই সম্মিলিত বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্ধারণে সম্ভাব্য-সৃষ্ট সমস্যা নিয়ে তিনি আশঙ্কা বোধ করছিলেন। অবশেষে খালিদ এমন

চমৎকার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করেন, যার ফলে পূর্বে প্রেরিত চার বাহিনীর সেনাপতিগণসহ সকলে সন্তুষ্টচিত্তে একজন সর্বাধিনায়ককে মেনে নেয়। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আসুন, আমরা বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব পালাক্রমে গ্রহণ করি। আজ একজনের দায়িত্ব থাকবে, আগামীকাল আরেকজনের, আগামী পরশু তৃতীয়জনের। এভাবে সকলেই এক-একদিন নেতৃত্বদান করবে। আর আজ আমাকেই দায়িত্ব দিন।

সকলে সেদিনের জন্য খালিদকেই সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নেয়। এরপর সকলেই উপলব্ধি করে যে, এই বিরাট বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব অত্যন্ত কঠিন, নাজুক ও গুরুত্বপূর্ণ আর খালিদই এই দায়িত্ব পালনের সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। তখন সকলে খালিদকেই বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে মেনে নেয়।[৮০] খালিদ পুরো বাহিনীকে এক হাজার সৈন্যবিশিষ্ট অনেকগুলো অংশে বিভক্ত করেন এবং প্রতিটি অংশের প্রধান হিসেবে মুসলিম বাহিনীর শ্রেষ্ঠতম বীর-বাহাদুরদের নির্ধারণ করেন। এই নতুন বিন্যাসের ফলে মুসলিম বাহিনীকে তার স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে যথেষ্ট বড় মনে হচ্ছিল।

বুছরা বিজয়

[রবিউল আউয়াল, ত্রয়োদশ হিজরি]
[মে, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

এরপর খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ নিয়ে তৎকালীন শামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী বুছরা অবরোধ করেন। কঠিন অবরোধের একপর্যায়ে বুছরাবাসী নতি স্বীকার করে এবং জিজিয়ার বিনিময়ে সন্ধিচুক্তির প্রস্তাব দেয়। হজরত খালিদ রাযি. তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন।

ত্রয়োদশ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে) বুছরা বিজিত হয়। বুছরা ছিল শাম অঞ্চলে সন্ধির মাধ্যমে বিজিত প্রথম নগরী।

---

৮০. অবশ্য কোনো কোনো বর্ণনামতে স্বয়ং খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-ই খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে শামের মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করেছিলেন। দেখুন—ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৬।

আজনাদাইনের যুদ্ধ

[জুমাদাল উলা, ত্রয়োদশ হিজরি]
[জুলাই, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

বুছরা নগরীর পতনের পর রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস উপলব্ধি করেন যে, অতি শীঘ্র মুসলিম বাহিনীকে শাম থেকে বিতাড়িত করতে না পারলে অচিরেই শাম অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি এবার নতুন করে রোমান বাহিনীকে সংগঠিত করেন এবং সত্তর হাজার সৈন্যের বিশাল এক বাহিনীকে ফিলিস্তিনের আজনাদাইন (Ajnadayn) অঞ্চলে প্রেরণ করেন। আরব উপদ্বীপ ও শামের বিভিন্ন খ্রিষ্টান গোত্রও রোমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়। সব মিলিয়ে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষে।

মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক খালিদ বিন ওয়ালিদ বুছরা জয় করার পর তার নিজস্ব বাহিনী ও আবু উবায়দা রাযি.-এর বাহিনী নিয়ে দামেশকে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন তিন হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী তখন ফিলিস্তিনের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থান করছিল। প্রতিপক্ষের সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে খালিদ রাযি. শামে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সকল ইউনিটকে আমর ইবনুল আস রাযি.-এর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে নির্দেশ প্রেরণ করেন এবং নিজেও আবু উবায়দা রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। শামের সকল মুসলিম ইউনিট একত্রিত হওয়ার পর সর্বাধিনায়ক খালিদ রাযি. নতুন করে মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করেন। তিনি মুআয বিন জাবাল রাযি.-কে মুসলিম বাহিনীর ডানবাহু, সাইদ বিন আমির রাযি.-কে বামবাহু, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে কেন্দ্রীয় অংশের পদাতিক বাহিনী এবং সাইদ বিন যায়দ রাযি.-কে অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন।

ত্রয়োদশ হিজরি সনের ২৭ জুমাদাল উলা (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুলাই) দ্বিপ্রহরের পর উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। জনবল ও অস্ত্রবলের কারণে প্রবঞ্চিত রোমান বাহিনী প্রথমেই মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু মুআয বিন জাবালের নেতৃত্বে মুসলিম সৈন্যরা অবিচলতার সঙ্গে তাদের আক্রমণ ঠেকিয়ে দেয়। এরপর রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীর বামবাহুর ওপর আক্রমণ চালালে তারাও দৃঢ়তার

সঙ্গে রোমানদের প্রতিরোধ করে। এরপরই সেনাপতি খালিদ রাযি. মুসলিম অশ্বারোহী সৈন্যদেরকে প্রতিপক্ষের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেন। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণে মুহূর্তেই খ্রিষ্টান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে।

মুসলিম সৈন্যগণ আজনাদাইনের যুদ্ধে অনন্যসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। হজরত যিরার বিন আযওয়ার রাযি. একাই প্রতিপক্ষের ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্যকে হত্যা করেন। বিশিষ্ট নারী সাহাবি উম্মে হাকিম রাযি. তাঁবুর খুঁটি দিয়ে প্রহার করে কুপোকাত করেন চারজন রোমান সৈন্যকে।

আজনাদাইনের যুদ্ধে কয়েক হাজার রোমান সৈন্য নিহত হয়। মুসলিম বাহিনীর প্রায় সাড়ে চারশ যোদ্ধা শাহাদাত বরণ করেন। বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর সেনাপতি খালিদ খলিফা আবু বকর রাযি.-এর কাছে বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তা পাঠ করার পর খলিফাতুল মুসলিমিন বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি মুসলমানদের বিজয় দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আমাকে চক্ষু-শীতলতা দান করেছেন।'

ইয়ারমুক ও মারজুস সুফফার-এর যুদ্ধ
[জুমাদাল উখরা, ত্রয়োদশ হিজরি]
[আগস্ট, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

আজনাদাইনের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরই খালিদ রাযি. আবু উবায়দা রাযি.-এর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে দামেশক অভিমুখে রওনা হন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের জামাতা টমাস এ সংবাদ জানতে পেরে একদল রোমান সৈন্যকে মুসলিম বাহিনীর প্রতিরোধের উদ্দেশে প্রেরণ করে। পথিমধ্যে[৮১] প্রথমে ইয়ারমুক নদীর নিকটে ইয়ারকুছায় এবং পরে মারজুস সুফফার এলাকায় রোমান বাহিনীর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধ হয় এবং উভয় যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। পরাজিত রোমান বাহিনীর জীবিত সৈন্যরা দামেশক নগরীর অভ্যন্তরে আশ্রয় নেয়; অনেকে চলে যায় হিমসে।

এরপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে দামেশক অবরোধ করে।

---

৮১. অবশ্য কতক ঐতিহাসিকের মতে মুসলিম বাহিনী দামেশকে পৌঁছে দামেশক নগরী অবরোধ করার পর জানতে পারে যে, দামেশকবাসীর সহায়তায় প্রেরিত একটি রোমান বাহিনী দামেশকের কাছে পৌঁছে গেছে। তখন মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ মারজুস সুফফারে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং তাদেরকে পরাজিত করে।

খলিফা আবু বকর রাযি.-এর ইন্তেকালের মাত্র চারদিন পূর্বে ত্রয়োদশ হিজরির ১৮ জুমাদাল উখরা (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ আগস্ট) মারজুস সুফফারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

খলিফাতুল মুসলিমিন আবু বকর রাযি.-এর ইন্তেকাল

এভাবেই আল্লাহর দ্বীনকে পৃথিবীজুড়ে বিজয়ী করার অব্যাহত কর্মপ্রচেষ্টায় অতিবাহিত হতে থাকে আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকাল। দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়, আল্লাহ তাআলা যদি আবু বকর রাযি.-কে মুসলিম উম্মাহর দায়িত্বে নিযুক্ত না করতেন, উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যেত। খিলাফতকাল বলুন, বা খিলাফতপূর্বকাল, আবু বকর রাযি. ছিলেন মুসলিম উম্মাহর জন্য মহান আল্লাহর এক মহা অনুগ্রহ-দান।

এই অত্যুচ্চ কীর্তি ও সমুন্নত মর্যাদা সত্ত্বেও হজরত আবু বকর রাযি. নিজেকে খলিফা-পদের উপযুক্ত মনে করতেন না! ইমাম বুখারি রহ. তার ইতিহাসগ্রন্থে সুফিয়ানের মাধ্যমে উবায়দার সূত্রে বর্ণনা করেন—

একবার উয়াইনা বিন হিস্‌ন রাযি. ও আকরা বিন হাবিস রাযি. হজরত আবু বকর রাযি.-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুলের খলিফা, আমাদের এলাকায় একটি লবণাক্ত জমি আছে, যাতে না ঘাস জন্মায়, না তা অন্য কোনো কাজে আসে। আপনি যদি ভালো মনে করেন, তাহলে জমিটি আমাদেরকে জায়গির হিসেবে দান করুন। আমরা তাতে চাষাবাদের চেষ্টা করব।' হজরত আবু বকর তাদেরকে উক্ত জমি জায়গির হিসেবে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন এবং এ ব্যাপারে লিখিত দলিল প্রস্তুত করে তাতে হজরত উমরকে সাক্ষী রাখার মনস্থ করলেন। হজরত উমর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আবু বকর রাযি. সাহাবিদ্বয়কে বললেন, 'তোমরা উমরের কাছে গিয়ে তাকে এর সাক্ষী বানিয়ে নাও।'

তারা উভয়ে উমরের সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দলিলপত্র নিয়ে তার কাছে গেলেন। বিস্তারিত শোনার পর হজরত উমর তাদের নিকট হতে দলিলপত্র কেড়ে নিলেন এবং থুথু দিয়ে লেখা মুছে ফেললেন। এতে তারা দুজন রাগান্বিত হয়ে হজরত উমরকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। হজরত উমর বললেন, 'নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের মনোরঞ্জন করতেন; কারণ, তখন ইসলাম দুর্বল ছিল। এখন তো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী ও মর্যাদাশীল করেছেন। তোমরা চলে যাও আর যা

ইচ্ছা করো। তোমরা আল্লাহর নিকট হেফাজত চাইলেও আল্লাহ যেন তোমাদের হেফাজত না করেন।'

এরপর তারা উভয়ে অত্যন্ত রাগান্বিত অবস্থায় হজরত আবু বকরের কাছে ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমরা বুঝতে পারছি না যে, খলিফা কি আপনি, না উমর?' আবু বকর রাযি. বললেন, 'খলিফা তো তিনিই। তিনি যদি চাইতেন, খলিফা হতে পারতেন।'

ইত্যবসরে হজরত উমরও রাগান্বিত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি হজরত আবু বকরকে বললেন, 'আমাকে বলুন, আপনি এদেরকে যে জমি জায়গির হিসেবে প্রদান করতে চাচ্ছেন, তা কি আপনার মালিকানাধীন, না সমস্ত মুসলমানের?' হজরত আবু বকর উত্তর দিলেন, 'না, সমস্ত মুসলমানের।'

হজরত উমর বললেন, 'তাহলে সমস্ত মুসলমানকে বাদ দিয়ে কেবল এ দুজনকে কীভাবে দিচ্ছেন?' হজরত আবু বকর উত্তর দিলেন, 'আমি উপস্থিত লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। তারা সকলে আমাকে এরূপ করার পরামর্শ দিয়েছে।' হজরত উমর বললেন, 'আপনি উপস্থিত লোকদের সঙ্গে তো পরামর্শ করেছেন; কিন্তু সকল মুসলমানের সঙ্গে পরামর্শ করে তাদের সম্মতি কি নিয়েছেন?' হজরত আবু বকর বললেন, 'আমি তো পূর্বেই বলেছিলাম যে, এই খিলাফতের দায়িত্বের জন্য আপনিই আমার চেয়ে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু আপনি আমার ওপর জয়ী হয়েছেন।'

উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি. নিজেকে এমনই মনে করতেন। সর্বোচ্চ পদ বা সুমহান কর্ম-কীর্তি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত কখনোই আত্মপ্রবঞ্চিত করতে পারেনি।

বর্ণিত আছে, হজরত আবু বকর রাযি. যখন অন্তিম শয্যায় শায়িত এবং তার শ্বাস ঘন ঘন ওঠানামা করছে, তখন আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি. তার কাছে উপস্থিত হলেন। পিতার কষ্ট দেখে আয়েশা রাযি. এই কাব্যপঙ্‌ক্তিটি আবৃত্তি করলেন—

لَعَمْرُكَ مَا يُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الْفَتٰى ❋ إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

আপনার প্রাণের শপথ! সম্পদপ্রাচুর্য তখন যুবকেরও কোনো কাজে আসবে না, যখন মৃত্যু-শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হবে এবং বুকে শ্বাস আটকে যাবে।

আয়েশার মুখে কাব্যপঙ্‌ক্তিটি শুনে হজরত আবু বকর রাগান্বিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, উম্মুল মুমিনিন! এমন নয়; বরং এ তো সেই অবস্থা, যার বিবরণ পবিত্র কুরআনে এভাবে এসেছে—

﴿وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ﴾

মৃত্যুযন্ত্রণা সত্যিই আসবে, (হে মানুষ!) এটাই সে জিনিস, যা থেকে তুমি পালাতে চাইতে। [সুরা ক্বফ : ১৯]

এরপর আবু বকর রাযি. বললেন, 'আমি তোমাকে একটি বাগান প্রদান করেছিলাম; কিন্তু আমার অন্তরে এ বিষয়ে দ্বিধা রয়ে গেছে। সুতরাং তুমি তা আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ফেরত দিয়ে দাও।' আয়েশা রাযি. উত্তর দিলেন, 'ঠিক আছে, ফেরত দিয়ে দিলাম।'

এরপর আবু বকর রাযি. বললেন, 'আমি মুসলমানদের খলিফা হওয়ার পর থেকে জনগণের সম্পদ হতে কোনো দিনার-দিরহাম ভোগ করিনি। তবে তাদের সাধারণ খানা অবশ্য খেয়েছি এবং তাদের মোটা ও খসখসে কাপড় পরিধান করেছি। বর্তমানে আমার কাছে মুসলমানদের সম্পদ হতে এই হাবশি ক্রীতদাস, পানিবহনকারী এই উট এবং এই পুরোনো পশমি চাদরটি ব্যতীত অন্য কিছুই নেই। আমার মৃত্যুর পর এই তিনটি জিনিস হজরত উমরের কাছে পাঠিয়ে দেবে এবং এগুলোর দায়িত্ব থেকে আমাকে মুক্ত করে দেবে।'

আম্মাজান আয়েশা রাযি. বলেন, আমি অসিয়ত মোতাবেক জিনিসগুলো উমর রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাহক যখন এগুলো নিয়ে হজরত উমরের কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় বলছিলেন, 'আল্লাহ তাআলা আবু বকরের ওপর রহম করুন, তিনি তো পরবর্তীদেরকে মুশকিলে ফেলে দিয়ে গেলেন।' এরপর উমর তার ভৃত্যকে জিনিসগুলো রেখে দিতে বললেন।

হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! একজন হাবশি গোলাম, পানি বহনকারী একটি উষ্ট্রী আর পুরোনো একটি চাদর, যার মূল্য মাত্র পাঁচ দিরহাম হবে, এই কয়েকটি জিনিসমাত্র, আর তা-ও আপনি আবু বকরের পরিবার-পরিজন হতে ছিনিয়ে নিচ্ছেন?!'

হজরত উমর বললেন, 'তাহলে তুমি কী করতে বলো?'

আবদুর রহমান বললেন, 'এগুলো আপনি তার পরিবারকে ফিরিয়ে দিন।' হজরত উমর বললেন, 'না, আল্লাহর শপথ! আমার খিলাফতকালে এরূপ কক্ষনো হবে না। আবু বকর মৃত্যুর সময় নিজেকে এসব জিনিস হতে মুক্ত করে গেছেন, আর আমি তা তার পরিবারকে ফেরত দেবো?! এ কাজ অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়তর।'

উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ ও ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাযি. ত্রয়োদশ হিজরির ২২ জুমাদাল উখরা (৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ আগস্ট) তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার খিলাফতকাল ছিল দু-বছর তিন মাস দশ দিন।

* * *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফত

[জুমাদাল উখরা ১৩ হিজরি—যিলহজ ২৩ হিজরি]
[আগস্ট ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ—নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ]

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর বংশপরিচয়

হজরত উমর রাযি. হস্তিবাহিনীর ঘটনার তেরো বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু হাফস, উপাধি 'আল-ফারুক'। পিতার দিক থেকে তার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ—

> উমর ইবনুল খাত্তাব বিন নুফায়ল বিন আবদুল উযযা বিন রিয়াহ বিন কুরত্ব বিন রাযাহ বিন আদি বিন কাব ...।

কাব হতে তার বংশপরম্পরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রাযি.-এর বংশপরম্পরার সঙ্গে মিলে গেছে।

হজরত উমর রাযি. নবুওয়তের ষষ্ঠ বছর ইসলামগ্রহণ করেন। তিনি কুরাইশ গোত্রের সম্ভ্রান্ত যুবক ছিলেন। জাহিলি যুগে কুরাইশ গোত্র বিভিন্ন বিরোধ মীমাংসায় তাকে দূত হিসেবে প্রেরণ করত।

কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য

হজরত উমর রাযি. ইসলামগ্রহণ করার পরই মক্কায় মুসলমানগণ প্রকাশ্যে ইবাদত করার সুযোগ লাভ করে। তিনি আশারায়ে মুবাশশারার অন্যতম সদস্য এবং বিশিষ্ট ফকিহ ও জাহিদ (দুনিয়াবিরাগী) সাহাবি। হজরত

উমর রাযি.-এর সূত্রে নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাঁচশ উনচল্লিশটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমর রাযি. সম্পর্কে ইরশাদ করেন—

«إِنَّ اللهَ جَعَلَ الحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِه»

আল্লাহ তাআলা উমরের জবান ও হৃদয়ে হক প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন।[৮২]

নবীজি আরও ইরশাদ করেন—

«لَوْكَانَ نَبِيٌّ بَعْدِيْ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ»

আমার পরে যদি কেউ নবী হতো, তাহলে সে হতো উমর ইবনুল খাত্তাব।[৮৩]

হজরত উমর রাযি.-কে খলিফা নির্বাচন

অন্তিম শয্যায় শায়িত অবস্থায় হজরত আবু বকর রাযি. অনুভব করেন যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। তার অবর্তমানে যেন খিলাফতের দায়িত্ব নিয়ে উম্মাহর মধ্যে কোনো ধরনের মতবিরোধ সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বেই পরবর্তী খলিফা নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। খলিফার দৃষ্টিতে উমর রাযি.-ই ছিলেন পরবর্তী খলিফা হওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত। কিন্তু তিনি প্রথমেই এই মনোনয়নের কথা প্রকাশ না করে এ বিষয়ে আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি., উসমান বিন আফফান রাযি., সাইদ বিন যায়দ রাযি., উসায়দ বিন হুযায়র রাযি. প্রমুখ দায়িত্বশীল ও নেতৃস্থানীয় মুহাজির-আনসার সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। হজরত আবু বকর রাযি.-এর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর সকলে এই মনোনয়নের পক্ষে একমত হয়। কোনো কোনো সাহাবি হজরত উমর রাযি.-এর স্বভাব-কঠোরতার কারণে প্রথমে দ্বিধা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত আবু বকর রাযি. সকলকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হন।

---

৮২. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬৮২, *সুনানে আবু দাউদ*, হাদিস নং ২৯৬১।

৮৩. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৬৮৬।

হজরত আবু বকর রাযি. যখন নিশ্চিন্ত হন যে, নেতৃস্থানীয় ও দায়িত্বশীল সাহাবায়ে কেরাম সকলে হজরত উমর রাযি.-এর পরবর্তী খলিফা হওয়ার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তখন তিনি তার কাছে উপবিষ্ট পরিবারস্থ লোকদেরকে নির্দেশ দেন—তাকে যেন উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকজন তখন মসজিদে সমবেত হয়েছিল। মসজিদসংলগ্ন কামরা থেকে উপস্থিত মুসলমানদের প্রতি তাকিয়ে আবু বকর রাযি. বলেন, উপস্থিত লোকসকল! আমি যাকে তোমাদের পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করব, তোমরা কি তাকে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেবে? আল্লাহর শপথ! আমি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চিন্তাভাবনা ও কল্যাণ-কামনায় কোনো প্রকার ত্রুটি করিনি এবং আমার কোনো নিকটজনকেও খলিফা নির্ধারণ করিনি। আমি খলিফা নির্ধারণ করেছি উমর ইবনুল খাত্তাবকে। সুতরাং তোমরা তার কথা শুনবে ও মানবে।

উপস্থিত সকলে উত্তর দেন, আমরা উমরের আনুগত্য স্বীকার করে নিলাম।

এরপর আবু বকর রাযি. আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, হে আল্লাহ, মুসলিম উম্মাহর কল্যাণদাবিতেই আমি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার আশঙ্কা ছিল— মুসলমানগণ আমার অবর্তমানে ফিতনায় পড়ে যাবে, তাই আমি এমন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি, যা সম্পর্কে আপনিই সর্বাধিক জ্ঞাত। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি; তারপর তাদের মাঝে সর্বোত্তম, সবচেয়ে শক্তিশালী ও উম্মাহর জন্য সর্বাধিক কল্যাণকামী ব্যক্তিকে উম্মাহর দায়িত্ব প্রদান করেছি।

হজরত আবু বকর রাযি.-কে ইন্তেকালের পরদিন নবীজির পাশে সমাধিস্থ করা হয়। এরপর লোকজন দলে দলে মসজিদে নববিতে উপস্থিত হয়ে হজরত উমর রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করে। সেদিন ছিল ত্রয়োদশ হিজরি সনের ২৩ জুমাদাল উখরা। এভাবেই উম্মাহর সর্বসম্মতিতে হজরত উমর রাযি.-এর দায়িত্ব গ্রহণ সমাপ্ত হয়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা নির্ধারিত হন সেই মহান ব্যক্তি, ইমাম বুখারির বর্ণনা অনুসারে নবীজি যার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন,

«لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، فَإِنَّه

> তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে অনেক মুহাদ্দাস ব্যক্তি ছিলেন। আমার উম্মতের মধ্যে কেউ যদি মুহাদ্দাস হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তি উমর।[৮৪]

মুহাদ্দাস অর্থ ইলহামপ্রাপ্ত ব্যক্তি।[৮৫] ইমাম তাবারানি বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে আছে, নবীজিকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল—মুহাদ্দাস ব্যক্তি কীরূপ? নবীজি উত্তরে বলেন, এমন ব্যক্তি, যার জবানে ফিরেশতা কথা বলে।[৮৬]

এ কারণেই আমরা দেখতে পাই—বিভিন্ন বিষয়ে হজরত উমর রাযি.-এর মতের সমর্থনেই কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালের আলোচনায় ফিরে আসছি। উমর রাযি. মূলত তার পূর্বসূরি আবু বকর রাযি.-এর কর্মধারাকেই অব্যাহত রাখেন এবং যে বিজয়াভিযানের ধারা শুরু হয়েছে, তাকে আরও গতিময় ও বেগবান করে তোলেন।

* * *

---

৮৪. *বুখারি শরিফ*, হাদিস নং ২৩৯৮।

৮৫. যার অন্তর ও মুখে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও তাওফিকে সঠিক কথা ইলহাম হয়, তাকে 'মুহাদ্দাস' বলা হয়।

৮৬. তাবারানি, *আল-মুজামুল আওসাত*, হাদিস নং ৬৭২৬।

[এক] রোমান সাম্রাজ্যে চলমান বিজয়াভিযান

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব হতে অব্যাহতিদান

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর খলিফা উমর রাযি. প্রথমেই যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা হলো—শাম অঞ্চলে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্ব হতে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে অপসারণ এবং আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-কে শামের বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক নির্ধারণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এ সময় খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে শামের মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ (আবু উবায়দা রাযি.-ও তার বাহিনী নিয়ে খালিদের অধীনে ছিলেন) দামেশক নগরী অবরোধ করে রেখেছিল।[৮৭]

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এতগুলো মহান বিজয় খালিদ বিন ওয়ালিদের হাতে অর্জিত হওয়া সত্ত্বেও কেন তাকে বরখাস্ত করা হয়?

বাস্তব কথা হলো—এ বিষয়টি নিয়ে যারাই নানারকম আলোচনা-সমালোচনা করে থাকে, তারা প্রকৃতপক্ষে বিষয়টিকে মহান সাহাবায়ে কেরামের শান ও মর্যাদা বিবেচনায় রেখে বিশ্লেষণ করে না; বরং যে বস্তুবাদী সমাজে তারা বসবাস করে, সেই বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে থাকে।

---

৮৭. শাম অঞ্চলে বিভিন্ন নগরী জয়ের ধারাবাহিকতা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। কারও কারও মতে আজনাদাইন ও দামেশকের অভিযান ইয়ারমুক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়। বিপরীতে অন্য অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ দামেশক বিজয়ের পরে সম্পন্ন হয়। এই গ্রন্থে আমরা দ্বিতীয় মতটি অগ্রগণ্য বিবেচনা অবলম্বন করেছি। মিশরীয় ঐতিহাসিক প্রফেসর আহমাদ আদিল কামাল এ বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, আজনাদাইনের যুদ্ধের পর চতুর্দশ হিজরিতে দামেশক বিজিত হয়, আর ইয়ারমুকের যুদ্ধ পঞ্চদশ হিজরি সনে সংঘটিত হয়। যেহেতু খলিফা হওয়ার পর উমর রাযি.-এর প্রথম সিদ্ধান্তই ছিল খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে শাম অঞ্চলের বাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ হতে অপসারণ, তাই অগ্রগণ্য মত এটিই যে, আজনাদাইন বিজয়ের পর দামেশক অবরোধকালেই এই সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। দেখুন—https://bit.ly/2XHYwy5।

হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদের অব্যাহতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে প্রফেসর আক্কাদ[৮৮] লিখেছেন,

> (খলিফা উমর রাযি. কর্তৃক খালিদ রাযি.-কে অব্যাহতিদান সম্পর্কে) একদল লোকের ধারণা, এটি মূলত দুই সমকক্ষ ও সমশক্তির ব্যক্তির পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিণতি। আরেক দলের মত—তাকে বিনা কারণে বরখাস্ত করা হয়েছে। তৃতীয় একদল লোকের ধারণা, দুজনের মধ্যকার পুরোনো শত্রুতা ও সংঘাতের প্রতিক্রিয়া এটি। আর নয়তো নতুন করে এমন কোনো ত্রুটি খালিদ করেননি, যার কারণে তাকে বরখাস্ত করে মুসলিম উম্মাহকে তার শক্তি ও যুদ্ধদক্ষতা হতে বঞ্চিত করা যেতে পারে।
>
> এ সম্পর্কে আমাদের কথা হলো, কেউ এ বিষয়ে বিরূপ ধারণা করতে চাইলে তার জন্য আশা করি এ তথ্যটিই যথেষ্ট হবে যে, খলিফা উমর রাযি. বরখাস্ত করার মতো উপযুক্ত কোনো ত্রুটি ছাড়াই খালিদকে বরখাস্ত করেছিলেন। স্বয়ং খলিফা উমর রাযি. তাকে বরখাস্ত করার পর প্রাথমিক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি শেষ হতেই সুস্পষ্টভাষায় জানিয়ে দেন যে, খালিদ আপন দায়িত্বে কোনো প্রকার অবহেলা করেননি; বরং তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। সুতরাং তার প্রতি কোনো প্রকার অপবাদ আরোপ করার বা সমালোচনা করার সুযোগ মোটেও নেই। খলিফা হজরত খালিদ রাযি.-কে খেয়ানত-অভিযোগ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ঘোষণা করে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্তা প্রেরণ করেন এবং সকলকে জানিয়ে দেন—তিনি খালিদকে কোনো ক্রোধ-অসন্তোষ বা দায়িত্বে অবহেলার কারণে অব্যাহতিদান করেননি। বরং তাকে

---

৮৮. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ প্রখ্যাত মিশরীয় সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও সাংবাদিক। জন্ম ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের জানুয়ারিতে মিশরের আসওয়ান প্রদেশে। তিনি মিশরের কায়রোর সুবিখ্যাত ভাষা গবেষণা ইনস্টিটিউট 'মুজাম্মাউল লুগালিত আরাবিয়া' (The Academy of the Arabic Language in Cairo) ও মিশরের বিধানসভা (The House of Representatives)-এর সদস্য ছিলেন। সমকালীন বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার সাহিত্য-বিতর্ক আরবি সাহিত্যকে বহুগুণে সমৃদ্ধ করেছিল। শতাধিক গ্রন্থরচয়িতা আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ মার্চ কায়রোতে ইন্তেকাল করেন।

> অব্যাহতিদানের কারণ হলো, মানুষ তার বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। খলিফা আরও লেখেন, আমি আশঙ্কা করেছি যে, মানুষ তার প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়বে এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। তাই আমি চেয়েছি—সকলে মনে-প্রাণে এ কথা বিশ্বাস করুক যে, আল্লাহই সবকিছুর কর্তা। আমি চেয়েছি, মানুষ যেন ফিতনার শিকার না হয়।
>
> শুধু তাই নয়, স্বয়ং খালিদ যখন খলিফার কাছে তাকে অব্যাহতিদানের কারণ জিজ্ঞেস করেন, তখন তিনি তাকে বলেন, 'মানুষ তোমার বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তাই আমি আশঙ্কা করেছি যে, তুমি মানুষের ফিতনার কারণ হয়ে যাবে।'[৮৯]

প্রফেসর আক্কাদের মন্তব্য শেষ হলো। আমাদের কথা হলো—প্রকৃতপক্ষে বিষয়টি এর চেয়েও সরল ও সাদামাটা। আমরা ঘটনার প্রাথমিক অবস্থায় কোনো ধরনের 'অস্বস্তিকর পরিস্থিতি' তৈরি হওয়ার কথাও শুনিনি। খালিদের সেনাবাহিনীর কেউ বিদ্রোহ করেনি, স্বয়ং খালিদ রাযি.-ও কোনো ধরনের বিরোধিতা করেননি। কেননা, খালিদ খলিফাতুল মুসলিমিন হজরত উমর রাযি.-এর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল ছিলেন। এটি প্রথম লক্ষণীয় বিষয়।

অধিকন্তু হজরত উমর ছিলেন সমকালীন মুসলিম উম্মাহর প্রধান দায়িত্বশীল। গুনাহ নয়-এমন যেকোনো নির্দেশ প্রদানের অধিকার তার ছিল এবং তার নির্দেশ সকলে মানতে বাধ্যও ছিল। এটি দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয়।

তা ছাড়া উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম কাফেলার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র হজরত খালিদ রাযি. দ্বীনের এই সুমহান অঙ্গনে কাজ করতেন পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। পদ ও পদমর্যাদা, নেতৃত্ব ও ক্ষমতালাভের জাগতিক চিন্তাধারা হতে 'তিনি' ও 'তারা' ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। খালিদ রাযি.-সহ প্রত্যেক সাহাবির মনোভাব তো এই ছিল যে, আমাকে বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশে নিযুক্ত করা হোক বা পেছনের অংশে, দ্বিধাহীন চিত্তে প্রস্তুত আছি। সুতরাং আজ তাকে সেনাপতির দায়িত্ব প্রদানের পর কাল

---

৮৯. আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদ, *আবক্বারিয়্যাতু উমার*, পৃষ্ঠা : ১৬৪-১৬৫।

যদি তাকে সাধারণ সৈন্য গণ্য করা হয়, কী আসে যায়! প্রকৃতপক্ষে এটিই হলো ইখলাস ও নিষ্ঠা এবং জুহদ ও দুনিয়াবিরাগের নিদর্শন। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই যে, সুমহান সাহাবি খালিদ রাযি.-এর হৃদয়জগৎ এসব গুণ ও চিন্তাকেই ধারণ করত। তাই তো নিজের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে কথোপকথনের একপর্যায়ে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় বিষয়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'যে রাতে আমার কাছে কোনো প্রিয়তমা নববধূর আগমন ঘটবে, কিংবা আমাকে প্রদান করা হবে পিতৃত্বের সুসংবাদ, তা আমার কাছে ওই হিমশীতল বিপৎসংকুল রাত হতে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি অবস্থান করি মুহাজির যোদ্ধাদের কোনো বাহিনীর সঙ্গে; প্রত্যুষে শত্রুর মোকাবিলার প্রস্তুতিতে। সুতরাং তোমরা জিহাদের সংগ্রামী জীবনকেই আঁকড়ে ধরো।[৯০]

কথিত মতবিরোধের এই বিষয়টি তাদের দৃষ্টিতে কত সাধারণ ও তুচ্ছ ছিল, তা বুঝতে আবদুল মালিক বিন উমায়র-এর সূত্রে ইমাম আহমাদ রহ.-এর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি পাঠ করুন।

> খলিফা উমর আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহকে শামের বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন এবং খালিদকে অব্যাহতি দিলেন। সংবাদ পেয়ে খালিদ সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এই উম্মাহর বিশ্বস্ততম ব্যক্তিকে তোমাদের উদ্দেশে প্রেরণ করা হয়েছে। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি। তখন আবু উবায়দা রাযি. বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—খালিদ হলো আল্লাহর একটি তরবারি এবং অতি উত্তম আত্মীয়-যুবক।[৯১]

ঐতিহাসিক ইবনে আসাকির রহ. বর্ণনা করেন—

> হজরত আবু উবায়দা রাযি. আপন দায়িত্বলাভ ও খালিদ রাযি.-এর অব্যাহতি সংক্রান্ত পত্রটি হাতে পৌঁছার প্রায় বিশ দিন পর

---

৯০. খালিদ রাযি.-এর আরেকটি ঐতিহাসিক উক্তি হলো—ওই রাতের আমলের চেয়ে কোনো আমল আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়, যে রাতে আমি যুদ্ধের ঢাল সংগ্রহে ব্যস্ত থাকি এবং শত্রুদের ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করি। আর সকাল পর্যন্ত আকাশ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে আমাকে স্বাগত জানাতে থাকে।

৯১. আহমাদ বিন হাম্বল, *ফাজায়িলুস সাহাবা*, বর্ণনা নং ১২৭৮-১২৭৯।

খালিদকে প্রদান করেন। খালিদ পত্র পাঠ করার পর (এত দিন দেরি করে তাকে পত্রটি দেওয়ায়) অবাক হন এবং আবু উবায়দার নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বলেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনার কাছে আমিরুল মুমিনিনের পত্র এসেছে অথচ আপনি আমাকে অবগত করেননি! দায়িত্ব ও নেতৃত্ব আপনার হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমার পেছনেই নামাজ আদায় করে গেছেন! উত্তরে আবু উবায়দা বলেন, আল্লাহ আপনাকেও ক্ষমা করুন। যতক্ষণ না আপনি বিষয়টি অন্যের কাছ থেকে অবহিত হয়েছেন, ততক্ষণ তো আমি আপনাকে তা জানাতেই চাইনি। আমি চাইনি বিজয়াভিযানের এই অগ্রযাত্রা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই আপনার যুদ্ধগতি ব্যাহত হোক। আমার ইচ্ছা ছিল, আল্লাহ চাহে তো বিজয়াভিযান সমাপ্ত হলে আপনাকে বিষয়টি অবহিত করব। আর পার্থিব ক্ষমতা ও পদ, খ্যাতি ও সুখ্যাতি তো আমি চাই না, পার্থিব প্রাপ্তির আশায় কোনো আমলও করি না। এই দৃশ্যমান পৃথিবী তো শীঘ্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা পরস্পর ভাই-ভাই, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে দায়িত্বশীল। ভাই পাশে থাকলে কোনো ব্যক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং দুজনের মধ্যে দায়িত্বশীল যিনি, তিনি জানেন যে, উভয়ের মধ্যে তিনিই হচ্ছেন ফিতনার অধিক নিকটবর্তী এবং ভুলের শিকার হওয়ার অধিক সম্ভাব্য ব্যক্তি। অবশ্য আল্লাহ যাকে ভুল হতে রক্ষা করেন, তার কথা ভিন্ন। আর এমন খুব কম ব্যক্তিই হয়ে থাকেন।[৯২]

আল্লাহু আকবার! অভিবাদন আপনায় হে খালিদ!
আল্লাহু আকবার! অভিবাদন আপনায় হে আবু উবায়দা!

সমালোচনার তো প্রশ্নই আসে না, প্রকৃত পরিস্থিতি ও বাস্তবতা কারও সামনে থাকলে শ্রদ্ধায় ও ভালোবাসায় হৃদয় সিক্ত হবে আর চক্ষু হবে অশ্রুসজল। এরাই তো উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম পুরুষ! এরাই তো আমাদের গৌরব! আমরা তো তাদেরই উত্তরসূরি!

---

[৯২]. আবুল কাসিম ইবনে আসাকির, *তারিখু দিমাশক*, ২/১২৬।

আজ আল্লাহর দুশমন ও ইসলামের শত্রুরা চাচ্ছে তাদের প্রতি আমাদের বিশ্বাস ও আস্থার জায়গাটি নড়বড়ে করে দিতে। আফসোস ও পরিতাপের বিষয়, ইসলামি পরিচয়ধারী কিছু লেখকও এ ক্ষেত্রে তাদের সহযোগীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এসব লেখকের ইলমের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই। আর তাই তাদের রচিত ইতিহাসে উম্মাহর এমন কিছু পাওয়ার নেই, যার অনুসরণ তারা করতে পারে, যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে।

মোটকথা, আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে অব্যাহতিদানের পেছনে উমর রাযি.-কে যে বিষয়টি উদ্বুদ্ধ করেছিল তা হচ্ছে—খলিফা আশঙ্কা করছিলেন যে, ঈমানের দৃঢ়তা সত্ত্বেও উম্মাহ ফিতনার শিকার হতে পারে। এক মুহূর্তের জন্য হলেও তারা ধারণা করতে পারে যে, মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বে যদি খালিদ না থাকতেন, তাহলে এই ধারাবাহিক বিজয় অর্জিত হতো না। অথচ এ ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলামি আকিদার সম্পূর্ণ বিরোধী। স্বভাবগতভাবেই খলিফা উমর রাযি. ঈমান-সংহারক কোনো বিষয়ে সামান্য ছাড় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর তাই একেবারেই সরল ও সাদামাটাভাবে কোনো প্রকার সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা ছাড়া তিনি খালিদকে অব্যাহতি দান করেন। খালিদের অব্যাহতির পরও অব্যাহত থাকে মুসলমানদের বিজয় ও বিজয়াভিযান। স্বয়ং খালিদ মুসলিম বাহিনীর একটি অংশের অধিনায়ক হিসেবে সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দার নেতৃত্বে আপন দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকেন। তিনি এ কারণে না কোনো নৈরাশ্যের শিকার হন, না বীরত্ব ও আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন। বরং পরবর্তী প্রতিটি অভিযানে তিনি যে অনুপম বীরত্ব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন, তার বিবরণ সামনে আসছে।

ফিহল (বায়সান)-এর অভিযান

[জিলকদ, ত্রয়োদশ হিজরি]
[জানুয়ারি, ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ]

দামেশক অবরোধ চলাকালেই মুসলিম বাহিনীর নতুন সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাযি.-এর কাছে সংবাদ আসে যে, রোমানরা নতুন করে বিরাট সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে এবং তারা ফিলিস্তিনের দিকে

অগ্রসর হচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ তখন 'আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বে শামের দক্ষিণ অংশে অবস্থান করছিল। সেনাপতি আবু উবায়দা তখন দ্বিধায় পড়ে যান যে, দামেশকে অবরোধ অব্যাহত রেখে শামের কেন্দ্রস্থলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন, নাকি ফিহলে গিয়ে সংগঠিত হতে থাকা রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করবেন। তিনি বিস্তারিত পরিস্থিতি উল্লেখ করে আমিরুল মুমিনিন উমর রাযি.-এর কাছে পত্র প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে খলিফা যে পত্র প্রেরণ করেন, তার ভাষ্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো। পত্রটি ইসলামি সাম্রাজ্য হতে বহু দূরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর গতিবিধির প্রতি খলিফাতুল মুসলিমিনের সার্বক্ষণিক সতর্ক অনুসরণের একটি সুস্পষ্ট দলিল। খলিফা লেখেন—

> প্রথমে দামেশকে অভিযান পরিচালনা করো। দামেশক হলো শামের দুর্গ ও মূল নগরী। সুতরাং দামেশক জয়ের চেষ্টা চালাও। আর ফিহলের বাহিনী যেন তোমাদের অগ্রযাত্রায় কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে, তাই ফিহল অভিমুখে একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণ করো। দামেশক বিজয়ের পূর্বেই যদি আল্লাহ তাআলা সেই অশ্বারোহী বাহিনীর হাতে ফিহলের বিজয় দান করেন, তাহলে তো আমাদের প্রত্যাশাই পূর্ণ হবে; আর ফিহল বিজয়ের পূর্বে যদি দামেশক বিজিত হয়, তাহলে দামেশকে অন্য কাউকে তোমার প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তুমি সৈন্যদের নিয়ে ফিহল অভিমুখে যাত্রা করবে। এরপর আল্লাহ তাআলা যদি ফিহলের বিজয় দান করেন, তাহলে তুমি ও খালিদ হিমস অভিমুখে রওনা হয়ে যাবে আর জর্ডান ও ফিলিস্তিনের দায়িত্ব আমর ইবনুল আস ও শুরাহবিলকে দিয়ে যাবে।

নিঃসন্দেহে এটি এমন একটি পত্র, যা যুদ্ধক্ষেত্র সুবিশাল-সুবিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও খলিফাতুল মুসলিমিন ও তার পরামর্শ-পর্ষদের সূক্ষ্ম-সজাগ দৃষ্টিতে ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যুদ্ধপরিকল্পনা প্রণয়ন ও সুগভীর পর্যবেক্ষণের সুস্পষ্ট দলিল।

খলিফার নির্দেশনা মোতাবেক মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ দামেশকে অবরোধ অব্যাহত রাখে, অপর একটি অংশ সংগঠিত হতে থাকা রোমানদের পর্যুদস্ত করার জন্য ফিহলে অভিযান পরিচালনা করে। ফিহলে

সফল অভিযান শেষে তারা পুনরায় দামেশকে মূল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হয়।

ফিহলের অভিযানে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-সহ মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ অনন্যসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেয়। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর নেতৃত্বে দামেশক থেকে রওনা হওয়া দেড় হাজার সৈন্যবিশিষ্ট মুসলিম বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ ঝড়ের বেগে দক্ষিণে অগ্রসর হয় এবং পথিমধ্যেই বিশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট খ্রিষ্টান বাহিনীর একটি অংশের নাগাল পেয়ে যায়। রোমান বাহিনীর এই অংশটি ছিল মূল বাহিনীর পেছনের অংশ। তারা বালাবাক্কু থেকে বায়সানে (Beit She'an) রোমান শিবিরে পৌঁছার জন্য রওনা হয়েছিল। খালিদের বাহিনী তাদেরকে চরমভাবে পর্যুদস্ত করে এবং বহু সৈন্যকে হত্যা করার পাশাপাশি প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করে। রোমান বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যরা কোনোমতে পালিয়ে তাদের শিবিরে পৌঁছায়। এরপর খালিদ তার বাহিনী নিয়ে ফিহলে আমর ইবনুল আস রাযি.-এর বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হন।

কিছুদিনের মধ্যেই আবু উবায়দা রাযি.-এর নেতৃত্বে দামেশক থেকে রওনা হওয়া অন্যান্য সৈন্যও ফিহলে পৌঁছে তাদের সঙ্গে মিলিত হয়। সব মিলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় পঁচিশ হাজারে। এরপর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি. পুরো বাহিনীকে নতুন করে বিন্যস্ত করেন।[৯৩]

---

৯৩. শাম অভিযানসংশ্লিষ্ট একটি পশ্চিমা স্বীকৃতি দেখুন। প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ স্যার টমাস আরনল্ড তার *The preaching of Islam : a history of the propagation of the Muslim faith* গ্রন্থে লিখেছেন, মুসলিম বাহিনী যখন জর্ডান উপত্যকায় পৌঁছায় এবং আবু উবায়দা ফিহলে শিবির স্থাপন করেন, তখন সেখানকার খ্রিষ্টান অধিবাসীরা মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরিত পত্রে উল্লেখ করে, হে মুসলিম সম্প্রদায়, যদিও রোমানরা আমাদের স্বধর্মীয়; কিন্তু আমাদের কাছে রোমানদের তুলনায় তোমরাই অধিক প্রিয়। তোমরাই আমাদের সঙ্গে অধিক প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, অধিক কোমল আচরণকারী, নিপীড়ন হতে রক্ষাকারী এবং আমাদের প্রতি উত্তম দায়িত্ব পালনকারী। কিন্তু তারা জোরপূর্বক আমাদের এলাকা দখল করে রেখেছে।

অপরদিকে হিমসের অধিবাসীরা রোমান বাহিনীর সামনে নিজেদের নগরপ্রাচীরের দ্বার বন্ধ করে দেয় এবং মুসলিম বাহিনীর কাছে বার্তা পাঠায় যে, আমরা রোমানদের জুলুম ও কঠোরতার অধীনে থাকতে চাই না; বরং মুসলমানদের ন্যায়বিচারই আমাদের কাম্য। [মূল গ্রন্থের টীকা]

রোমান বাহিনী তখন বায়সানে ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত বায়সানে নৌপথে প্রতিদিন নতুন নতুন সৈন্যদল আসছিল এবং রোমান বাহিনীর আয়তন বৃদ্ধি করছিল। অবস্থাদৃষ্টে মুসলিম বাহিনী নিজেরাই অগ্রসর হয়ে তাদের ওপর আক্রমণ চালানোর মনস্থ করে। কিন্তু রোমানরা এ সময় কৌশল করে উভয় পক্ষের শিবিরের মাঝে অবস্থিত নদীতে বিদ্যমান বিভিন্ন বাঁধ কেটে দেয়। ফলে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা বাধাগ্রস্ত হয় এবং পুরো এলাকা কাদায় ভরে যায়। এ কারণেই এ অভিযানকে ফিহলের অভিযান ও বায়সানের অভিযানের পাশাপাশি রাদগা (কাদামাটি)-এর অভিযানও বলা হয়। একপর্যায়ে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আশি হাজারে পৌঁছায়।

প্রথমে মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি আক্রমণ পরিচালনা করে এবং প্রতিটিতে বিজয় অর্জন করে। এরপর আবু উবায়দা রাযি. খালিদ বিন ওয়ালিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, এই বিশাল রোমান বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে হলে আগামীকাল প্রত্যুষেই তাদের ওপর চূড়ান্ত আক্রমণ করতে হবে।

সেদিন ছিল ত্রয়োদশ হিজরি সনের ২৮ জিলকদ (৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি)। প্রচণ্ড শীতের রাত। গরম আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠা মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে ফজর নামাজ আদায় করে। এরপর তারা নদী পাড়ি দিয়ে রওনা হয় রোমান শিবিরের উদ্দেশে। এদিকে রোমান বাহিনীও তখন মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল—মুসলিম সৈন্যরা তখনও নিদ্রায় নিমগ্ন। হঠাৎ মুসলিম বাহিনীকে দেখে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে।

মুসলিম বাহিনীর অন্যতম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. রোমান বাহিনীর বিন্যাসের প্রতি লক্ষ করে দেখতে পান যে, প্রস্থে তাদের সারিগুলো দৃষ্টিসীমার চেয়েও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অবস্থায় তাদের সঙ্গে লড়াই শুরু হলে মুসলিম বাহিনী তিনদিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে এবং সমূহ ক্ষতির শিকার হবে। পাশাপাশি তিনি লক্ষ করেন যে, রোমান বাহিনীর মূল অংশে অশ্বারোহী ও পদাতিক উভয় ধরনের সৈন্য থাকলেও ডান ও বামবাহুতে কেবল পদাতিক সৈন্যই আছে। খালিদ রাযি.-এর অভিজ্ঞ সামরিক দৃষ্টিতে এ বিষয়টিও ধরা পড়ে যে, রোমান বাহিনীর

পেছনের দিক সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং তারা পরাজয়ের মুখোমুখি হলে প্রয়োজনে সহজেই পিছু হটতে পারবে। খালিদ রাযি. তৎক্ষণাৎ এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পুরো মুসলিম বাহিনীকে আপন স্থানে স্থির থাকতে বলে তিনি মাত্র দেড় হাজার সৈন্য নিয়ে বিশাল রোমান বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন! সঙ্গে সঙ্গে রোমান বাহিনীও অগ্রসর হয়ে তাদেরকে সমূলে শেষ করে দিতে সচেষ্ট হয়। কিছুক্ষণ না যেতেই খালিদ তার সঙ্গীদের নিয়ে পরাজয়ের ভান করে পিছু হটেন। বিজয়ের ঘ্রাণ পেয়ে উন্মাদপ্রায় রোমান বাহিনী আগ-পিছ না ভেবে একযোগে তাদের পিছু নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে থাকে। হঠাৎ করেই রোমান বাহিনী আবিষ্কার করে যে, তারা অগ্রসর হতে হতে এমন স্থানে পৌঁছে গেছে, যার পেছনে পানিতে পূর্ণ এক জলাভূমি! ফলে তারা পেছন দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পাশাপাশি স্থানটি পাশে সংকীর্ণ হওয়ায় রোমান বাহিনীর বিন্যাসও বদলে যায় এবং প্রস্থে তাদের সারিগুলো সংকীর্ণ হয়ে সামনে-পেছনে সারির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এখন উভয় বাহিনীর প্রস্থ প্রায় সমান। তাই মূল লড়াই শুরু হলে একজন মুসলিম সৈন্যকে একজন রোমান সৈন্যেরই মোকাবিলা করতে হবে।

এরপর খালিদ দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তার সঙ্গে থাকা দেড় হাজার সৈন্যকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। তিনি নিজে গ্রহণ করেন বাম অংশের দায়িত্ব, কায়স বিন হুবায়রা রাযি.-কে প্রদান করেন ডান অংশের দায়িত্ব আর মায়সারা বিন মাসরুক রাযি.-কে প্রদান করেন মধ্য অংশের দায়িত্ব। এরপর তিনি ও কায়স বিন হুবায়রা নিজ নিজ অংশ নিয়ে রোমান বাহিনীর পদাতিক ডানবাহু ও বামবাহুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। শুরু হয় প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অশ্বারোহী মুসলিম সৈন্যগণ পদাতিক রোমান সৈন্যদের কচুকাটা করতে থাকে। অবস্থাদৃষ্টে রোমান বাহিনীর মূল অংশের অশ্বারোহী সৈন্যরা ডান ও বামবাহুর সহায়তা করতে অগ্রসর হয়। খালিদ রাযি.-ও এরই প্রতীক্ষায় ছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য তাদের পদাতিক অংশকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন! দ্রুত তাদের ওপর হামলা চালাও।' খালিদের নির্দেশ পেতেই মায়সারা বিন মাসরূক রাযি. তার সৈন্যদের নিয়ে রোমান বাহিনীর মধ্য অংশের ওপর আক্রমণ চালান।

এ সবকিছু ঘটছিল আর মূল মুসলিম বাহিনী তখনও আপন স্থানে অবিচল দাঁড়িয়ে ছিল। যদিও আবু উবায়দা রাযি.-ই ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক; কিন্তু খালিদ রাযি.-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিলেন, রোমানদেরকেও নিজের ইচ্ছেমতো পরিচালিত করছিলেন।

কিছুক্ষণ পর পুরো মুসলিম বাহিনী রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে সকল রোমান সৈন্য হয় মারা পড়ে কিংবা প্রচণ্ড আহত হয়। রাত নেমে আসতেই বেঁচে থাকা অবশিষ্ট রোমান সৈন্যরা পলায়নের পথ ধরে।

ফিহলের যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর অবিস্মরণীয় বীরত্ব প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে কোনো যুদ্ধে কোনো মুসলিম সৈন্য অনন্যসাধারণ রণকুশলতা প্রদর্শন করলে বলা হতো—সে তো বায়সান যুদ্ধের খালিদের ন্যায় যুদ্ধ করেছে। খালিদ ফিহলের যুদ্ধে একাই রোমান বাহিনীর এগারোজন সেনাপতিকে হত্যা করেন।

কায়স বিন হুবায়রা রাযি.-ও এ যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। তার হাতে এ যুদ্ধে তিনটি তরবারি ও এগারোটি বর্শা ভেঙে যায়।

দামেশক বিজয়

[রজব, চতুর্দশ হিজরি]
[সেপ্টেম্বর, ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দ]

ফিহলের অভিযান শেষে মুসলিম বাহিনীর সবকটি অংশ একত্রে দামেশক অবরোধ করে[৯৪] এবং কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে দামেশকের বিভিন্ন প্রবেশদ্বারে অবস্থান গ্রহণ করে।

---

৯৪. ইবনে কাছির রহ. বলেন, 'অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে ফিহলের যুদ্ধ দামেশক বিজয়ের পূর্বে সংঘটিত হয়। তবে ইমাম আবু জাফর ইবনে জারির বলেন, তা দামেশক বিজয়ের পর সংঘটিত হয়।' (ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৫)। আমরা এখানে প্রথম মতটি গ্রহণ করেছি। ড. রাগিব সারজানি লিখেছেন, শামের মুসলিম বাহিনী মোট চারবার দামেশক অবরোধ করে। প্রথম তিনবারের প্রত্যেকবারই দক্ষিণে রোমান সম্রাট কর্তৃক বিশাল সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনী দামেশকের চিন্তা বাদ দিয়ে সেদিকে অগ্রসর হতে বাধ্য হয়। প্রথমবার খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. শামে আগমনের পর বুছরা বিজয়ের পূর্বে দামেশক অবরোধ করেন। এরপর তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে বুছরায় অভিযান পরিচালনা করেন। বুছরা বিজয়ের পর দ্বিতীয়বার দামেশক অবরোধ করা হয়। এবারও অবরোধ প্রত্যাহার করা হয় এবং আজনাদাইনে=

দামেশক ছিল সুউচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত সুরক্ষিত এক নগরী। প্রাচীরগুলোর উচ্চতা ছিল প্রায় ছয় মিটার, প্রস্থ ছিল সাড়ে চার মিটার। প্রাচীরের ওপর পনেরো মিটার দূরত্ব পরপর ছিল পর্যবেক্ষণ-চৌকি। প্রাচীরের গায়ে বিভিন্ন স্থানে ছিল বিশালাকার সাতটি ফটক। এসব ফটক ব্যতীত অন্য কোনো স্থান দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। নগরীর নিরাপত্তাব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে নগরপ্রাচীরের চারপাশ ঘিরে খনন করা হয়েছিল পানিতে পরিপূর্ণ তিন মিটার প্রস্থের গভীর পরিখা। এর ফলে দামেশক নগরী দুর্ভেদ্য ও সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত হয়েছিল। এ কারণে অবরোধ দীর্ঘ কয়েক মাস স্থায়ী হওয়ার পরও দামেশকবাসীর মাঝে নতি স্বীকারের কোনো লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল না।

দামেশক অবরোধ করার সময় মুসলিম বাহিনী কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে নগরীর সাতটি প্রবেশদ্বারে অবস্থান গ্রহণ করে। খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. অবস্থান গ্রহণ করেন আশ-শারকি প্রবেশদ্বারে (The Eastern Gate)। আবু উবায়দা রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ অবস্থান গ্রহণ করে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে দামেশকের পশ্চিম প্রান্তে আল-জাবিয়া প্রবেশদ্বারে (Bab al-Jabiya)। ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-এর নেতৃত্বে আরেকটি অংশ অবস্থান নেয় দক্ষিণ প্রান্তের আস-সাগির দ্বার (Bab al-Saghir) ও কীসান দ্বারে (Bab Kisan)। শুরাহবিল বিন হাসানা রাযি.-এর নেতৃত্বে আরেকটি অংশ অবস্থান গ্রহণ করে উত্তর পাশে আল-ফারাদিস প্রবেশদ্বারে (Bab al-Faradis)। আমর ইবনুল আস রাযি.-এর নেতৃত্বে আরেকটি অংশ অবস্থান নেয় টুমা প্রবেশদ্বারে (Bab Tuma)। শুধু আস-সালাম প্রবেশদ্বারের অবস্থান দুর্গম অঞ্চলে হওয়ায় সেখানে কোনো বাহিনী অবস্থান গ্রহণ করেনি।

একপর্যায়ে প্রচণ্ড শীতের মৌসুম শুরু হয়। ধীরে ধীরে কমে আসতে থাকে দামেশকবাসীর মজুত খাদ্যসরবরাহ। মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের চোখে

=অভিযান পরিচালনা করা হয়। আজনাদাইন বিজয়ের পর তৃতীয়বার অবরোধ করা হয়। এ সময় ত্রয়োদশ হিজরি সনের জিলকদ মাসে ফিহলে রোমান সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি. ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-কে দামেশকে রেখে বাকিদেরকে নিয়ে ফিহলে অভিযান পরিচালনা করেন। ফিহলের সফল অভিযান শেষে ফিরে এসে চতুর্দশ হিজরি সনে মুসলিম বাহিনী চতুর্থবার দামেশক অবরোধ করে এবং দামেশক জয় করে। দেখুন—https://bit.ly/345dgJu।

কিন্তু নিদ্রা নেই। বিশেষত একটি ইউনিটের অধিনায়ক হিসেবে খালিদ রাযি.-এর ছিল বিশেষ সতর্ক-দৃষ্টি ও শক্তিশালী গোয়েন্দা-তৎপরতা। এক রাতে তিনি সংবাদ পান—জনৈক রোমান সেনাপতির সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া উপলক্ষ্যে নগরপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ভোজসভা ও পানসভার আয়োজন করা হয়েছে এবং মদের নেশায় মাতাল রোমানরা অসতর্ক ও অরক্ষিত অবস্থায় আছে। খালিদ তো এ ধরনের সুবর্ণ সুযোগ হেলায় নষ্ট করার লোক নন! তিনি তৎক্ষণাৎ মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী রেজিমেন্টের সাহসী সৈনিকদের তলব করেন। সকলে সঙ্গে নেন কিছু রশি ও মই; যা এ ধরনের সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্যই তৈরি করা হয়েছিল।

খালিদ ও তার সঙ্গীগণ মই সঙ্গে নিয়ে সাঁতরে পরিখা পার হন। তারা প্রাচীরের মাথায় মই আটকাতে সক্ষম হন এবং শত্রুপক্ষের প্রহরীদের অপ্রস্তুত রেখেই প্রাচীরে চড়েন। এরপর তারা দ্রুত দ্বার-প্রহরীদের হত্যা করে আশ-শারকি ফটক উন্মুক্ত করে দেন। তাদের তাকবির-ধ্বনিতে দামেশকের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে ওঠে।

খালিদ তার সঙ্গীদের নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করেন। পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, খালিদ তাদের দফারফা করেন।

খালিদ রাযি. দামেশকের পূর্ব দিক থেকে প্রবেশ করে ঝড়ের গতিতে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য প্রবেশদ্বারে অবস্থানরত সেনাপতিগণ এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। দামেশকের রোমান সেনাপতি যখন উপলব্ধি করে যে, খালিদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী দামেশকে প্রবেশ করে অনেকটা পথ অতিক্রম করে ফেলেছে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দামেশক জয় করতে যাচ্ছে, তখন সে এক বিস্ময়কর কৌশল গ্রহণ করে। সে নগরীর অন্যান্য দ্বারে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদের কাছে সংবাদ পাঠায় যে, আপনারা ইতিপূর্বে আমাদেরকে আত্মসমর্পণের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আমরা সবদিক বিবেচনা করে তা গ্রহণ করে নিয়েছি এবং আপনাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হয়েছি। সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা তখন রোমানদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং তাদের সঙ্গে নিরাপত্তাদানের চুক্তি করেন। এরপর মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য অংশ পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিক থেকে বিজয়ী হিসেবে দামেশকে প্রবেশ করে। সকলে যখন নগরীর মধ্যপ্রান্তে সমবেত হয়, তখন অবাক বিস্ময়ে জানতে পারে যে, খালিদ রাযি. যুদ্ধের মাধ্যমে

দামেশকে প্রবেশ করেছেন। খালিদ রাযি.-ও জানতে পারেন যে, আবু উবায়দা রাযি. দামেশকবাসীকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।

অবশেষে সকলের পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় যে, দামেশককে সন্ধির মাধ্যমে বিজিত নগরী হিসেবেই বিবেচনা করা হবে এবং দামেশকবাসীর সঙ্গে যুদ্ধে বিজিত জাতির পরিবর্তে সন্ধির মাধ্যমে বিজিত জাতির নীতি কার্যকর হবে। নিঃসন্দেহে এটি ইসলাম ও মুসলমানদের ন্যায় ও উদারতার এক অনন্যসাধারণ বহিঃপ্রকাশ।

দামেশকের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গির্জা ছিল 'ইউহান্না গির্জা'। গির্জার অর্ধেক যুদ্ধের মাধ্যমে এবং অর্ধেক সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল। যে অংশ যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত হয়েছিল, সেখানে মুসলমানরা শরিয়তপ্রদত্ত অধিকারের ভিত্তিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। সন্ধির মাধ্যমে বিজিত অপর অংশ গির্জা হিসেবেই রেখে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে উমাইয়া আমলে মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদের পরিসর বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দেয়। তখন উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক গির্জার দায়িত্বশীলদেরকে ডেকে তাদেরকে গির্জার বাকি অর্ধেক ভূমি মুসলমানদের দিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেন এবং বিনিময়ে দামেশক ও আশেপাশের যুদ্ধের মাধ্যমে বিজিত অঞ্চলের চারটি গির্জা না ভেঙে তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় রাজি হলে খলিফা ওয়ালিদ উভয় অংশকে একত্র করে জামে উমাবি নির্মাণ করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ

[রজব, পঞ্চদশ হিজরি]
[আগস্ট, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

দামেশক বিজয়ের পর আবু উবায়দা রাযি. মুসলিম বাহিনীর কয়েকজন সেনাপতিকে দামেশক, ফিলিস্তিন ও জর্ডানের প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং নিজে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে হিমস অভিমুখে রওনা হন। পথিমধ্যে খালিদ বিন ওয়ালিদ সন্ধির মাধ্যমে বালাবাক্কু নগরী জয় করেন। মুসলিম বাহিনী হিমসে পৌঁছে নগরীটি অবরোধ করলে মাত্র আঠারো দিন পরই হিমসবাসী নতি স্বীকার করে এবং মুসলমানদের সঙ্গে

সন্ধিচুক্তি করতে সম্মত হয়। এভাবে পঞ্চদশ হিজরি সনের রবিউল আউয়াল মাসে হিমস বিজিত হয়।

এদিকে প্রথমে দামেশক, তারপর হিমসের পতনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস চূড়ান্ত পর্যায়ের উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এ সময় ঐতিহাসিক ফিলিস্তিনের বায়তুল মুকাদ্দাস ও কায়সারিয়া অঞ্চলের অধিবাসীরাও হিরাক্লিয়াসের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার আবেদন জানায়। অবশেষে হিরাক্লিয়াস শাম অঞ্চলে চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার জন্য ব্যাপক সৈন্যসমাবেশ ঘটান। তিনি রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্যের আশ্রিত প্রত্যেক অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে সকল যুদ্ধসক্ষম পুরুষকে বাহিনীতে যোগ দিতে নির্দেশ দেন। ফলে রুশ, স্লাভ, ইংরেজ, রোমান, গ্রিক, জর্জিয়ান, আর্মেনিয়ান ও আরব খ্রিষ্টানসহ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজার সৈন্যের বিরাট এক বাহিনী[৯৫] প্রস্তুত হয়ে যায়। পুরো বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত করা হয় আর্মেনিয়ান শাসক বাহানকে। হিরাক্লিয়াসের উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার— বিজয়ী হলে শাম অঞ্চলে রোমান সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধার ও সুদৃঢ় হবে আর পরাজিত হলে চিরতরে শামের মায়া ত্যাগ করতে হবে। খ্রিষ্টান ধর্মযাজকরাও বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয় এবং যোদ্ধাদেরকে ধর্মীয় বাণী শুনিয়ে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে।

শাম অঞ্চলে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি. যথাসময়ে গোয়েন্দা মারফত রোমানদের এই বিশাল সৈন্যসমাবেশ সম্পর্কে সংবাদ পেয়ে যান। তৎক্ষণাৎ তিনি তার সঙ্গে অবস্থানরত অন্যান্য মুসলিম সেনাপতি ও নেতৃস্থানীয় সাহাবিদের সঙ্গে করণীয় নির্ধারণে পরামর্শ করেন। পরামর্শে সিদ্ধান্ত হয় যে, মুসলমানরা আপাতত হিমসের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ফ্রন্টে অবস্থানরত মুসলিম সেনাপতিদের সঙ্গে মিলিত হবে এবং সকলে মিলে রোমান বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য উপযুক্ত কোনো স্থান নির্বাচন করবে।

---

৯৫. ইয়ারমুকের যুদ্ধে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা নিয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। আবু উবায়দা রাযি. কর্তৃক খলিফা উমর রাযি.-এর কাছে প্রেরিত একটি পত্রের বিবরণ দ্বারা অনুমিত হয় যে, রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় চার লক্ষ। ঐতিহাসিক আযদি-ও বিভিন্ন সূত্রের বরাতে চার লক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন।

হিমস ত্যাগের সিদ্ধান্তের কথা খলিফা উমর রাযি.-কে জানানো হলে তিনি প্রথমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অবশ্য যখন তাকে জানানো হয় যে, এটি সকলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত, তখন তিনি তাদের সফলতা কামনা করেন। বার্তাবাহক খলিফার কাছে মদিনা থেকে অতিরিক্ত সামরিক সাহায্য প্রেরণের অনুরোধ করলে তিনি সাইদ বিন আমির বিন হিযয়াম রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন। পরবর্তী সময়ে সাইদ বিন আমির রাযি.-এর নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী শামে মূল বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ছত্রিশ হাজার। মুসলিম বাহিনীতে প্রায় এক হাজার সাহাবি ছিলেন, যাদের মাঝে মহান বদরি কাফেলার একশ সদস্যও ছিলেন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-এর পরামর্শে সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী জাবিয়া হতে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কয়েক মাইল অগ্রসর হয়ে ইয়ারমুক নদীর তীরে অবস্থিত (বর্তমান গোলান মালভূমির অন্তর্গত) ইয়ারমুক প্রান্তরের পূর্বপাশে শিবির স্থাপন করে। অপরদিকে হিরাক্লিয়াসের নির্দেশে রোমান বাহিনী শিবির স্থাপন করে ইয়ারমুকের সমতল ভূমির পশ্চিম প্রান্তে ওয়াদিউর রাক্কাদে। যুদ্ধক্ষেত্রে অটল থাকার জন্য রোমান বাহিনীর ডানবাহুর ত্রিশ হাজার সৈন্য প্রতি দশজন পায়ে শিকল বেঁধে ময়দানে উপস্থিত হয়েছিল।

—দ্রষ্টব্য—

সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি.-এর অপূর্ব মহৎ আচরণ

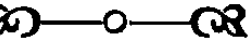
হিমস ত্যাগ করে জাবিয়ায় গমনের প্রাক্কালে সেনাপতি আবু উবায়দা রাযি. স্থানীয় অধিবাসীদের ডেকে তাদের কাছ থেকে ইতিপূর্বে সংগৃহীত জিজিয়া অর্থ ফেরত প্রদান করে বলেন,

'যেহেতু আমরা আর এখন আপনাদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করতে সক্ষম নই, তাই আপনাদের প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিয়ে নিন।'

উত্তরে হিমসবাসী বলে,

'আমরা যে নিপীড়ন ও শোষণের মাঝে বসবাস করি, তার তুলনায় আপনাদের সদাচরণ ও ন্যায়-নীতি আমাদের কাছে শতগুণ প্রিয়।'

নিঃসন্দেহে আবু উবায়দা রাযি.-এর এই আচরণ ছিল ইসলামের সুমহান আদর্শ ও নীতির এক প্রকৃষ্ট নমুনা। বিজয়ী জাতি কর্তৃক চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থ গ্রহণের পর বিজিত জাতিকে তা ফেরত প্রদানের ইতিহাস পৃথিবীতে একমাত্র মুসলিম জাতিই রচনা করতে পেরেছে।



যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সৈন্যসংখ্যা ও যুদ্ধসরঞ্জাম উভয় দিক থেকে রোমান বাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিভাত হচ্ছিল। প্রায় আঠারো মাইল বিস্তৃত রোমানদের শিবির দেখে বিহ্বল জনৈক মুসলিম সৈনিক মন্তব্য করে, 'রোমান বাহিনী কত বিশাল! আর মুসলিম বাহিনী কত ক্ষুদ্র!' তার মন্তব্য শুনে হজরত খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন এবং চিৎকার করে বলেন, 'বরং রোমান বাহিনী কত ক্ষুদ্র! আর মুসলিম বাহিনী কত বিশাল! আরে! আল্লাহর সাহায্য সঙ্গে থাকলে কম সংখ্যক সৈন্যও বেশি সংখ্যক সৈন্যে পরিণত হয় আর লাঞ্ছনা ও অবমাননা এসে গেলে বেশি সংখ্যক সৈন্যও কম সংখ্যায় পরিণত হয়। আল্লাহর শপথ! আমি তো বরং এই কামনা করি যে, আমার 'আশকার' ঘোড়াটি পায়ের ব্যথা-মুক্ত হতো আর বিপরীতে রোমান সৈন্য যা আছে, তার দ্বিগুণ হতো!' উল্লেখ্য, শামের বিস্তীর্ণ এলাকায় পথ চলে খালিদের ঘোড়ার খুর ছিলে গিয়েছিল।

আল্লাহু আকবার! এমনই ছিল সাহাবায়ে কেরামের চিন্তা ও চেতনা! এমনই ছিল মুসলিম সেনাপতিদের ভাব ও ভাবনা! খালিদ রাযি. জানতেন ও বিশ্বাস করতেন যে, সংখ্যাধিক্যে কিছু আসে-যায় না; একটি সৈন্যদলের বিজয় ও সফলতার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো আল্লাহর নুসরত ও সাহায্য লাভ করা; হোক তারা সংখ্যায় অতি অল্প। বরং তিনি তো বলছেন যে, এই যুদ্ধে যদি শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণও হয়, সমস্যা নেই; প্রিয় অশ্ব 'আশকার' তার সঙ্গে থাকলেই হলো!

খালিদ রাযি. যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে সকলকে সুরা আনফাল তিলাওয়াতের নির্দেশ দেন। আবু হুরায়রা রাযি., আবু সুফিয়ান রাযি. প্রমুখ সাহাবিগণ নসিহতের মাধ্যমে সকলের মনোবল সুদৃঢ় করতে সচেষ্ট হন।

এরই মধ্যে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে খলিফা উমর রাযি.-এর প্রেরিত বার্তা এসে পৌঁছায়। বার্তায় খলিফা সকলকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন—

> উমর আপনাদেরকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, হে মুসলমানগণ! আপনারা নিষ্ঠার সঙ্গে লড়াই করুন, সিংহের ন্যায় তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন এবং তরবারি দ্বারা শত্রুপক্ষের মাথায় আঘাত করুন। তারা যেন আপনাদের কাছে ধূলিকণার চেয়েও তুচ্ছ বিবেচিত হয়। আমি নিশ্চিত করেই জানি যে, তাদের মোকাবিলায় আপনারা নুসরত ও সাহায্য লাভ করবেন। সুতরাং তাদের সংখ্যাধিক্য যেন আপনাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে না পারে।

আবু উবায়দা রাযি. সকলকে খলিফার পত্র পাঠ করে শোনালে মুসলিম বাহিনীর মনোবল আরও বৃদ্ধি পায়।

যদিও আবু উবায়দা রাযি. ছিলেন মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক; কিন্তু তার অনুমতিতে মহাবীর খালিদ রাযি.-ই মুসলিম বাহিনীর বিন্যাস-সহ সবকিছু পরিচালনা করছিলেন আর আবু উবায়দা রাযি. মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন অংশে গিয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করছিলেন।

খালিদ রাযি. মুসলিম বাহিনীর পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্যদের ছত্রিশটি পদাতিক ও তিনটি অশ্বারোহী দলে বিভক্ত করেন আর চার হাজার বিশেষ অশ্বারোহী যোদ্ধার একটি বাহিনীকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একভাগের নেতৃত্ব নিজের কাছে রাখেন; অপরভাগের নেতৃত্ব কায়স বিন হুবায়রা রাযি.-কে প্রদান করেন। বীরত্ব ও রণকুশলতায় কায়স রাযি. ছিলেন খালিদ রাযি.-এর পর মুসলিম বাহিনীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। খালিদ রাযি. এই দুই অংশের একটিকে মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুর পেছনে এবং অপরটিকে বামবাহুর পেছনে মোতায়েন করেন। সিদ্ধান্ত হয় রোমান বাহিনীর প্রাথমিক হামলার তীব্রতা শেষ হওয়ার পর যখন তারা মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে মিশে যাবে, তখন খালিদ ও কায়স অশ্বারোহী যোদ্ধাদের নিয়ে ডান দিক ও বাম দিক থেকে এগিয়ে এসে রোমানদের কচুকাটা করবেন।

শুরুতে উভয় পক্ষের মধ্যে একাধিকবার আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও সমঝোতার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ নিশ্চিত হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পর ইয়ারমুকের প্রান্তরে উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হয়। প্রথমে উভয় বাহিনীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে সম্মুখ লড়াই সংঘটিত হয় এবং প্রতিটি লড়াইয়ে মুসলিম বীর যোদ্ধাগণ প্রতিপক্ষকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। এরপর শুরু হয় প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক লড়াই; ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ.-এর ভাষায়—

> যেন বিশাল অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে, আগুনের তেজ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে, তরবারিগুলো প্রাণ কেড়ে নেওয়ার এক অনিঃশেষ খেলায় মেতে উঠেছে। তরবারির আঘাতে ঝরে পড়ছে খণ্ডিত মস্তক, খণ্ডবিখণ্ড মানবদেহ।

জনৈক রোমান সেনাপতির ইসলামগ্রহণ

যুদ্ধ চলাকালে জুরজা নামক জনৈক রোমান সেনাপতি নিজেদের সারি থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে আহ্বান করেন। তার আহ্বানে খালিদ অগ্রসর হন। উভয়ের ঘোড়া যখন একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন জুরজা বলেন—'হে খালিদ, আপনি আমাকে সম্পূর্ণ সঠিক তথ্য দেবেন, মিথ্যা বলবেন না। স্বাধীন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলতে পারে না। আপনি আমার সঙ্গে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবেন, প্রতারণা করবেন না। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখনো প্রতারণা করে না। এটা কি সত্য যে, আল্লাহ তাআলা আসমান থেকে আপনাদের নবীর কাছে একটি তরবারি প্রেরণ করেছেন, আর তিনি তা আপনাকে প্রদান করেছেন? আর এ কারণেই আপনি যার বিরুদ্ধেই তরবারি কোষমুক্ত করেন, তাকেই পরাজিত করেন!'

খালিদ উত্তর দেন, 'না'।

'তাহলে আপনাকে সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তরবারি) ডাকা হয় কেন?' জুরজা জিজ্ঞেস করেন।

খালিদ উত্তর দেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদের মাঝে তার নবীকে প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্যের পথে আহ্বান করলে আমরা প্রথমে বিমুখ হয়েছি এবং তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছি। এরপর আমাদের অনেকে তাকে সত্যপ্রতিপন্ন করেছে আর বাকিরা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং তাকে দূরে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি ছিলাম মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী ও বিতাড়িতকারীদের একজন। তারপর আল্লাহ

তাআলা আমাদের অন্তর ও ললাটদেশ চেপে ধরেন এবং তার মাধ্যমে আমাদেরকে হেদায়েত দান করেন। আমরা তার হাতে বায়আত গ্রহণ করি। আমি ইসলামগ্রহণ করার পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি হলে আল্লাহর এক তরবারি, যা আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের বিরুদ্ধে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহর কাছে আমাকে সাহায্য করার দোয়া করেন। এ কারণেই আমি আল্লাহর তরবারি নামে আখ্যায়িত হয়েছি। আর আমি মুশরিকদের বিপক্ষে সর্বাধিক কঠোর ব্যক্তি।'

এরপর জুরজা জিজ্ঞেস করেন, 'আপনারা মানুষকে কীসের প্রতি আহ্বান করেন?'

খালিদ উত্তর দেন, 'আমরা মানুষকে এই সাক্ষ্য প্রদানের আহ্বান জানাই যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ তার বান্দা ও রাসুল। আর আমরা মানুষকে এই স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান জানাই যে, আল্লাহর রাসুল আল্লাহর পক্ষ থেকে যা নিয়ে এসেছেন, তা সত্য।'

'কেউ যদি আপনাদের আহ্বানে সাড়া না দেয়?' জুরজা জিজ্ঞেস করেন।

'তাহলে তারা জিজিয়া প্রদান করবে আর আমরা তাদেরকে নিরাপত্তা দেবো।'

'যদি জিজিয়া প্রদানেও রাজি না হয়?'

'আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব, এরপর যুদ্ধ করব।' খালিদ উত্তর দেন।

এরপর জুরজা জিজ্ঞেস করেন, 'আজ যদি কেউ আপনাদের আহ্বানে সাড়া দেয় এবং ইসলামে দীক্ষিত হয়, তাহলে তার মর্যাদা কীরূপ হবে?'

খালিদ উত্তর দেন, 'আল্লাহপ্রদত্ত বিধান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে ইসলামগ্রহণকারী অগ্রবর্তী-পশ্চাদ্‌বর্তী, সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলেই সমমর্যাদাসম্পন্ন বিবেচিত হয়।'

'তাহলে (আপনি বলতে চাচ্ছেন) আজ যে আপনাদের দলভুক্ত হবে, সেও আপনাদের সমপরিমাণ আজর ও প্রতিদান লাভ করবে?!'

'হ্যাঁ, বরং আজর ও পুণ্যের বিবেচনায় তো সে আরও উত্তম বিবেচিত হবে।'

'আপনারা তার তুলনায় কত পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছেন। তারপরও সে কীভাবে আপনাদের সমমর্যাদাসম্পন্ন হবে?!' জুরজা অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেন।

খালিদ উত্তর দেন, 'আমরা যখন ইসলামগ্রহণ করেছি এবং নবীজির হাতে বায়আত গ্রহণ করেছি, তখন তিনি ছিলেন জীবিত, আমাদের মাঝেই বিদ্যমান। তার কাছে আসমানি বার্তা অবতীর্ণ হতো, তিনি কুরআনের আলোকে আমাদের বিভিন্ন বিষয় জানাতেন, আমাদেরকে বিভিন্ন নিদর্শন দেখাতেন। আমরা যা দেখেছি-শুনেছি, তা দেখলে ও শুনলে যে কেউ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামগ্রহণে ও ইসলামের বিধান পালনে বাধ্য হয়ে পড়বে। বিপরীতে তোমরা সেসব বিস্ময়কর ও অলৌকিক প্রমাণাদি না দেখেছ, না শুনেছ। কাজেই তোমাদের কেউ যদি (আশ্চর্য বিষয়াদি প্রত্যক্ষ না করা সত্ত্বেও) খাঁটি নিয়ত ও স্বচ্ছ বিশ্বাসে ইসলামে দাখিল হয়, নিশ্চয়ই সে আমাদের চেয়ে শ্রেয়তর হবে।'

জুরজা তার শেষ প্রশ্ন করেন, 'আল্লাহর শপথ দিয়ে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমাকে সত্য বলেছেন তো? কোনো ধরনের ধোঁকা দেননি তো?'

'আল্লাহর শপথ! আমি তোমাকে সত্য বলেছি। আর তোমার-আমার কথোপকথন সম্পর্কে মহান আল্লাহ অবগত আছেন।'

এ কথা শোনার পর জুরজা খালিদের সামনে তার ঢাল উল্টিয়ে ধরে তার প্রতি ঝুঁকে পড়েন; এরপর বলেন, আমাকে ইসলাম শিখিয়ে দিন। খালিদ জুরজাকে নিয়ে নিজ তাঁবুতে ফিরে আসেন, এক মশক পানি দিয়ে তাকে অজু করান এবং তাকে নিয়ে দু-রাকাত নামাজ পড়েন।

রোমান বাহিনী ভেবেছিল, জুরজা খালিদকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছেন। জুরজাকে খালিদের সঙ্গে তাঁবুর দিকে যেতে দেখে রোমানরা মনে করে, জুরজার কৌশল সফল হয়েছে। খালিদ-বিহীন মুসলিম বাহিনীর ওপর তারা প্রবল উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রবল আক্রমণের মাধ্যমে তাদেরকে পিছু হটতে বাধ্য করে। এরই মধ্যে খালিদ ও জুরজা তাঁবু থেকে বেরিয়ে আসেন আর জুরজা মুসলিম কাতারে যোগ দিয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। মুসলিম সৈন্যরাও পরস্পরকে আহ্বান করে একতাবদ্ধ হয় এবং অটল-অবিচলতার সঙ্গে আক্রমণ শুরু করে। পাল্টা

আক্রমণে দিশেহারা রোমান বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। খালিদ ও জুরজা আপন আপন তরবারি হাতে প্রবল বিক্রমে রোমান সৈন্যদের কাতারে প্রবেশ করে যুদ্ধ করতে থাকেন।

জুরজা ইয়ারমুকের যুদ্ধেই শহিদ হন। তিনি এমন এক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যিনি আল্লাহর ওয়াস্তে জীবনে মাত্র দু-রাকাত নামাজ আদায় করার পরই শহিদি মৃত্যুর দেখা পেয়েছেন।[৯৬]

একটানা কয়েক দিন প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী লড়াই চলার পর ষষ্ঠ দিন রোমান বাহিনীর সমস্ত প্রতিরোধ ভেঙে পড়ে এবং তারা পলায়নের পথ ধরে। খালিদ রাযি. পূর্বেই গোপনে রোমান বাহিনীর পেছনের সংকীর্ণ গিরিপথে পাঁচশ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনীকে মোতায়েন করে রেখেছিলেন। ফলে পলাতক রোমান সৈন্যরা দু-দিক থেকে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মুসলিম সৈন্যদের আঘাতের পাশাপাশি গিরিখাত থেকে নিচে পড়ে গিয়ে মারা যেতে থাকে। ষষ্ঠ দিনের সূর্যাস্তের পূর্বেই বিজয় মুসলিম বাহিনীর পদচুম্বন করে।

পরদিন সকালে খালিদ রাযি. একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দামেশকের পথ ধরে পলায়নরত রোমান সেনাপতি বাহানের খোঁজে অগ্রসর হন এবং তার নাগাল পেয়ে তাকে হত্যা করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিন হাজার মুসলিম যোদ্ধা শহিদ হয়। অপরদিকে রোমান বাহিনীর সত্তর হাজার মতান্তরে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। ইয়ারমুকে পরাজয়ের ফলে শামে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং সম্রাট হিরাক্লিয়াস ভগ্ন হৃদয়ে এন্টিয়ক[৯৭] ত্যাগ করে কনস্টান্টিনোপলে চলে যান। শাম ত্যাগ করার সময় তিনি বলছিলেন, 'বিদায়, হে শাম! বিদায় চিরকালের জন্য! আর কখনো ফিরে আসব না তোমার বুকে। হায়! সবুজ-শ্যামল, উর্বর ও কল্যাণে ভরপুর এক ভূখণ্ড শত্রুর হাতে ছেড়ে যাচ্ছি!'

---

৯৬. জুরজার ইসলামগ্রহণের ঘটনা বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে ভিন্নভাবেও বর্ণিত আছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখানে তা উল্লেখ করা হলো না।

৯৭. **এন্টিয়ক** : ভূমধ্যসাগরের উপকূল হতে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পূর্বে আছি নদী (Orontes river)-এর তীরে অবস্থিত অতি প্রাচীন একটি নগরী এন্টিয়ক (Antioch)। আধুনিক তুরস্কের হাতায় প্রদেশ (Hatay Province)-এর অন্তর্গত নগরীটির বর্তমান নাম এন্টাকিয়া (Antakya)। আরবিতে নগরীটির নাম أَنْطَاكِيَة (আনতাকিয়া)।

ইয়ারমুকের যুদ্ধে বীরত্ব ও ত্যাগের কিছু খণ্ডচিত্র

❝ যুদ্ধের শুরুতে যখন রোমান বাহিনী প্রবল বেগে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন মুসলিম বাহিনীর ডানবাহুর প্রধান হজরত মুআয বিন জাবাল রাযি. নিজ ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন এবং চিৎকার করে বলেন, 'কেউ চাইলে আমার এই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে পারে।' তৎক্ষণাৎ সদ্য কৈশোরে পা রাখা তার পুত্র আবদুর রহমান বিন মুআয এগিয়ে এসে বলেন, 'আব্বাজান, আমি এই ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করব। আমি আশা করি যে, আমি মুসলিম বাহিনীর পদাতিক সৈন্যদের চেয়ে অধিক ভূমিকা রাখব আর আপনি পদব্রজে যুদ্ধ করেও মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী যোদ্ধাদের চেয়ে অধিক ভূমিকা রাখবেন। আপনাকে অটল-অবিচল দেখে অন্যরাও অটলতার পরিচয় দেবে, ইনশাআল্লাহ।' উত্তরে মুআয রাযি. বলেন, 'বৎস, আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে তার সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফিক দান করুন।' এরপর দুজনে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং অনন্যসাধারণ বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটান।

❝ যুদ্ধ চলাকালে হজরত হারিস বিন হিশাম রাযি., ইকরিমা বিন আবু জাহল রাযি. ও আইয়াশ বিন আবি রাবিআ রাযি. গুরুতর আহত হয়ে ময়দানে পড়ে ছিলেন। এ সময় হারিস রাযি. পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলে তার জন্য পানি আনা হয়। ইকরিমা রাযি. পানির দিকে তাকালে হারিস রাযি. বলেন, এই পানি ইকরিমাকে দাও। ইকরিমা রাযি. যখন পানি হাতে নেন, তখন আইয়াশ রাযি. তার দিকে তাকান। আইয়াশ রাযি.-কে তাকাতে দেখে ইকরিমা পানিবাহককে বলেন, এই পানি আইয়াশকে দিয়ে দাও। পানি হজরত আইয়াশের হাতে পৌঁছার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন। পুনরায় পানি ইকরিমা রাযি. ও হারিস রাযি.-এর কাছে পৌঁছার পূর্বে তারাও একে একে ইন্তেকাল করেন।

প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন 'ইছার' ও পরের তরে নিজেদের প্রয়োজন ত্যাগের অনন্যসাধারণ নমুনা। মৃত্যুর সুকঠিন মুহূর্তেও তাদের কর্মনীতি ছিল পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾

তারা নিজেরা অভাব-অনটনে থাকলেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। [সুরা হাশর : ০৯]

—দ্রষ্টব্য—

রণাঙ্গনে মুসলমানদের বিজয়ের মূল কার্যকারণ

বর্ণিত আছে,

পরাজিত রোমান বাহিনীর সৈন্যরা যখন পালিয়ে এন্টিয়কে হিরাক্লিয়াসের কাছে উপস্থিত হলো, তখন তিনি তাদেরকে ভর্ৎসনা করে বললেন, 'ধিক তোমাদের! বলো তো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ নয়?' তারা উত্তর দিলো, 'অবশ্যই, তারা মানুষ।' হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, 'সংখ্যায় কারা বেশি ছিল? তোমরা, নাকি তারা?' তারা উত্তর দিলো, 'আমরাই বেশি ছিলাম। বরং যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থানে আমরা তাদের কয়েক গুণ ছিলাম।' হিরাক্লিয়াস এবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে তোমরা পরাজিত হচ্ছ কেন?'

উপস্থিত প্রবীণ ও বিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি বললেন,

'তাদের বিজয় ও আমাদের পরাজয়ের কারণ হচ্ছে—তারা রাতভর ইবাদত করে, দিনে রোজা রাখে। তারা প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে, সৎ কাজের আদেশ করে ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। তারা নিজেদের মাঝে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। তাদের বিজয় ও আমাদের পরাজয় এ কারণে যে, আমরা মদপান করি, ব্যভিচারে লিপ্ত হই এবং হারাম কাজ করি। আমরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে জুলুম-নিপীড়ন করি, বিভিন্ন অন্যায় নির্দেশ প্রদান করি। আল্লাহ যে কাজে সন্তুষ্ট হবেন, আমরা তাতে বাধা দিই আর পৃথিবীতে ফাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করি।'

হিরাক্লিয়াস বললেন, 'তুমি সত্যই বলেছ!'

ইয়ারমুকের যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনীর বিভিন্ন অংশ শামের উপকূলীয় অঞ্চল বাদ দিয়ে মূল ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে একের পর এক এলাকা যুদ্ধ বা সন্ধির মাধ্যমে জয় করতে থাকে। কিননাসরিন, আলেপ্পো, এন্টিয়ক, মানবিজ, লাতাকিয়াসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন নগরী এ সময় মুসলমানদের অধিকারে আসে।

এ পর্যায়ে খলিফা উমর রাযি. শাম অঞ্চলে অবস্থানরত অন্যতম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি.-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করে তাকে আল-কুদস[৯৮] অভিমুখে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন।

আজনাদাইন-বিজয়

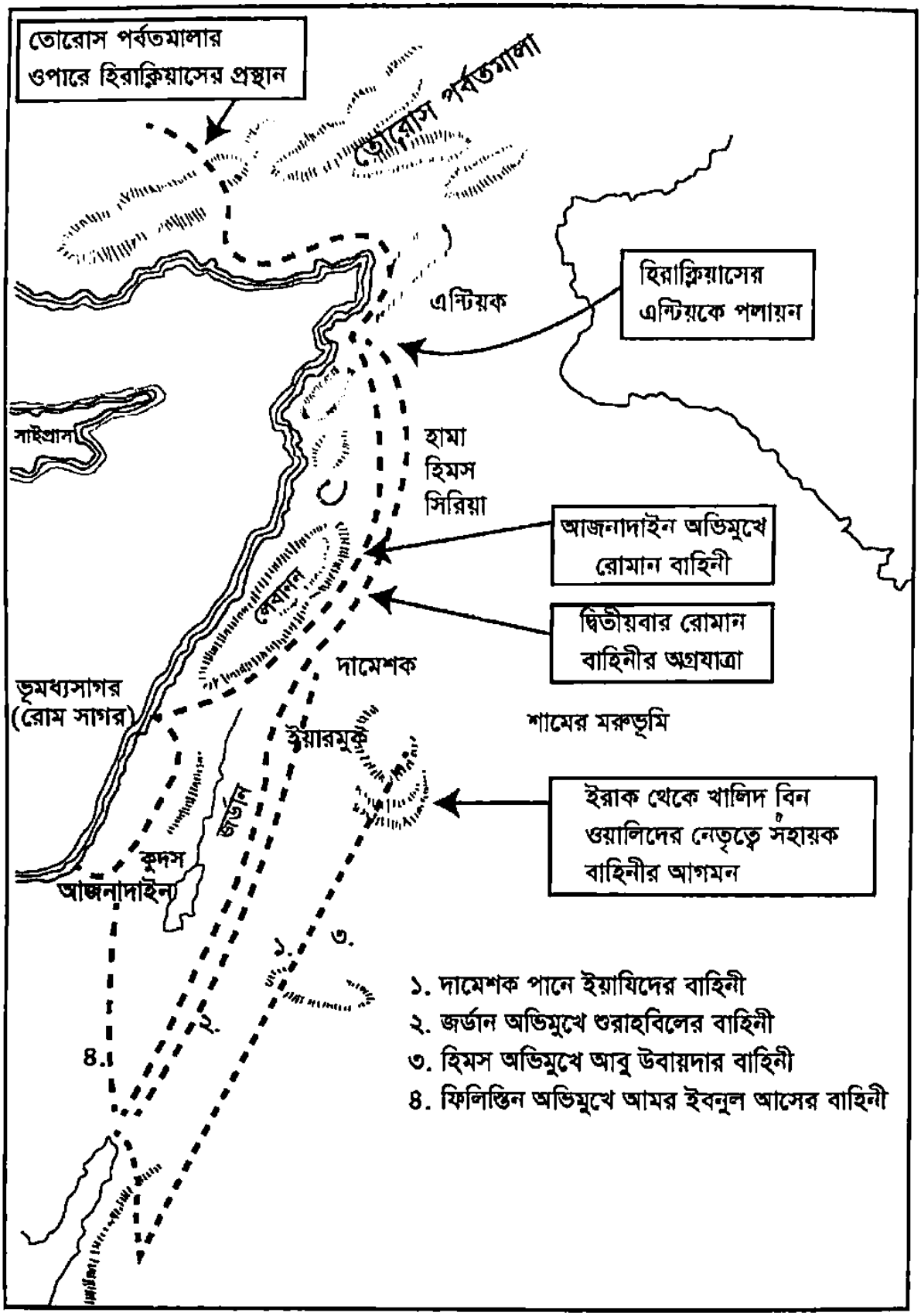
খলিফার নির্দেশ পেয়ে আমর ইবনুল আস রাযি. জর্ডান নদী পাড়ি দিয়ে একে একে ঐতিহাসিক ফিলিস্তিন অঞ্চলের বিভিন্ন নগরী জয় করেন। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। তিনি জানতে পারেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাস নগরীর অভ্যন্তরে একটি এবং পাশ্ববর্তী আজনাদাইন নগরীর অভ্যন্তরে আরেকটি রোমান বাহিনী অবস্থান করছে। উভয় বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল আরতাবুন নামক জনৈক রোমান সেনাপতি। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে আরতাবুনের বিশেষ মর্যাদা ছিল। আরতাবুন ছিল সমকালীন শ্রেষ্ঠতম ও নিষ্ঠুরতম রোমান সেনাপতি। আমর রাযি. আরও জানতে পারেন যে, রামলায়ও আরতাবুনের অধীনস্থ ছোট একটি বাহিনী অবস্থান করছে। আরতাবুন নিজে আজনাদাইনে রোমান বাহিনীর সঙ্গে অবস্থান করছিল।

সবকিছু জানার পর আমর ইবনুল আস রাযি. আলকামা বিন হাকিম ফিরাসি রাযি.-এর নেতৃত্বে একটি বাহিনী বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করার জন্য প্রেরণ করেন, আবু আইয়ুব মালিকি রাযি.-কে রামলার[৯৯] উদ্দেশে প্রেরণ করেন আর নিজে মূল বাহিনী নিয়ে আজনাদাইন অভিমুখে রওনা হন।

---

৯৮. **আল-কুদস** : ঐতিহাসিকগণের মতে আল-কুদস পৃথিবীর প্রাচীনতম নগরী। কয়েক হাজার বছর ব্যাপ্ত কালের এই দীর্ঘ পরিক্রমায় আল-কুদস বিভিন্ন ভাষা ও জাতির সংস্পর্শ লাভ করে এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হলো ১. সালিম ২. মুরইয়া ৩. ইয়াবুস ৪. আরিয়েল ৫. ইলিয়া ৬. আল-কুদস ৭. বায়তুল মুকাদ্দাস ৮. বালাত ৯. রাবাত ১০. জেরুজালেম।

৯৯. **রামলা ও রামাল্লা** : দুটি ভিন্ন নগরীর নাম। রামলা (Ramla) বর্তমান অবৈধ ইসরাইল রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাচীন ও ঐতিহাসিক নগরী, যা আল-কুদস হতে ৩৮ কিলোমিটার=



মানচিত্র নং-১

শাম অঞ্চলে অব্যাহত বিজয়াভিযান

=উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অপরদিকে রামাল্লা (Ramallah) (জর্ডান নদীর) পশ্চিম তীরে অবস্থিত ফিলিস্তিনের প্রধান প্রশাসনিক নগরী। এর অবস্থান আল-কুদস থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে।

আমর ইবনুল আস রাযি.-এর চতুরতা ও বিচক্ষণতা

আমর ইবনুল আস রাযি. আজনাদাইন অবরোধ করলেও কোনোভাবেই আরতাবুনকে পরাভূত করতে পারছিলেন না। একপর্যায়ে তিনি সিদ্ধান্ত নেন যে, তিনি নিজে দূতবেশে ভেতরে প্রবেশ করে নগরীটির সৈন্যসমাবেশ, নিরাপত্তাব্যবস্থার সবল-দুর্বল দিক ইত্যাদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে সফল হলেও আরতাবুন সন্দেহ করে যে, তিনি সেনাপতি আমর হবেন অথবা এমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যক্তি হবেন, আমরের বাহিনীতে যার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আরতাবুন তাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং একজন নিরাপত্তারক্ষীকে ডেকে নির্দিষ্ট স্থানে লুকিয়ে থাকতে এবং আমর চলে যাওয়ার সময় তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়।

প্রখর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আমর ইবনুল আস রাযি. আরতাবুনের চেহারার পরিবর্তনেই সবকিছু পড়ে ফেলেন। দূত হিসেবে আলোচনা শেষ করার পর তিনি আরতাবুনকে বলেন, 'আপনি আমার কথা শুনলেন, আমিও আপনার কথা শুনলাম। আপনার প্রস্তাব আমার পছন্দ হয়েছে। খলিফা উমর আমাকেসহ দশজন ব্যক্তিকে সেনাপতির কাজে সহায়তার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি এখন ফিরে গিয়ে দশজনের সবাইকে নিয়ে আবার আপনার কাছে ফিরে আসব। তারাও যদি আমার মতো আপনার প্রস্তাব পছন্দ করেন, তাহলে আমাদের সেনাপতি সে অনুযায়ীই সিদ্ধান্ত নেবেন। আর যদি আপনার প্রস্তাব তাদের পছন্দ না হয়, তাহলে আমরা ফিরে যাব, আপনি আপনার করণীয় নির্ধারণ করবেন।'

আমর ইবনুল আস রাযি.-এর প্রস্তাব শুনে ধূর্ত আরতাবুন তখন খুশিতে আটখানা! তার সামনে তখন এক ঢিলে এক পাখি নয়, দশ পাখি শিকারের সুযোগ। এমন সুযোগ সে হেলায় হাতছাড়া করবে কেন?! আমর প্রত্যাবর্তনের পথ ধরতেই আরতাবুন তার এক অনুচরকে দ্রুত ওত পেতে থাকা গুপ্তঘাতককে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দেয়।[১০০]

আরতাবুনের নাগাল থেকে বেরিয়ে এসে আমর ইবনুল আস রাযি. তার পর্যবেক্ষণকে কাজে লাগিয়ে প্রতিপক্ষকে সহজেই পরাভূত করেন। রোমান সেনাপতি আরতাবুন পালিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসে চলে যায় এবং সেখানকার

---

১০০. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৩/৬০৫।

সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেয়। এরপর সে আমর ইবনুল আস রাযি.-এর কাছে এই চ্যালেঞ্জ-বার্তা পাঠায় যে, আপনি আজনাদাইনের পর ফিলিস্তিনের আর কোনো অংশেই বিজয় লাভ করতে পারবেন না।

ইলিয়া (বায়তুল মুকাদ্দাস) বিজয়

[রবিউস সানি, ষোড়শ হিজরি]
[মে, ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ]

এরপর আমর ইবনুল আস বায়তুল মুকাদ্দাস অবরোধ করেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের অবস্থান ফিলিস্তিনের দক্ষিণ অঞ্চলে পাহাড়ি এলাকায়। আল্লাহপ্রদত্ত সুরক্ষিত অবস্থানের কারণে প্রাকৃতিকভাবেই বায়তুল মুকাদ্দাস ছিল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের ন্যায়। আমর ইবনুল আস রাযি. তার প্রখর সামরিক দৃষ্টিবলে উপলব্ধি করেন যে, তার ক্ষুদ্র বাহিনীর পক্ষে বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করা সম্ভব নয়। তাই তিনি অতিরিক্ত সৈন্য প্রেরণের জন্য শাম অঞ্চলের মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন।

আবু উবায়দা রাযি. ততদিনে খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি.-কে সঙ্গে নিয়ে শামের পুরো উত্তরাঞ্চলে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি এবার খালিদকে নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন।

বায়তুল মুকাদ্দাসে পৌঁছে আবু উবায়দা রাযি. সেখানকার অধিবাসীদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে জানমালের নিরাপত্তার বিনিময়ে তাদেরকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দেন। প্রথমে তারা তার প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। আবু উবায়দা রাযি. তখন আরও কঠিন অবরোধ আরোপ করেন এবং বাইরে থেকে রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। অবরুদ্ধ বায়তুল মুকাদ্দাস বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইলিয়াবাসী মাঝেমধ্যেই নগরীর বাইরে বেরিয়ে এসে হামলা চালালেও খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ও ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাভূত করে।

ধীরে ধীরে ইলিয়াবাসীর প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হতে থাকে। একসময় তারা উপলব্ধি করে যে, তাদের পক্ষে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে থাকা সম্ভব নয় আর আবু উবায়দাও ইলিয়া জয় না করে ফিরবেন না। তখন তারা আবু উবায়দা রাযি.-এর কাছে বার্তা পাঠায় যে, আমরা

আপনাদের সঙ্গে সন্ধি করতে চাই। আপনি দয়া করে আপনাদের খলিফা উমরকে বার্তা পাঠান যে, তিনি যেন সশরীরে বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হয়ে আমাদের সঙ্গে চুক্তি করেন এবং আমাদেরকে নিরাপত্তানামা প্রদান করেন।

আবু উবায়দা রাযি. বিশিষ্ট ফকিহ সাহাবি মুআয রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন না। মুআয রাযি.-কে কিছুদিন পূর্বেই তিনি জর্ডানে পাঠিয়েছিলেন। ইলিয়াবাসীর প্রস্তাব পাওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তিনি মুআয রাযি.-কে তলব করেন। মুআয রাযি. উপস্থিত হলে তিনি তার সঙ্গে ইলিয়াবাসীর প্রস্তাবের বিষয়ে পরামর্শ করেন। মুআয রাযি. তাকে বলেন, 'আপনার বার্তা পেয়ে হয়তো খলিফাতুল মুসলিমিন কষ্ট করে এত দূরের পথ পাড়ি দিয়ে এখানে উপস্থিত হবেন। কিন্তু এরপর যদি ইলিয়াবাসী সন্ধিচুক্তি করতে অস্বীকার করে বসে, তাহলে খলিফার এত কষ্টের সফর ফলদায়ক হবে না। সুতরাং আপনি আগে ইলিয়াবাসীকে দৃঢ়তার সঙ্গে শপথ করে বলতে বলুন যে, খলিফা উপস্থিত হয়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করলে তারা অবশ্যই জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করবে।' মুআয রাযি.-এর পরামর্শমতো আবু উবায়দা রাযি. ইলিয়াবাসীর কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করেন; এরপর বার্তা পাঠিয়ে খলিফাকে বিস্তারিত অবহিত করার পাশাপাশি বায়তুল মুকাদ্দাসে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানান।

আবু উবায়দা রাযি.-এর বার্তা পাওয়ার পর খলিফা উমর রাযি. তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং শেষ পর্যন্ত বায়তুল মুকাদ্দাস গমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট দিন উল্লেখ করে শামে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিদেরকে সেদিন জাবিয়ায় উপস্থিত থাকার নির্দেশ প্রদান করেন।

সেনাপতিগণ নির্দিষ্ট দিন নির্ধারিত স্থানে খলিফাতুল মুসলিমিনকে স্বাগত জানাতে সমবেত হয়। সেই মহান খলিফা, যার নাম ও খ্যাতি, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছে আরব ভূখণ্ড ছাড়িয়ে রোমান সাম্রাজ্যে ও পারস্য ভূমিতে। মহান খলিফা একটি উটের পিঠে চড়ে জাবিয়ায় উপস্থিত হন। শামের মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ খলিফাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসেন। খলিফা যখন কাছাকাছি চলে আসেন, তখন পথে ছোট একটি পানির নালা পড়ে। তিনি উট থেকে

নেমে পড়েন এবং পাদুকাদ্বয় খুলে হাতে নিয়ে উটসহ পানিতে নেমে যান। এ সময় আবু উবায়দা রাযি. খলিফাকে বলেন, 'নগরবাসীর সামনে তো আপনি বড় বেমানান কাজ করলেন!' খলিফা তখন আবু উবায়দার বুকে মৃদু আঘাত করে বলেন, 'আবু উবায়দা, আহ! তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এ কথা বলত! আমরা ছিলাম সবচেয়ে লাঞ্ছিত, সবচেয়ে তুচ্ছ ও সংখ্যায় সবচেয়ে নগণ্য জাতি। অনন্তর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে মর্যাদাশীল করেছেন। সুতরাং ইসলাম ব্যতীত যেখানেই আমরা মর্যাদা ও সম্মান খুঁজব, আল্লাহ আমাদের লাঞ্ছিত করবেন।'

সেনাপতিগণ খলিফার পরিধানের জন্য শুভ্র পরিচ্ছদ এবং আরোহণের জন্য একটি আকর্ষণীয় তুর্কি ঘোড়াও নিয়ে এসেছিল। কিন্তু উমর রাযি. সফরের ধূলিমলিন পোশাকে নিজ উটে চড়েই সকলের সঙ্গে বায়তুল মুকাদ্দাস অভিমুখে রওনা হন।

খলিফার আগমনের সংবাদ পেয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিশপ (গির্জাধ্যক্ষ) অন্যান্য সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকদের সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। তারা আবু উবায়দা রাযি.-কে অনুরোধ করে যে, খলিফা যেন সবাইকে রেখে একা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আবু উবায়দা রাযি. খলিফাকে গির্জাধ্যক্ষের দাবি জানালে তিনি তৎক্ষণাৎ একাই অগ্রসর হতে উদ্যত হন। তখন উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম তাকে বলেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনি এভাবে একাকী যুদ্ধাস্ত্র ছাড়াই তাদের কাছে যাচ্ছেন! আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা আপনার সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে।' উত্তরে খলিফা উমর রাযি. বলেন—

﴿قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلٰىنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ﴾

> বলে দাও, আল্লাহ আমাদের তাকদিরে যে কষ্ট লিখে রেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো কষ্ট কিছুতেই আমাদেরকে স্পর্শ করবে না। তিনিই আমাদের অভিভাবক। আর আল্লাহর ওপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। [সুরা তাওবা : ৫১]

এরপর খলিফা আবু উবায়দাকে সঙ্গে নিয়ে খ্রিষ্টান নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। গির্জাধ্যক্ষ খলিফা উমর রাযি.-কে দেখেই বলে ওঠেন, 'পবিত্র

গ্রন্থে এই নগরীর যে বিজেতার বিবরণ দেওয়া আছে, তিনিই সেই ব্যক্তি।' এরপর গির্জাধ্যক্ষ ইলিয়াবাসীকে আত্মসমর্পণ করার এবং সন্ধিচুক্তি করার নির্দেশ দেন।

একটি ঐতিহাসিক চুক্তিপত্র

এরপর নগরীর চাবি বুঝে নিতে খলিফা উমর রাযি. নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। খলিফা সেখানে সন্ধিচুক্তির শর্তসমূহ উল্লেখপূর্বক একটি চুক্তিপত্র লেখান। চুক্তিপত্রে লেখা ছিল—

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
>
> এটি আল্লাহর বান্দা আমিরুল মুমিনিন উমরের পক্ষ থেকে ইলিয়াবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তা-অঙ্গীকারনামা। তাদেরকে তাদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সুস্থ-অসুস্থ ও সকল ধর্মের অনুসারী নাগরিক এই নিরাপত্তা লাভ করবে। তাদের গির্জা ও ক্রুশ প্রতীকও এই নিরাপত্তার অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের গির্জাগুলো কেউ (কোনো মুসলমান) বসবাসের জন্য ব্যবহার করতে পারবে না, ভাঙতেও পারবে না। তাদের নির্মিত ভবন ও জমিজমায় কোনোপ্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না। তাদের ক্রুশ প্রতীক ও সম্পদেও কোনো হস্তক্ষেপ করা হবে না। ধর্মীয় বিষয়ে তাদের ওপর কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করা হবে না এবং কারও কোনো ক্ষতি করা হবে না। ইলিয়াতে তাদের সঙ্গে কোনো ইহুদি বসবাস করতে পারবে না।
>
> অন্যান্য নগরীর অধিবাসীদের মতো ইলিয়াবাসীরও জিজিয়া আদায় করতে হবে। তাদের আরও কর্তব্য হলো, তারা রোমানদেরকে এবং চোর-ডাকাতদেরকে নগরী থেকে বের করে দেবে। ইলিয়াবাসী কেউ এখান থেকে নিজের ধনসম্পদসহ চলে যেতে চাইলে সে নিজের কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত তার নিরাপত্তা বহাল থাকবে। একইভাবে বাইরের কেউ যদি ইলিয়ায় বসবাস করতে চায়, তাহলে তাকেও নিরাপত্তা প্রদান করা হবে এবং তারও জিজিয়া প্রদান করতে হবে। ইলিয়াবাসী কেউ নিজের জানমাল, ক্রুশ ও অন্যান্য ধর্মীয় জিনিসপত্র নিয়ে রোমানদের কাছে চলে যেতে চাইলে তাকেও তার

আসবাবপত্রসহ আপন স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

(অমুকের হত্যার) পূর্ব থেকেই যারা ইলিয়ায় কৃষিক্ষেতের মালিক, তারা চাইলে এখানে থেকে যেতে পারবে (সে ক্ষেত্রে তাদের ইলিয়াবাসীর সমপরিমাণ জিজিয়া প্রদান করতে হবে), চাইলে রোমানদের সঙ্গে চলে যেতেও পারবে, আবার চাইলে নিজ পরিজনের কাছেও ফিরে যেতে পারবে। ফসল কাটার পূর্ব পর্যন্ত তাদের কোনো কিছু প্রদান করতে হবে না।

এই অঙ্গীকারপত্রের প্রতিটি বিষয়ে আল্লাহ, তার রাসুল, খলিফাগণ ও মুমিনগণ জিম্মাদার; শর্ত হলো ইলিয়াবাসী আরোপিত জিজিয়া ঠিকভাবে প্রদান করবে।

— উমর ইবনুল খাত্তাব

সন্ধিপত্রটি লেখেন মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. আর সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি., আমর ইবনুল আস রাযি. ও আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি.। ষোড়শ হিজরি সন. মোতাবেক ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে চুক্তিপত্রটি লিখিত হয়।

ঐতিহাসিক এই চুক্তিপত্রটি আজও বায়তুল মুকাদ্দাসের আল-কিয়ামা গির্জায় (The Church of the Holy Sepulchre) সংরক্ষিত আছে। ইতিহাস সাক্ষী, তখন থেকে নিয়ে যতদিন বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হাতে ছিল, সেই ষোড়শ হিজরি সন (৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ) থেকে নিয়ে ইংরেজদের হাতে ১৩৩৬ হিজরি সনে (১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে) উসমানি খিলাফতের নিয়ন্ত্রণাধীন আল-কুদসের পতনকাল পর্যন্ত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলমানরা চুক্তির প্রতিটি শর্ত অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছিল।

চুক্তিপত্র লেখা শেষ হওয়ার পূর্বেই নামাজের সময় হয়ে যায়। উপস্থিত খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতা উমর রাযি.-কে আল-কিয়ামা গির্জাতেই নামাজ আদায় করে নিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা তাতে অসম্মতি প্রকাশ করে বলেন, আমার আশঙ্কা হয়, আমি যদি এখানে নামাজ আদায় করি, ভবিষ্যতে মুসলমানগণ এই যুক্তিতে গির্জাটির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে যে, আমিরুল মুমিনিন এখানে নামাজ আদায় করেছেন।

এরপর খলিফা উমর রাযি. খ্রিষ্টান যাজকদের জিজ্ঞেস করে মসজিদুল আকসা খুঁজে বের করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে বিরান পড়ে থাকা মসজিদুল আকসা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। পরদিন খলিফার নির্দেশে হজরত বিলাল রাযি. সেখানে ফজরের আজান দেন এবং সকলে খলিফার ইমামতিতে ফজর নামাজ আদায় করেন।

এই সন্ধিচুক্তির ফলে আল-কুদসবাসী নিরাপত্তা লাভ করে। মুসলমানদের প্রদত্ত নিরাপত্তায় আল-কুদসবাসী আনন্দিত হয়। আরতাবুন ও সন্ধিবিরোধীরা সুযোগ পেয়ে নিরাপদে আল-কুদস থেকে বেরিয়ে যায় এবং মিশরে জড়ো হতে থাকা রোমান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

এই সন্ধিচুক্তির ফলে আল-কুদস বা বায়তুল মুকাদ্দাস একটি ইসলামি প্রদেশে পরিণত হয় এবং মুসলিম গভর্নরদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতে থাকে। মুসলিম গভর্নরগণ পবিত্র বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্রতা ও মর্যাদা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত খ্রিষ্টান তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে অত্যন্ত উদার ও কোমল আচরণ করতেন। কালের পরিক্রমায় ৪৯২ হিজরি সনে (১০৯৯ খ্রিষ্টাব্দে) ক্রুসেড আগ্রাসনের পর ইউরোপের খ্রিষ্টান যোদ্ধারা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে এবং যিশুখ্রিষ্টের (নবী ঈসা আ.-এর) নাম নিয়ে নৃশংসভাবে মুসলমানদের পাইকারি হত্যা করে। দীর্ঘকাল বায়তুল মুকাদ্দাস খ্রিষ্টানদের দখলে থাকার পর ৫৮৩ হিজরি সনের ২৭ রজব (১১৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর) মহাবীর সালাহউদ্দিন আইয়ুবি রহ. বায়তুল মুকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন। যথাস্থানে আমরা এর বিস্তারিত বিবরণ পাঠ করব, ইনশাআল্লাহ।

জাযিরা অঞ্চল বিজয়

[সপ্তদশ হিজরি]

সপ্তদশ হিজরি সনে জাযিরা অঞ্চলের[১০১] অধিবাসীরা রোমানদের সঙ্গে একজোট হয়ে হিমসে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত

---

১০১. **জাযিরা** : 'আল-জাযিরাতুল ফুরাতিয়া' বা সংক্ষেপে 'জাযিরা' একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম। অঞ্চলটির সীমানা পূর্ব দিকে (পশ্চিম ইরানের) জাগ্রোস পর্বতমালা (The Zagros Mountains) পর্যন্ত, উত্তরে (দক্ষিণ তুরস্কের) তোরোস পর্বতমালা (The Taurus Mountains) এবং দক্ষিণে শামের সামাওয়া মরুভূমি (The Syrian Desert) ও (ইরাকের) থার্চার হ্রদ (Lake Tharthar) পর্যন্ত। বর্তমান সিরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ,=

নেয়। আবু উবায়দা রাযি. বিষয়টি জানতে পেরে নিকটবর্তী সকল মুসলিম রেজিমেন্টকে হিমসে সমবেত হতে নির্দেশ দেন। হিমসের উপকণ্ঠে মুসলিম বাহিনী শিবির স্থাপন করে। আবু উবায়দা রাযি. সকল সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়ে রোমানদের ওপর আক্রমণ করার পরিবর্তে হিমসেই সুরক্ষিত অবস্থান গ্রহণ করবে। এরপর তিনি খলিফা উমর রাযি.-এর কাছে বার্তা পাঠিয়ে রোমানদের সৈন্যসমাবেশ ও নিজেদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবগত করেন। আবু উবায়দার বার্তা পেয়েই খলিফা উমর রাযি. কুফার গভর্নর সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-এর কাছে বার্তা পাঠান যে, তুমি আমার এই বার্তা পাওয়ামাত্র কা'কা' বিন আমরের নেতৃত্বে একটি বাহিনী হিমসে প্রেরণ করবে। সেখানে আবু উবায়দা অবরুদ্ধ হয়ে পড়তে যাচ্ছে। খলিফা সাদকে আরও লেখেন—

> 'সুহায়ল বিন আদিকে একটি বাহিনীসহ জাযিরা অঞ্চলের রাক্কায় পাঠাবে। কারণ, জাযিরাবাসীই রোমানদেরকে হিমসে আক্রমণ করতে প্ররোচিত করেছে। আর আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ইতবানকে নুসায়বিনে পাঠাবে। কারণ, সেখানকার অধিবাসীদেরও এ ক্ষেত্রে ভূমিকা আছে। তারা দুজন যেন রাক্কা ও নুসায়বিনে অভিযান শেষে হাররান ও এডেসা[১০২] এলাকায়ও অভিযান পরিচালনা করে। ওয়ালিদ বিন উকবাকে জাযিরা অঞ্চলে রাবিয়া ও তানুখ গোত্রের উদ্দেশে প্রেরণ করবে। আর ইয়ায বিন গুনমকেও পাঠাবে। যদি জাযিরা অঞ্চলে যুদ্ধপরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তাহলে ইয়াযই সকলের নেতৃত্ব দেবে।'

খলিফার বার্তা যেদিন কুফায় পৌঁছায়, সেদিনই কা'কা' বিন আমর রাযি. চার হাজার সৈন্য নিয়ে হিমস অভিমুখে রওনা হয়ে যান। ইয়ায বিন গুনম রাযি.-সহ অন্যান্য সেনাপতিগণও জাযিরার বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা

=ইরাকের উত্তর-পশ্চিম অংশ এবং তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইংরেজিতে অঞ্চলটিকে Upper Mesopotamia (মেসোপটেমিয়া উচ্চভূমি) বলা হয়।

১০২. এডেসা : আরবি নাম الرها (রুহা)। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত এডেসা নগরী দেশটির উরফা প্রদেশ (Şanlıurfa Province)-এর রাজধানী। বর্তমানে নগরীটি উরফা (Urfa) নামে পরিচিত।

হন। স্বয়ং খলিফাও আবু উবায়দা রাযি.-কে সহায়তা করতে মদিনা হতে শাম অভিমুখে রওনা হন।

জাযিরা অঞ্চলের অধিবাসীরা কুফা থেকে মুসলিম বাহিনীর রওনা হওয়ার সংবাদ পেয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং রোমানদের সহায়তা করার পরিবর্তে নিজ নিজ এলাকায় ফিরে যায়। আবু উবায়দা রাযি. যখন জানতে পারেন যে, জাযিরাবাসী রোমান বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, তখন তিনি খালিদ রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং হিমসে অবস্থানের পরিবর্তে সামনে অগ্রসর হয়ে রোমানদের ওপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম বাহিনী রোমানদের মুখোমুখি হলে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের বিজয় দান করেন।

কা'কা' বিন আমর রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন কুফার বাহিনী যুদ্ধ শেষ হওয়ার তিন দিন পর হিমসে পৌঁছায়। আবু উবায়দা রাযি. মুসলিম বাহিনীর বিজয় ও কুফার বাহিনীর পৌঁছার সংবাদ জানিয়ে আমিরুল মুমিনিন উমর রাযি.-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। খলিফা ততক্ষণে জাবিয়ায় পৌঁছেছিলেন। তিনি ফিরতি বার্তায় কুফার বাহিনীকেও গনিমতে শরিক করার জন্য আবু উবায়দা রাযি.-কে নির্দেশ দেন।

ওদিকে সুহায়ল বিন আদি রাযি.-এর বাহিনী রাক্কা অবরোধ করলে রাক্কাবাসী সন্ধি করে। আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ইতবান রাযি. নুসায়বিন অবরোধ করলে নুসায়বিনবাসীও সন্ধি করে। এরপর ইয়ায বিন গুনম রাযি. তাদের দুজনের বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন এবং পথিমধ্যে বিভিন্ন এলাকা জয় করে হাররানে পৌঁছান। অবরুদ্ধ হাররানবাসীও আত্মসমর্পণ করে। এভাবে পুরো জাযিরা অঞ্চল যুদ্ধ ব্যতিরেকে সন্ধির মাধ্যমে বিজিত হয়।

মিশর-বিজয়

[রবিউল আউয়াল, ২০ হিজরি]
[ফেব্রুয়ারি, ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ]

মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয়াভিযান সম্পন্ন হওয়ার পরই আমর ইবনুল আস রাযি. খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-

এর কাছে মিশরে[১০৩] বিজয়াভিযান পরিচালনার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে উমর রাযি. তখন তাকে অনুমতি দেননি। পরবর্তী সময়ে খলিফা এ বিষয়ে আশ্বস্ত হন এবং আমর ইবনুল আস রাযি.-কে অভিযান শুরুর অনুমতি প্রদান করেন।

মিশর-বিজয় সম্পর্কিত নবীজির যে হাদিসটি উমর রাযি.-এর জানা ছিল, তা-ও তাকে এ অভিযানের অনুমতিদানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। উমর রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন—

«إِذَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ مِصْرَ فَاتَّخِذُوْا فِيْهَا جُنْدًا كَثِيْفًا، فَذٰلِكَ الْجُنْدُ خَيْرُ أَجْنَادِ الْأَرْضِ».

> আল্লাহ যখন তোমাদের জন্য মিশরকে উন্মুক্ত করে দেবেন, তখন তোমরা সেখানে বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটাবে। কেননা, তারাই হবে ভূপৃষ্ঠের শ্রেষ্ঠতম সেনাদল।

এ কথা শুনে আবু বকর সিদ্দিক প্রশ্ন করেন, কেন, হে আল্লাহর রাসুল? নবীজি উত্তর দেন—

«لِأَنَّهُمْ وَأَزْوَاجَهُمْ فِيْ رِبَاطٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

---

১০৩. **মিশর পরিচিতি :** মানবজাতির ইতিহাসে অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা হচ্ছে মিশরকেন্দ্রিক সভ্যতা। মিশরের অবস্থান আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে। অবশ্য মিশরের সিনাই উপদ্বীপ অংশটুকু এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত। বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনে থাকার পর ডিক্টেটর জুলিয়াস সিজারের আমলে (শাসনকাল : খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯-৪৪ সন) মিশর রোমানদের অধিকারে আসে। সুপ্রাচীন সভ্যতা ও জ্ঞানে-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মিশর রোমানদের হাতে আসার পর তারা এর উন্নতিতে মোটেও নজর দেয়নি। রোমান রাজপরিবারের কাছে মিশর ছিল রাষ্ট্রযন্ত্রের চাহিদা পূরণে একটি শস্য-ঝুড়িমাত্র! রোমান সম্রাট তার একজন প্রতিনিধিকে গভর্নর হিসেবে মিশরে প্রেরণ করতেন আর উক্ত গভর্নর আলেকজান্দ্রিয়ায় অবস্থান করে পুরো মিশরের আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি দেখাশোনা করত। গভর্নরকে সরাসরি রোমান সম্রাটের কাছে আর্থিক হিসাব প্রদান করতে হতো। গভর্নরদের মেয়াদ হতো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। তাই তারা মিশরের উন্নতির চিন্তা বাদ দিয়ে নিজেদের আখের গোছানোতেই বেশি ব্যস্ত থাকত। মিশরের জনগণকেও নিজেদের অঞ্চলের উন্নয়নে কাজ করার বা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না। এসব কারণে জনগণ মাঝেমধ্যেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠত এবং বিদ্রোহের চেষ্টা করত। তখন মিশরের বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়োজিত রোমান বাহিনী তাদেরকে কঠোরভাবে দমন করত। রোমান শাসনে থাকা অবস্থায়ই মিশরে খ্রিষ্টধর্ম প্রসার লাভ করে।

কারণ, তারা ও তাদের সহধর্মিণীগণ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত (ইসলামের সীমান্ত) প্রহরায় থাকবে।[১০৪]

আরেক হাদিসে আছে, নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«إِذَا افْتَتَحْتُمْ مِصْرَ فَاسْتَوْصُوْا بِالْقِبْطِ خَيْرًا؛ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا»

যখন তোমরা মিশর জয় করবে, তখন কিবতিদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। কেননা, তোমাদের সঙ্গে তাদের আত্মীয়তার বন্ধন ও অধিকার রয়েছে।[১০৫]

অধিকার দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে মিশর-অধিপতি মুকাওকিস কর্তৃক নবীজিকে প্রদত্ত হাদিয়া মারিয়া কিবতিয়া রাযি.-এর দিকে (কারণ, হাদিয়া প্রেরণের মাধ্যমে এক ধরনের অধিকার জন্মে)।[১০৬]

খলিফার অনুমতি পেয়ে আমর ইবনুল আস রাযি. চার হাজার সৈন্য নিয়ে মিশর অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। তিনি প্রথমে ফিলিস্তিন থেকে রাফাহ (Rafah) অঞ্চলে পৌঁছান। এরপর সেখান থেকে নিম্নভূমি ধরে পথ চলতে থাকেন এবং আরিশে পৌঁছান। আরিশ থেকে রওনা হয়ে আমর ইবনুল আস রাযি. পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং ফারামা (Pelusium) দুর্গে পৌঁছান। মিশরভূমিতে এই ফারামা দুর্গেই রোমানদের সঙ্গে মুসলমানদের প্রথম লড়াই হয়। এক মাস দীর্ঘ এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। দুর্গটিতে রোমানদের বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ ছিল। ভবিষ্যতে যেন রোমানরা সেগুলো মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে না পারে, এজন্য সেগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়।

এরপর মিশর অভিমুখে মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে এবং মুসলিম বাহিনী বিলবিস দুর্গে পৌঁছায়। এ দুর্গে রোমান সেনাপতি আরতাবুন বিশাল এক বাহিনী নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মুসলিম বাহিনী এক মাস দুর্গটি অবরোধ করে রাখার পর আল্লাহর অনুগ্রহে দুর্গটি বিজিত হয় এবং দুর্ধর্ষ রোমান সেনাপতি আরতাবুন নিহত হয়।

---

১০৪. আলাউদ্দিন আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানজুল উম্মাল*, হাদিস নং ৩৮২৬২।

১০৫. তাবারানি, *আল-মুজামুল কাবির*, হাদিস নং ১১২।

১০৬. আত্মীয়তার বন্ধন দ্বারা মারিয়া কিবতিয়া রাযি.-এর বিষয়টিও উদ্দেশ্য হতে পারে, আবার ইবরাহিম আ.-এর স্ত্রী হাজেরা-এর দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে।

এরপর মুসলিম বাহিনী সামনে অগ্রসর হয়ে ব্যাবিলন দুর্গের উত্তরে অবস্থিত উম্মে দুনায়ন দুর্গে পৌঁছায়। এখানেও রোমান বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে বাধা প্রদান করলে যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং প্রচুর রোমান সৈন্য নিহত হয়। উম্মে দুনায়নে অভিযান চলাকালে আমর রাযি.-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে খলিফা উমর রাযি. আরও চার হাজার সৈন্য মিশরে প্রেরণ করেন। ফলে মিশরে অভিযান পরিচালনাকারী বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় আট হাজার।

রোমান নেতৃবৃন্দের ধারণা ছিল, এরপর আমর ইবনুল আস রাযি. সরাসরি ব্যাবিলন দুর্গের দিকে অগ্রসর হবেন। কিন্তু তাদের ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে তিনি তার বাহিনী নিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং নীল নদ পাড়ি দেন। হয়তো তিনি শত্রুপক্ষকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি তাদের বাদ দিয়ে অন্য কোনো প্রতিপক্ষের মোকাবিলা করতে চাচ্ছেন। এরপর শত্রুপক্ষকে আরও বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি দক্ষিণে ফাইয়ুমের দিকে অগ্রসর হন। ফাইয়ুমের দিকে পথ চলতেই আমর সংবাদ পান, সেখানে রোমানরা বিশাল সৈন্য সমাবেশ ঘটিয়েছে। তখন আমর তার বাহিনী নিয়ে মরুভূমিতেই অবস্থান করেন এবং সৈন্যদের কিছুটা বিশ্রামের সুযোগ করে দেন। এর ফাঁকে তিনি অতিরিক্ত সৈন্য সরবরাহের জন্য খলিফার কাছে বার্তা প্রেরণ করেন।

খলিফা উমর রাযি. আমর ইবনুল আস রাযি.-এর সাহায্যার্থে আরও চার হাজার সৈন্য প্রেরণ করেন এবং প্রেরিত বার্তায় তাকে লেখেন, 'আমি তোমার সহায়তার আরও চার হাজার সৈন্য পাঠালাম। প্রতি এক হাজারের নেতৃত্বে আছেন এমন একেকজন সেনাপতি, যারা প্রত্যেকে হাজারজনের সমতুল্য।'

হজরত উমরের প্রেরিত এই চার সেনাপতি হলেন—মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রাযি., উবাদা বিন ছামিত রাযি., যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি. ও মাসলামা বিন মুখাল্লাদ আল-আনসারি রাযি.।

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ হলেন সেই মহান সাহাবি, যিনি বদর যুদ্ধের দিন নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনার প্রতিপালক আপনাকে যে আদেশ করেছেন, আপনি তার ওপর অবিচল থাকুন। আমরা আপনার সঙ্গে আছি। আল্লাহর শপথ! বনি ইসরাইল মুসা আ.-কে যেমন জবাব

দিয়েছিল, আমরা আপনাকে সেরূপ জবাব দেবো না। তারা বলেছিল, মুসা, তুমি ও তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ করো। আমরা এখানেই বসে থাকব। বরং আমরা বলব, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি ও আপনার রব যুদ্ধ করুন; আমরাও আপনাদের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করব। ওই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন-সহ প্রেরণ করেছেন! আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে বারকুল গিমাদ পর্যন্তও অগ্রসর হন, আমরা আপনার সঙ্গেই থাকব।

নবীজি তার কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন এবং তার জন্য দোয়া করেছিলেন।

উবাদা বিন ছামিত রাযি. হলেন সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবিদের একজন, যারা নবীজির জীবদ্দশায় কুরআন সংকলন করেছিলেন।

যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি. হলেন নবীজির নিকটাত্মীয় ও সার্বক্ষণিক সহচর।

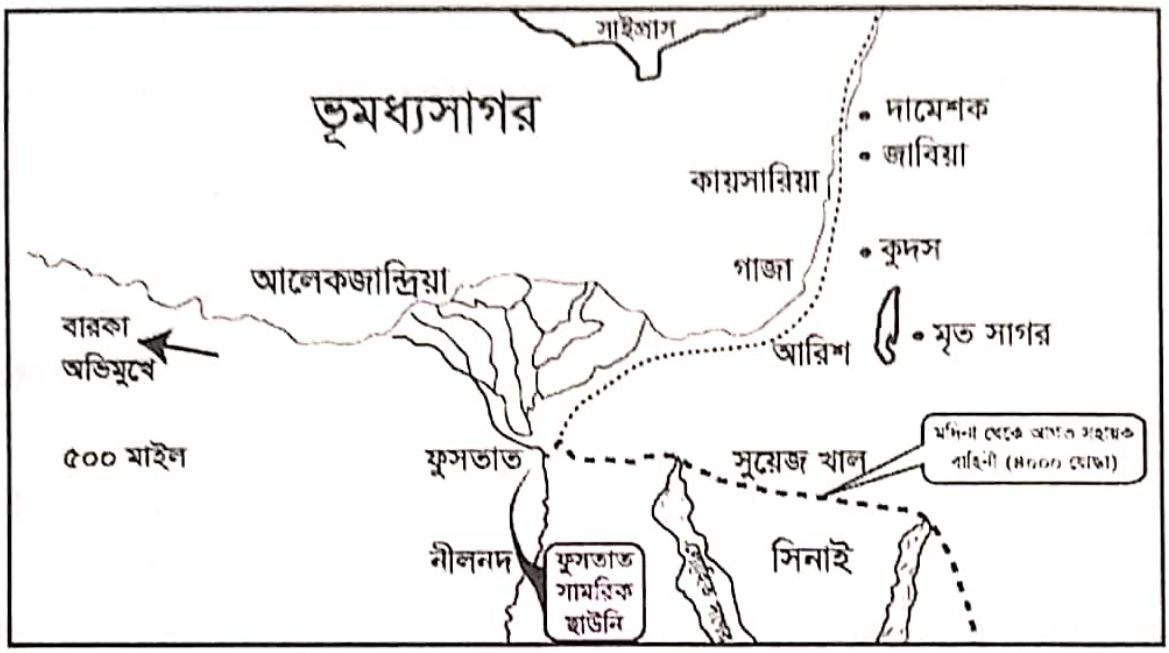
আর মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রাযি. হলেন সেই মহান সাহাবি, যার সম্পর্কে তার সমসাময়িক বিশিষ্ট তাবেয়ি ও ইমামুত তাফসির মুজাহিদ রহ. বলেছেন, আমি মনে করতাম যে, আমিই কুরআনের সবচেয়ে ভালো হাফেজ। (কিন্তু) একদিন আমি মাসলামা বিন মুখাল্লাদ রাযি.-এর পেছনে নামাজ পড়লাম। তিনি পুরো সুরা বাকারা তেলাওয়াত করলেন; কিন্তু কোথাও আলিফ-ওয়াও বা অন্য কিছুর ভুল করলেন না।

তারাই হলেন সেই বাহিনীর বিভিন্ন অংশের সেনাপতি, যারা মিশর জয় করতে যাচ্ছেন। প্রত্যেকেই পবিত্র কুরআনের বাহক, প্রত্যেকেই দ্বীনের বিভিন্ন অঙ্গনে অত্যুচ্চ কীর্তিগুণের অধিকারী। তারা কিন্তু তাদের মর্যাদা ও কুরআন-ধারণের বরকত সঙ্গে নিয়েই বসে থাকেননি, বসে থাকেননি নবীযুগে নবীজির সঙ্গী হয়ে দ্বীনের বিভিন্ন অঙ্গনে নানা কীর্তি আঞ্জাম দিয়ে; বরং জীবনের শেষ নিশ্বাসটি ত্যাগ করা পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছেন কর্মধারা, অনাগত উম্মাহর জন্য রেখে গেছেন কীর্তি-অবদান। তারাই মহান মিশরবিজেতা। আমাদের প্রতি, মিশরবাসী ও মুসলিম উম্মাহর প্রতি তাদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু আমাদের মাঝে কজন জানে তাদের নাম, কজন জানে তাদের কীর্তি ও অবদান?!

সুতরাং হে প্রিয় পাঠক, হৃদয়ের পাতায় গেঁথে নিন মিশরবিজেতা এই মহান সাহাবিদের নাম, অধ্যয়ন করুন ও জানুন তাদের কীর্তি ও কর্মের

কথা: আপনার প্রতিবেশী ও সন্তানদের শোনান তাদের বিজয়ের গল্প। হয়তো তাদের মাঝ থেকেই বেরিয়ে আসবে এমন এক প্রজন্ম, যারা ফিরিয়ে আনবে দ্বীনের হারানো গৌরব, মুসলমানদের হৃত মর্যাদা।

সহায়ক বাহিনী যোগ দেওয়ায় এবার মিশরে মুসলিম বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বারো হাজারে পৌঁছায়।



মানচিত্র নং-২

মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়

পথিমধ্যে আইনে শামসে ঝটিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সহায়ক বাহিনী পৌঁছার পর আমর বিন আস রাযি. ব্যাবিলন অভিমুখে রওনা হন এবং ব্যাবিলনে পৌঁছে নগরী অবরোধ করেন। অবরোধ এক মাস দীর্ঘায়ত হলে অবরুদ্ধ কিবতিরা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং (মিশর-অধিপতি) মুকাওকিস[১০৭] মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক আমর ইবনুল আসের কাছে নিম্নোক্ত বার্তা পাঠান—

> আপনারা আমাদের দেশে প্রবেশ করেছেন এবং আমাদেরকে যুদ্ধ করতে পীড়াপীড়ি করছেন। আমাদের দেশে আপনাদের অবস্থান দীর্ঘদিন হয়ে গেছে। রোমানরা তো ইতিমধ্যে আপনাদের কাছে চলে এসেছে এবং আপনাদের বিরুদ্ধে সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছে। সংখ্যা ও সরঞ্জাম উভয় দিক থেকে তাদের পূর্ণ প্রস্তুতি রয়েছে।

---

১০৭. পূর্বেও বলা হয়েছে, মুকাওকিস বিশেষ কোনো ব্যক্তির নাম ছিল না; বরং তৎকালীন মিশর-প্রশাসকদেরকে এই সম্মানসূচক উপাধিতে আহ্বান করা হতো।

এদিকে নীল নদ আপনাদের ঘিরে আছে। প্রকৃত অর্থে আপনারা আমাদের হাতে বন্দি। সুতরাং (নিষ্কৃতি পেতে চাইলে) আপনি আপনার বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব। হতে পারে এর মাধ্যমে এমন কোনো সমাধান বের হয়ে আসবে, যা উভয় পক্ষের কাছেই সন্তোষজনক মনে হবে এবং রোমান বাহিনী আপনাদেরকে ঘিরে ফেলার পূর্বেই আমাদের পরস্পরের যুদ্ধপরিস্থিতির (রক্তপাতহীন) সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এর পূর্বেই যদি রোমান বাহিনী এসে পড়ে, তখন আলোচনা-সংলাপ কোনো কাজে আসবে না এবং আমরা তাদেরকে বাধাও দিতে পারব না। হয়তো পরিস্থিতি তখন আপনাদের প্রত্যাশা ও চাওয়ার বিপরীতে চলে যাবে আর আপনারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবেন। তাই শীঘ্রই আপনার প্রতিনিধিদল আমাদের কাছে পাঠান। আমরা তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করব, যা উভয় পক্ষের পছন্দ হবে।

মুকাওকিসের বার্তাবাহকগণ আমর ইবনুল আস রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে দুদিন নিজের কাছেই রাখেন। এরপর ফিরতি বার্তাসহ তাদেরকে মুকাওকিসের কাছে ফেরত পাঠান। বার্তায় লেখা ছিল—

আমাদের ও তোমাদের মাঝে কেবল তিনটি পথই খোলা আছে—১. তোমরা ইসলামগ্রহণ করবে; সে ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের ভাইয়ে পরিণত হবে এবং আমরা যে অধিকার ভোগ করি, তোমরাও তা ভোগ করবে। ২. আর যদি তোমরা ইসলামগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে হীনবল হয়ে আমাদেরকে জিজিয়া প্রদান করবে। ৩. আর এ দুটির একটিও তোমরা গ্রহণ না করলে আমরা অটলতা ও অবিচলতার সঙ্গে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাদের উভয় পক্ষের মাঝে কোনো ফয়সালা করেন। তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

দূতগণের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে পাঠ করার পর মুকাওকিস তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদেরকে কেমন দেখলে? বার্তাবাহকগণ জানান—

এদিকে নীল নদ আপনাদের ঘিরে আছে। প্রকৃত অর্থে আপনারা আমাদের হাতে বন্দি। সুতরাং (নিষ্কৃতি পেতে চাইলে) আপনি আপনার বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলব। হতে পারে এর মাধ্যমে এমন কোনো সমাধান বের হয়ে আসবে, যা উভয় পক্ষের কাছেই সন্তোষজনক মনে হবে এবং রোমান বাহিনী আপনাদেরকে ঘিরে ফেলার পূর্বেই আমাদের পরস্পরের যুদ্ধপরিস্থিতির (রক্তপাতহীন) সমাপ্তি ঘটবে। কিন্তু এর পূর্বেই যদি রোমান বাহিনী এসে পড়ে, তখন আলোচনা-সংলাপ কোনো কাজে আসবে না এবং আমরা তাদেরকে বাধাও দিতে পারব না। হয়তো পরিস্থিতি তখন আপনাদের প্রত্যাশা ও চাওয়ার বিপরীতে চলে যাবে আর আপনারা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হবেন। তাই শীঘ্রই আপনার প্রতিনিধিদল আমাদের কাছে পাঠান। আমরা তাদের সঙ্গে এমন আচরণই করব, যা উভয় পক্ষের পছন্দ হবে।

মুকাওকিসের বার্তাবাহকগণ আমর ইবনুল আস রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে দুদিন নিজের কাছেই রাখেন। এরপর ফিরতি বার্তাসহ তাদেরকে মুকাওকিসের কাছে ফেরত পাঠান। বার্তায় লেখা ছিল—

আমাদের ও তোমাদের মাঝে কেবল তিনটি পথই খোলা আছে—১. তোমরা ইসলামগ্রহণ করবে; সে ক্ষেত্রে তোমরা আমাদের ভাইয়ে পরিণত হবে এবং আমরা যে অধিকার ভোগ করি, তোমরাও তা ভোগ করবে। ২. আর যদি তোমরা ইসলামগ্রহণে অস্বীকৃতি জানাও, তাহলে হীনবল হয়ে আমাদেরকে জিজিয়া প্রদান করবে। ৩. আর এ দুটির একটিও তোমরা গ্রহণ না করলে আমরা অটলতা ও অবিচলতার সঙ্গে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা আমাদের উভয় পক্ষের মাঝে কোনো ফয়সালা করেন। তিনিই তো সর্বশ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী।

দূতগণের কাছ থেকে বার্তা নিয়ে পাঠ করার পর মুকাওকিস তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তাদেরকে কেমন দেখলে? বার্তাবাহকগণ জানান—

আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা জীবনের চেয়ে মৃত্যুকে অধিক ভালোবাসে। তাদের প্রত্যেকের কাছে অহংকারের চেয়ে বিনয় অধিক প্রিয়। দুনিয়ার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ বা কামনাই নেই। তারা (কোনো কিছু না বিছিয়েই) মাটির ওপর বসে আর বাহনজন্তুর ওপরই আহার সেরে নেয়। (চালচলনে ও আচার-আচরণে) তাদের সেনাপতি যেন সাধারণ সৈন্যদেরই মতো।

এরপর মুকাওকিস পুনরায় সমঝোতা-সংলাপের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিদল প্রেরণ করতে আমর ইবনুল আসকে পীড়াপীড়ি করেন। তখন আমর রাযি. উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর নেতৃত্বে তার বাহিনীর শ্রেষ্ঠতম দশজন সৈন্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। উবাদা রাযি. ছিলেন অত্যন্ত দীর্ঘদেহী ও বাদামি বর্ণবিশিষ্ট। প্রতিনিধিদল মুকাওকিসের দরবারে প্রবেশ করার পর সবাইকে পেছনে রেখে উবাদা রাযি. সামনে অগ্রসর হন। উবাদার কৃষ্ণবর্ণ দেখে মুকাওকিস ভয় পেয়ে যান এবং বলেন, 'এই কালো লোকটাকে আমার সামনে থেকে সরাও।'

তখন প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যগণ বলেন, 'এই কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিটিই আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী ও সঞ্চালক। আমাদের সেনাপতি তাকেই প্রতিনিধিদলের প্রধান নির্বাচিত করেছেন এবং আমাদেরকে তার মতের বিরোধিতা না করতে আদেশ করেছেন।' মুকাওকিস জিজ্ঞেস করেন, 'এমন কালো একজন ব্যক্তিকে কীভাবে তোমরা নিজেদের প্রধান হিসেবে মেনে নিলে?' উত্তরে তারা বলে, 'বর্ণের কোনো ভেদাভেদ আমাদের মাঝে নেই। আমাদের সমাজে কৃষ্ণবর্ণকে কোনো প্রকার ঘৃণা করা হয় না।'

এরপর মুকাওকিস উবাদাকে বলেন, 'এই কালো! সামনে এসো আর আমার সঙ্গে কোমল স্বরে কথা বলো। তোমার দেহবর্ণ আমাকে ভীত করে তুলেছে। এখন তোমার কণ্ঠস্বরও যদি কঠোর হয়, তাহলে তো আমার ভয় আরও বেড়ে যাবে।'

উত্তরে উবাদা রাযি. বলেন, 'তোমার কথা তো শুনলাম; তবে কথা হলো—আমি আমার যেসব সঙ্গীকে রেখে এসেছি, তাদের মাঝে এক হাজার তো এমন আছে, যারা আমার চেয়েও কালো এবং দেখতে আমার চেয়েও ভয়ংকর। আমাকে দেখে তুমি যে পরিমাণ ভীত হয়েছ, তাদেরকে দেখলে তো আরও ভীত হয়ে পড়তে।'

এরপর মুকাওকিস ও উবাদা রাযি.-এর মাঝে মূল বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা পূর্বের ন্যায় সুস্পষ্ট তিন-পথের কোনো একটি গ্রহণের শর্তে শেষ হয়। মুকাওকিস ও তার কওম প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো সমাধান গ্রহণের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

শত্রুপক্ষ মনে করেছিল, ব্যাবিলন দুর্গের অভ্যন্তরে তারা নিরাপদেই থাকবে। কারণ, দুর্গের প্রাচীরগুলো ছিল অনেক উঁচু আর পুরো দুর্গ পানির নালা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। প্রাচীরদ্বারগুলোও ছিল যথেষ্ট মজবুত; দুর্গের অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ রসদ ও খাদ্যদ্রব্যেরও ব্যবস্থা ছিল।

কিন্তু মুসলিম বাহিনী সমস্ত প্রতিকূলতা জয় করতে সক্ষম হয়। যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি. কয়েকজন দুঃসাহসী সৈনিককে সঙ্গে নিয়ে সাঁতরে পরিখা পার হন, এরপর প্রাচীর বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করে প্রাচীরদ্বার খুলে ফেলতে সক্ষম হন। এবার মুসলিম বাহিনী দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং দীর্ঘ সাত মাসের অবরোধের পর ব্যাবিলন দুর্গ জয় করে।

মুকাওকিসের সামনে তখন একটাই পথ—আত্মসমর্পণ। তিনি সন্ধির আবেদন করায় আমর ইবনুল আস রাযি. তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করেন। সন্ধিপত্রে লেখা হয়—

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
>
> এটি আমর ইবনুল আস কর্তৃক মিশরবাসীকে প্রদত্ত নিরাপত্তানামা। মিশরবাসীকে জলে-স্থলে সর্বত্র নিজেদের প্রাণের, ধনসম্পদের, গির্জা ও ক্রুশের এবং আপন ধর্ম পালনের নিরাপত্তা দেওয়া হলো। তাদের উল্লেখিত বিষয়সমূহে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না, কোনো প্রকার সুযোগ-সুবিধা হ্রাসও করা হবে না। নুবিয়াবাসী[১০৮] তাদের সঙ্গে বসবাস করবে না। মিশরের বাসিন্দাগণ এ সন্ধিপত্রের ভিত্তিতে জিজিয়া প্রদান করবে। রোমান সাম্রাজ্যের (অন্যান্য অঞ্চলের) বা নুবিয়াবাসীদের কেউ যদি নতুন করে সন্ধিনামায় অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, তাহলে অন্যরা যেরূপ জিজিয়া প্রদান করে, তাদেরও

---

১০৮. নুবিয়া : মিশরের দক্ষিণাঞ্চল ও সুদানের উত্তরাঞ্চল তথা নীলনদের পূর্ব তীরে অবস্থিত মিশরের আসওয়ান নগরী হতে সুদানের দক্ষিণ খুরতুম পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম নুবিয়া। আধুনিক সুদানের অধিকাংশ এলাকা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

> সেরূপ জিজিয়া প্রদান করতে হবে; অন্যরা যেরূপ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তারাও তা ভোগ করবে। দুর্গবাসীদের মধ্য হতে কেউ যদি এই সন্ধিনামা মানতে অস্বীকার করে এবং অন্যত্র চলে যেতে চায়, তাহলে তাকে তার কাঙ্ক্ষিত নিরাপদ স্থানে পৌঁছা পর্যন্ত নিরাপত্তা দেওয়া হবে। এ চুক্তিপত্রে লিখিত বিষয়াদির ওপর আল্লাহ তাআলার অঙ্গীকার আছে, আছে তার রাসুলের অঙ্গীকার, আমিরুল মুমিনিনের দায়িত্ব এবং সকল মুমিনের দায়িত্ব।

সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর-শেষে মুকাওকিস মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি.-কে বলেন, রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াস এই সন্ধিপত্র কিছুতেই মেনে নেবেন না। সুতরাং রোমানরা যা করবে, তার দায়ভার আমার ওপর বর্তাবে না। আমি ও আমার সঙ্গে যারা আছে, আমরা আপনার সঙ্গে কৃত চুক্তি বজায় রাখব। তবে রোমানদের বিষয়ে আমি দায়মুক্ত। আমর রাযি. তার কথায় সম্মতি প্রকাশ করেন।[১০৯]

---

১০৯. মুসলমানরা মিশর জয় করার পর সেখানকার অধিবাসীরা মুসলিম সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি.-কে জানায় যে, প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে নীলনদে একজন যুবতী নারীকে উৎসর্গ করা না হলে নীলনদ শুষ্ক থাকে এবং পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। আমর ইবনুল আস রাযি. একে কুসংস্কার বলে আখ্যায়িত করে মন্তব্য করেন, ইসলাম পূর্বের সকল কুসংস্কার বাতিল ঘোষণা করেছে। এরপর তিনি খলিফা উমর রাযি.-কে পত্রের মাধ্যমে বিষয়টি অবহিত করেন। খলিফা ফিরতি পত্রে আমরকে বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। আমি পত্রের সঙ্গে আরেকটি পত্র পাঠালাম। তুমি এটি নীলনদে নিক্ষেপ করবে। খলিফার নির্দেশ মোতাবেক সেনাপতি আমর ইবনুল আস খলিফার প্রেরিত পত্র নীলনদে নিক্ষেপ করলে সে রাতেই নীলনদের স্রোতধারা ষোলো হাত উঁচু হয়ে প্রবাহিত হতে থাকে। এরপর থেকে নীলনদ অদ্যাবধি বয়ে চলেছে এবং এই সত্যকেই উচ্চকিত কণ্ঠে ঘোষণা করে যাচ্ছে যে, ইসলাম সত্য আর যাবতীয় কুসংস্কার মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উমর রাযি. পত্রে হামদ ও ছানার পর লিখেছিলেন,

> হে নীলনদ, তুমি যদি নিজের পক্ষ থেকে নিজের ইচ্ছেমতো প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে তোমার প্রতি আমাদের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যদি তুমি একক ও মহাপরাক্রমশালী সত্তা আল্লাহর নির্দেশে প্রবাহিত হয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি—তিনি যেন তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।

দ্রষ্টব্য : ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৯৭।

আলেকজান্দ্রিয়া-বিজয়

[মুহাররম, ২১ হিজরি]
[ডিসেম্বর, ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ]

এরপর আমর ইবনুল আস রাযি. আলেকজান্দ্রিয়া জয়ের জন্য অভিযান পরিচালনার মনস্থ করেন। খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে অনুমতি চেয়ে বার্তা পাঠালে তিনি তাকে অনুমতি প্রদান করেন। ব্যাবিলন হতে আলেকজান্দ্রিয়ার পথ কিন্তু মোটেও সহজ ছিল না। পুরো পথজুড়ে স্থানে স্থানে রোমানদের বিভিন্ন দুর্গ ছিল। কিন্তু আমর রাযি. ও তার সঙ্গীগণ সকল বাধা জয় করে এ পথ পাড়ি দেন এবং আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছে তিন মাস মতান্তরে চৌদ্দ মাস নগরীটি অবরোধ করে রাখেন। সংবাদ জানতে পেরে খলিফা উমর রাযি. অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং আমর রাযি.-এর কাছে কড়া ভাষায় বার্তা পাঠান। পত্রে তিনি লেখেন, নিজেদের কৃত কোনো গুনাহের কারণেই তোমরা বিলম্বের শিকার হয়েছ। সুতরাং নিজেদের অবস্থা নিরীক্ষণ করো।

আলেকজান্দ্রিয়া ছিল রোমান সাম্রাজ্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। আর তাই মুসলিম বাহিনীর আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধের কথা জেনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'আলেকজান্দ্রিয়ার পতন হলে রোমান সাম্রাজ্যের আর কী থাকবে?!' এরপর তিনি বিশাল বাহিনী নিয়ে নিজে আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে যুদ্ধ করার মনস্থ করেন। কিন্তু সফরের প্রস্তুতি চলাকালেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এর ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে সামরিক সাহায্য সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। আলেকজান্দ্রিয়ার প্রতিরক্ষাকারীদের প্রতিরোধস্পৃহাও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মুসলমানদের হাতে আলেকজান্দ্রিয়া বিজিত হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি. খলিফার অনুমতি নিয়ে ব্যাবিলনের নিকটে ফুসতাত নগরী প্রতিষ্ঠা করেন।

মিশর ও আলেকজান্দ্রিয়া অভিযানে ত্যাগ ও কুরবানি এবং কীর্তি ও গৌরবের অনেক ঘটনাই ঘটে। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো—

১. সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি. তার মুক্ত ক্রীতদাস ওয়ারদানকে যুদ্ধের মূল ঝান্ডা প্রদান করেছিলেন আর নিজ পুত্র আবদুল্লাহ বিন আমর

রাযি.-কে বাহিনীর সম্মুখ অংশে রেখেছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে আবদুল্লাহ কঠিনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন এবং তার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। ক্ষত যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে, তখন তিনি ওয়ারদানকে বলেন, 'সামান্য পেছনে সরে যেতে পারলে আমি কিছুটা বিশ্রাম নিতে পারতাম।' ওয়ারদান তখন সামনে অগ্রসর হয়ে বলেন, 'বিশ্রাম খুঁজছ? বিশ্রাম তো পেছনে নয়, তোমার সামনে!'

ওয়ারদানের উত্তরে আবদুল্লাহ রাযি.-এর দেহ-মন আন্দোলিত হয়ে ওঠে। তিনি নবোদ্যমে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। এদিকে সেনাপতি আমর ইবনুল আস পুত্রের আহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তার জখমের অবস্থা জানতে জনৈক সৈন্যকে পাঠান। উক্ত সৈনিক আবদুল্লাহর কাছে পৌঁছলে তিনি তাকে নিম্নের পঙ্‌ক্তিটি শুনিয়ে দেন—

أَقُوْلُ لَهَا إِذَا جَشَأَتْ وَجَاشَتْ ۞ رُوَيْدَكِ تُحْمَدِيْ أَوْ تَسْتَرِيْحِيْ

তার অস্থিরতায়-উদ্বেলতায় বেবাক আমি; বলি, একটুখানি থামবে তুমি! তনু-মনে স্বস্তি নিয়ে প্রশংসিত হবে তুমি।

বার্তাবাহক ফিরে এসে আমর রাযি.-কে পুত্রের উত্তর শোনালে তিনি আনন্দিত হয়ে বলেন, 'হ্যাঁ, প্রকৃতই সে আমার ছেলে।'

২. মহান আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় সমাপ্ত হওয়ার পর সেনাপতি আমর ইবনুল আস রাযি. খলিফার কাছে বিজয়বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তাবাহক মুয়াবিয়া বিন খুদায়জ রাযি. এ সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণীতে বলেন—দ্বিপ্রহরের সময় আমি মদিনায় পৌঁছলাম। মসজিদে নববির দরজার সঙ্গে বাহনজন্তু বেঁধে আমি মসজিদে বসলাম। এরইমধ্যে খলিফার ঘর থেকে একজন দাসী বেরিয়ে এলো। আমাকে সফরের ধূলিমলিন পোশাকে দেখে সে কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে?' আমি বললাম, 'আমি আমর ইবনুল আসের বার্তাবাহক মুয়াবিয়া বিন খুদায়জ।' আমার উত্তর শুনে সে ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে দ্রুতপদে আবার ফিরে এলো। আমি তার পায়ের সঙ্গে কাপড়ের ঘর্ষণের শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। আমার কাছে এসে সে বলল, 'উঠুন, আমিরুল মুমিনিন আপনাকে ডেকেছেন; তার আহ্বানে সাড়া দিন।' আমি তার পেছন পেছন চলতে লাগলাম। ভেতরে প্রবেশ করে আমি দেখলাম, উমর এক হাতে তার চাদর ধরে আছেন, অপর হাতে পরিধেয় লুঙ্গি ঠিক

করছেন। তিনি আমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?' আমি উত্তর দিলাম, 'আমিরুল মুমিনিন! সুসংবাদ নিয়ে এসেছি। আল্লাহ তাআলা আলেকজান্দ্রিয়ার বিজয় দান করেছেন।'

তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে উপস্থিত হলেন। এরপর মুয়াজ্জিনকে বললেন, 'নামাজের সময় ঘনিয়ে এসেছে, আজান দাও।' আজান শুনে সকলে সমবেত হলো। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'দাঁড়াও, সকলকে সংবাদ শোনাও।' আমি দাঁড়িয়ে সকলকে আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের সংবাদ শোনালাম। নামাজ শেষে খলিফা আমাকে নিয়ে তার গৃহে গেলেন। এরপর কেবলামুখী হয়ে অনেকক্ষণ দোয়া করলেন। তারপর বসে দাসীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো খাবার আছে কি?' দাসী রুটি ও জায়তুন নিয়ে এলো। খলিফা আমাকে বললেন, 'নাও, খেয়ে নাও।' আমি কিছুটা লজ্জার সঙ্গে আহার করলাম। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'মুয়াবিয়া, মসজিদে আসার পর তুমি কী বলেছিলে?'

'আমি বলেছিলাম, আমিরুল মুমিনিন এখন দিবানিদ্রায় (দুপুরের আহারের পর ঘুমে) আছেন।' আমি উত্তর দিলাম।

'বড় মন্দ কথা বলেছ হে! আমি যদি দিনে ঘুমাই, তাহলে প্রজাদের হক নষ্ট করব আর যদি রাতে ঘুমাই, তাহলে নিজের হক নষ্ট করব। বলো, মুয়াবিয়া, প্রজাদের ও নিজের হকের কথা চিন্তা করে কীভাবে আমার ঘুম আসে?!'

৩. মুসলিম শাসন-কর্তৃত্বে আসার পর মিশরের কিবতি জাতি যে অপার স্বাধীনতা লাভ করেছিল, তার প্রমাণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণের উল্লেখিত নিম্নের ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য।

হজরত আনাস রাযি. বর্ণনা করেন, আমরা খলিফা উমর রাযি.-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে মিশর থেকে জনৈক ব্যক্তি আগমন করল। দরবারে উপস্থিত হয়ে সে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! আমি আপনার আশ্রয়প্রার্থী।' খলিফা বললেন, 'বলো, কী হয়েছে?'

আমর ইবনুল আস মিশরে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিলেন। আমি সেখানে প্রথম স্থান অধিকার করি। মানুষ যখন তা দেখতে পায়, তখন আমর ইবনুল আসের পুত্র মুহাম্মাদ দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, 'কাবার রবের শপথ! আমার ঘোড়া প্রথম হয়েছে।' তিনি আমার

উমর বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তুমি যদি আমরকে প্রহার করতে, তাহলে যতক্ষণ না তুমি নিজে তাকে ছেড়ে দিতে, ততক্ষণ আমরা তোমাদের মাঝে অন্তরায় হতাম না।'

'আরে আমর! যাদেরকে তাদের মায়েরা স্বাধীন জন্ম দিয়েছেন, কবে থেকে তাদেরকে দাস বানানো শুরু করলে?!'

হজরত আমর ইবনুল আস বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আমি বিষয়টি জানতাম না, আর সে আমার কাছে আসেওনি।'[১১০]

এরপর খলিফা উমর রাযি. মিশরীয় লোকটির দিকে ফিরে বললেন, 'তুমি নিশ্চিন্তে ফিরে যাও। ভবিষ্যতে যেকোনো ধরনের সমস্যা বোধ করলে আমাকে লিখে জানাবে।'[১১১]

ভেবে দেখুন, কীসের ভিত্তিতে মিশরীয় এই ব্যক্তিটি মিশর থেকে সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় এসে নিজের অধিকারের দাবি জানাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। কদিন পূর্বেও তো সে ও তার স্বজাতি রোমানদের হাতে চরমভাবে নিগৃহীত হচ্ছিল; কিন্তু লাঞ্ছনা ভুলে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছিল না। নিঃসন্দেহে তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—খলিফা তার প্রতি ন্যায়বিচার করবেন এবং স্বাধীনতাই হলো মানবতা ও মানবজাতির প্রতি ইসলামের অনুপম দান।

ড. আবদুস সবুর শাহিন[১১২] রোমান সাম্রাজ্যের অধীনস্থ মিশরের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

---

১১০. আলাউদ্দিন আল-মুত্তাকি আল-হিন্দি, *কানজুল উম্মাল*, ১২/৬৬০-৬৬১, বর্ণনা নং ৩৬০১০।

১১১. গবেষক ঐতিহাসিকগণ আলোচ্য ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে সনদ ও বর্ণনাধারা উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি করেছেন। ঘটনাটি ইবনে ইসহাক 'জনৈক ব্যক্তি'-সূত্রে বর্ণনা করেছেন আর গবেষকদের মতে ইবনে ইসহাকের অখ্যাত ব্যক্তি হতে বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। 'ফুতুহু মিসর' গ্রন্থে ঘটনাটি যে সূত্রে বর্ণিত আছে, তাতেও সুস্পষ্ট বিচ্ছিন্নতা আছে। অধিকন্তু সাহাবি-শানবিরোধী হওয়ায় ঘটনাটি (الانقطاع الباطن) মর্মগত বিচ্ছিন্নতার দোষেও দুষ্ট। সম্ভবত এ কারণেই তাবারি, ইবনে কাছির, ইবনে খালদুন প্রমুখ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ কেউই ঘটনাটি উল্লেখ করেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে দেখা যেতে পারে— https://bit.ly/2XoBQCx।

> মিশর রোমান সাম্রাজ্যের একটি করদরাজ্যে পরিণত হওয়ার পরবর্তী সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই—মিশরবাসী সে সময় কেবল জুলুম ও নিপীড়ন এবং দুর্ভাগ্য ও কষ্ট ভোগ করে গেছে। রোমান সম্রাটের কাছে মিশর ছিল একটি সম্পদ-ভান্ডারমাত্র, যা দিয়ে সে তার ফল-ফসলের চাহিদা পূরণ করত।

ড. হাসান ইবরাহিম[১১৩] লিখেছেন—

> এর (রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার) মাধ্যমেই মিশরে (আবহমান কাল থেকে চলে আসা) জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চায় পতন ঘটে, মিশরবাসীর সামনে সুউচ্চ মর্যাদা ও পদমর্যাদার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। রোমান আমলেই ট্যাক্স ও করের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। এমনকি কেউ মারা গেলেও নির্দিষ্ট অঙ্কের কর পরিশোধ করার পূর্বে মৃতদেহ সমাধিস্থ করার অনুমতি দেওয়া হতো না।

'হাজারাতুল আরব' গ্রন্থের লেখক প্রখ্যাত পশ্চিমা ঐতিহাসিক গোস্তাভ লি বোন[১১৪] মিশরীয় জনগণের ওপর মুসলিম অভিযাত্রীদের প্রভাবে মুগ্ধতা ও বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন,

---

১১২. ড. আবদুস সবুর শাহিন (১৯২৯-২০১০ খ্রিষ্টাব্দ) মিশরের প্রখ্যাত আলিম, ইসলামি চিন্তাবিদ, দাঈ এবং মিশরের সবচেয়ে প্রাচীন মসজিদ মসজিদে আমর ইবনুল আস-এর খতিব ছিলেন।

১১৩. ড. হাসান ইবরাহিম হাসান (১৮৯২-১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দ) মিশরের প্রসিদ্ধ ইতিহাস-গবেষক, ইতিহাস-লেখক। ইতিহাস বিষয়ে তার দশের অধিক গ্রন্থ রয়েছে।

১১৪. গোস্তাভ লি বোন (Gustave Le Bon) (১৮৪১-১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ) ফরাসি ঐতিহাসিক, চিকিৎসাবিজ্ঞানী ও বহুবিদ্যাবিশারদ। কলম ধরেছেন নৃতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, প্রত্নবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে। প্রাচ্য সভ্যতা ছিল তার অন্যতম গবেষণার বিষয়। তার বিখ্যাত কয়েকটি গ্রন্থ হলো La Civilisation des Arabes (আরব সভ্যতা), Les Civilisations de l'Inde (ভারতীয় সভ্যতা), Psychologie du Socialisme (সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব) ইত্যাদি। তিনি সেই সব হাতেগোনা পশ্চিমা দার্শনিকদের একজন, যারা দ্বিধাহীন চিত্তে আরব জাতি ও ইসলামি সভ্যতার প্রশংসা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ইসলামের অপার অনুগ্রহের কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন।=

ঐতিহাসিক যুগ-পরিস্থিতি অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমরা যতই দূরে যাব, দেখতে পাব যে, মিশরীয়রা ছিল সুসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক সভ্যতার অধিকারী। এ ধরনের সমৃদ্ধ সভ্যতা লালনকারী জাতির ওপর প্রভাব সৃষ্টি করা বিজেতা জাতির জন্য সহজ ছিল না। অতীতকাল থেকেই বিভিন্ন জাতি মিশরে আগ্রাসন চালালেও মিশর তা মোকাবিলা করে টিকে ছিল। পরবর্তীকালে গ্রিক ও রোমানরা মিশরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেও মিশরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। মিশরে টলেমি ও রোমান শাসকগণ কর্তৃক প্রাচীন মিশরীয় স্থাপত্যশৈলীর অনুকরণে নির্মিত ভবন, প্রাসাদ ও দুর্গসমূহ কয়েক শতাব্দীর পরিক্রমায়ও প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার স্বমহিমায় টিকে থাকার দলিল হিসেবে যথেষ্ট।

এরপর তিনি লিখেছেন—

বিশেষ করে এ বিষয়টি উল্লেখ না করলেই নয় যে, প্রাচীন মিশরের সন্তানেরা দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রিক ও রোমান আগ্রাসনের মোকাবিলা করেছে। এরপর তারাই আরবদের দ্বীন ও ধর্ম, ভাষা ও উচ্চারণ এবং বিজেতা আরব জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছে এবং নির্ভেজাল আরব জাতিতে পরিণত হয়েছে। ইরান ও ভারতবর্ষে তো আরব সভ্যতা সেখানকার প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে। অপরদিকে মিশরে মুহাম্মাদের নতুন অনুসারীদের সভ্যতার সামনে প্রাচীন ফারাও সভ্যতা এবং গ্রিক ও রোমান সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

এভাবেই কোনোপ্রকার জবরদস্তি ও চাপপ্রয়োগ ব্যতিরেকে মিশর নির্ভেজাল ইসলামি অঞ্চলে পরিণত হয়। বিজেতা জাতির উদারতা ও মুসলিম প্রশাসকদের চারিত্রিক কুশলতা প্রত্যক্ষ করে মিশরের জনসাধারণ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। নিঃসন্দেহে অনুগ্রহ ও দয়া আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।

=গোস্তাভ লি বোন রচিত La Civilisation des Arabes নামক ফরাসি ভাষায় লিখিত গ্রন্থটিকে حضارة العرب (আরব সভ্যতা) নামে আরবিতে রূপান্তর করেছেন ফিলিস্তিনি লেখক আদিল যুআয়তির।

[দুই] পারস্য সাম্রাজ্যে চলমান বিজয়াভিযান

এতক্ষণ হজরত উমর রাযি.-এর খিলাফতকালে রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত শাম অঞ্চলে পরিচালিত বিজয়াভিযান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। তৎকালীন বিশ্বের অপর বৃহৎ শক্তি পারস্য সাম্রাজ্য তখন পতনপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। ঘটনাপ্রবাহের ধারাবাহিক আলোচনায় এবার আমরা পারস্যে পরিচালিত বিজয়াভিযানের আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি।

পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত ইরাকে বিজয়াভিযানের সূচনা হয়েছিল দ্বাদশ হিজরির মুহাররম মাসে প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাযি.-এর খিলাফত আমলেই। এ বিষয়ে পূর্বে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে—খলিফা আবু বকর রাযি.-এর নির্দেশে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাযি. ইরাক ত্যাগ করে শামে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। সামনে আমরা পারস্য সাম্রাজ্যে পরিচালিত বিজয়াভিযানের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ আলোচনা করছি।

খালিদ রাযি. ইরাক ত্যাগের সময় মুসান্না বিন হারিসা শায়বানি রহ.-কে ইরাক ফ্রন্টের প্রধান হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত করে যান। মুসান্না ছিলেন বকর বিন ওয়াইল শাখাগোত্রের সদস্য, যারা দজলা ও ফুরাতের মাঝে অবস্থিত সাওয়াদ নামক বিস্তীর্ণ কৃষি-অঞ্চলজুড়ে বসবাস করত। আর তাই মুসান্না ছিলেন পারস্য জাতি, তাদের স্বভাব-চরিত্র ও যুদ্ধরীতি সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। পাশাপাশি তিনি ছিলেন শায়বান গোত্রের প্রজ্ঞাবান ও দুঃসাহসী বীরদের একজন। সামরিক দক্ষতার দিক থেকে তাকে খালিদ রাযি.-এর সমকক্ষ গণ্য করা হতো।

খালিদ রাযি. ইরাকে যুদ্ধরত মুসলিম বাহিনীর প্রায় অর্ধেক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে শামে চলে গিয়েছিলেন। ফলে মুসান্নার সঙ্গে রয়ে গিয়েছিল মাত্র নয় হাজার সৈন্য। তাই তিনি মদিনায় খলিফার কাছে অতিরিক্ত সৈন্যসাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠান। সহায়তা আসতে বিলম্ব হওয়ায় দ্রুত অতিরিক্ত সৈন্যপ্রাপ্তির লক্ষ্যে মুসান্না নিজেই মদিনায় গমনের সিদ্ধান্ত নেন এবং বাশির ইবনুল খাছাছিয়াহকে তার স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণ করেন।

খলিফা কর্তৃক জনসাধারণকে পারস্য অভিযানে যোগ দিতে আহ্বান

প্রথম খলিফা আবু বকর সিদ্দিক রাযি.-এর ইন্তেকালের এক দিন পূর্বে মুসান্না মদিনায় পৌঁছান। হজরত উমর রাযি. পরবর্তী খলিফা নির্বাচিত হলে মুসান্না তার কাছে বিষয়টি তুলে ধরেন। তখন হজরত উমর রাযি. মুসলিম জনসাধারণকে ইরাকভূমিতে বিজয়াভিযানে অংশ নিতে আহ্বান জানান। কিন্তু প্রথমদিকে কেউই তার আহ্বানে সাড়া দিচ্ছিল না। সকলের কাছে বিষয়টি কঠিন মনে হচ্ছিল। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তাবারি রহ. লিখেছেন—

> আরবদের কাছে পারসিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছিল অতি-অপ্রিয় বিষয়গুলোর একটি। এর কারণ হলো—আরবরা পারসিকদের জেদ ও একগুঁয়েমি, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বিস্ময়কর অটলতা ও অবিচলতা, পারসিকদের রণকুশলতা ও লড়াই-দক্ষতা, তাদের কর্তৃপক্ষের কঠোরতা, শক্তির দাপট ও প্রভাব এবং অপরাপর জাতির প্রতি তাদের বলপ্রয়োগ ও নিপীড়ন সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিল।[১১৫]

মুসান্না সকলের সামনে দাঁড়িয়ে পারসিকদের শক্তি ও দক্ষতাকে তুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করে বক্তব্য রাখলেও কোনো কাজ হয়নি। এভাবে চারদিন কেটে যায়; কিন্তু মুসলমানদের মাঝে কোনো ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। এরপর খলিফা উমর রাযি. দাঁড়িয়ে মর্মস্পর্শী ভাষায় নসিহত শুরু করেন। তার শেষ কথা ছিল—সুতরাং কোথায় আল্লাহর নেক বান্দারা?

তখন আবু উবায়দ বিন মাসউদ সাকাফি নামক জনৈক সাধারণ সাহাবি দাঁড়িয়ে বলেন, আমি এ অভিযানে যেতে প্রস্তুত আছি। তাকে দাঁড়াতে দেখে আরও অনেকে উদ্বুদ্ধ হয় এবং একে একে অভিযানে যেতে নাম পেশ করে। এভাবে মোট এক হাজার ব্যক্তি ইরাক অভিযানে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করে।

---

১১৫. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৩/৪৪৪।

বাহ্যত যদিও খিলাফতে রাশেদার সেই সোনালি যুগে বিজয়াভিযানে গমনে এ ধরনের নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়; কিন্তু বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে আমাদের সামনে দুটি বিষয় বের হয়ে আসে—

- মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় ও শ্রেষ্ঠতম অংশ তখন শাম ও ইরাকে বিভিন্ন ফ্রন্টে যুদ্ধরত ছিল, যাদের সংখ্যা মোটেও হেলাতুল্য নয়; বরং পঞ্চাশ হাজারের মতো ছিল।
- যারা ইতিপূর্বে ধর্মত্যাগ করেছিল, তারা পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হলেও খলিফা আবু বকর রাযি. তাদের বিজয়াভিযানের কাফেলায় যোগ দিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন। উমর রাযি.-ও প্রথমদিকে এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছিলেন। এ ধরনের মুসলমানগণ, যারা সংখ্যায় অনেক ছিলেন, নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ছিলেন এবং সবসময় কামনা করতেন, যদি তাদেরকেও নিজেদের তাওবার একনিষ্ঠতা প্রমাণ করার এবং জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো, তারাও বিজয়াভিযানে যোগ দিতেন।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। উমর রাযি. সিদ্ধান্ত নেন, আবু উবায়দ বিন মাসউদ সাকাফিই হবেন ইরাকে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। প্রবীণ সাহাবিদের কেউ কেউ এই বলে আপত্তি জানায় যে, যুদ্ধপরিকল্পনা ও সামরিক বিষয়াদিতে তার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু উমর রাযি.-এর যুক্তি ছিল, যখন কেউ এ অভিযানে অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করেনি, তখন আবু উবায়দ-ই সবার আগে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হয়েছেন। সুতরাং তিনিই নেতৃত্বের অধিক হকদার। এরপর খলিফা আবু উবায়দকে উপদেশ দেন, তোমার বাহিনীতে নবীজির অনেক সাহাবি আছেন। সুতরাং সর্বক্ষেত্রে তাদের পরামর্শ নেবে। কোনো বিষয় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি হওয়ার পূর্বে কর্মতৎপরতায় তাড়াহুড়া করবে না।

পাশাপাশি উমর রাযি. ইতিপূর্বে যারা মুরতাদ হওয়ার পর পুনরায় তাওবা করে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, তাদের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেন। ফলে তাদের অনেকেই পারস্য অভিযানে গমনরত মুসলিম বাহিনীতে যোগ দিতে ছুটে আসে।

ꕥ—দ্রষ্টব্য—ꕥ

দ্বীনি খেদমতের অঙ্গনে পদ কখনোই মুখ্য নয়

দেখুন, যে মুসান্না দুদিন পূর্বেও ছিলেন পারস্যে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এখন তিনি পরিণত হলেন আবু উবায়দের অধীনস্থ সৈন্যে। কিন্তু মুখলিছ ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের কাছে এ ধরনের বিষয় কোনো সমস্যাই নয়।

ꕥ—০—ꕥ

নামারিকের যুদ্ধ

[৮ শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি]
[৭ অক্টোবর, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

আবু উবায়দের নেতৃত্বাধীন দশ হাজার সৈন্যবিশিষ্ট মুসলিম বাহিনী ইরাক অভিমুখে রওনা হয়। ত্রয়োদশ হিজরির ৮ শাবান মুসলিম বাহিনী ইরাকের নামারিক নামক স্থানে এক লক্ষ সৈন্যবিশিষ্ট পারসিক বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। আবু উবায়দ পারসিক বাহিনীর পলায়নরত সৈন্যদের তাড়া করেন।

এরপর কাসকার অঞ্চলের সাকাতিয়্যা নামক এলাকায় আবারও মুসলিম বাহিনী পারসিক বাহিনীর মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে পরাজিত করে। এরপর বারুসমার যুদ্ধেও মুসলিম বাহিনী তাদেরকে পরাজিত করে। উভয় যুদ্ধই ত্রয়োদশ হিজরিতে সংঘটিত হয়।

সেতুর যুদ্ধ : উহুদের পর মুসলমানদের প্রথম পরাজয়

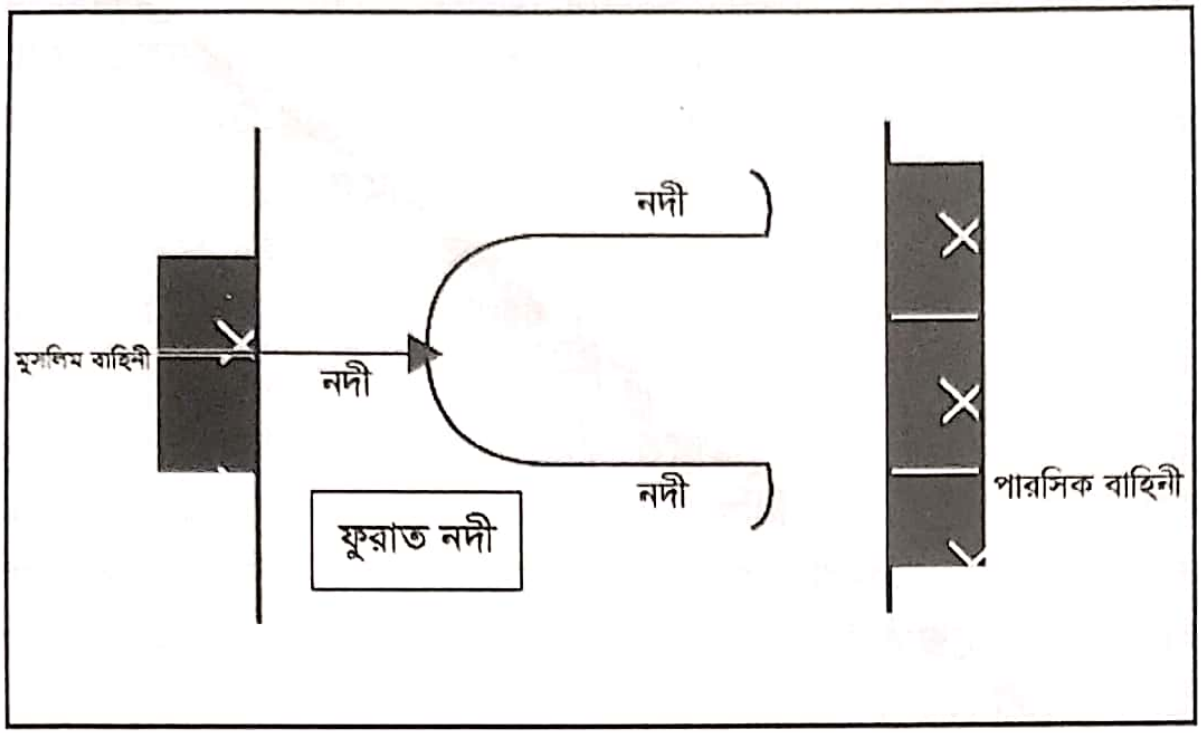
[২৩ শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি]
[২২ অক্টোবর, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

বারুসমার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর মুসলিম বাহিনী তাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ইতিমধ্যে পরাজিত পারসিক বাহিনী পুনরায় সংগঠিত হয়। বাহমান নামক জনৈক ধূর্ত ও সুদক্ষ সেনাপতিকে এবার পারসিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। বিশাল সেনাবাহিনী ও হাতির বহর নিয়ে পারসিক বাহিনী ফুরাত নদীর পূর্ব পার্শ্বে শিবির স্থাপন করে। মুসলিম

বাহিনী শিবির স্থাপন করে নদীর পশ্চিম তীরে। পেছনে ছিল মরুভূমির বিস্তীর্ণ প্রান্তর, যেদিক দিয়ে আরব উপদ্বীপ হতে সহজেই যেকোনো ধরনের সামরিক সহায়তা পৌঁছা সম্ভব ছিল।

পারসিক সেনাপতি বাহমান মুসলিম সেনাপতি আবু উবায়দের কাছে বার্তা পাঠিয়ে প্রস্তাব দেয় যে, আপনারা নদী পার হয়ে এপারে চলে আসুন। সে ক্ষেত্রে আমরা আপনাদের নদী পাড়ি দেওয়ার সুযোগ দেবো এবং এপারে জায়গা খালি করে দেবো। অন্যথায় আমরা নদী পার হয়ে আপনাদের কাছে চলে আসি। আপনারা আমাদের পার হওয়ার সুযোগ দিন। সেনাপতি আবু উবায়দ তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করেন। সকলেই নদী পার না হওয়ার পরামর্শ দেন। তারা এ-ও বলেন যে, 'আমরা তো এমন স্থানে শিবির স্থাপন করেছি, যেখানে কৌশলে পিছু হটা, নিরাপদ আশ্রয়গ্রহণ বা পশ্চাদপসরণ—সব সুযোগই আছে।' কিন্তু সেনাপতি আবু উবায়দ এই বলে নদী পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন যে, 'তারা আমাদের চেয়ে মৃত্যুর ব্যাপারে অধিক নির্ভীক নয়। সুতরাং আমরাই পার হয়ে ওপারে যাব।'

এরপর আবু উবায়দ তার বাহিনীকে পার করাতে সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম বাহিনী নদী পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় বাহমান খুশি হয়। সে তো এমনটিই চেয়েছিল। এতটুকু কৌশলেই তুষ্ট না থেকে বাহমান এরপর যে স্থানটিতে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করতে চাচ্ছিল, তাও নির্দিষ্ট করে নেয় এবং নদীর পূর্ব তীরের অতি সংকীর্ণ একটি জায়গা খালি করে দেয়। ফুরাত নদীর বড় দুটি শাখা সংকীর্ণ জায়গাটিকে ইংরেজি ইউ (U) আকৃতির ন্যায় ঘিরে রেখেছিল। ফলে মুসলিম বাহিনী নদী পার হয়ে এমন এক স্থানে অবতরণ করে, যা তিনদিক থেকে পানিবেষ্টিত।



সেতু যুদ্ধের রণাঙ্গনের স্কেচচিত্র

ত্রয়োদশ হিজরির ২৩ শাবান সেতুর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনীর নদী পাড়ি দেওয়া শেষ হতেই পারসিক বাহিনী তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পারসিক বাহিনীর সঙ্গে থাকা হাতির পাল দেখে মুসলিম বাহিনীর অশ্বগুলো ভীত হয়ে পড়ে এবং অবাধ্য আচরণ শুরু করে। ফলে মুসলিম বাহিনীর অশ্বারোহী অংশ কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে অশ্বারোহী সৈনিকরা ঘোড়া হতে নেমে পায়ে হেঁটে যুদ্ধ শুরু করে। মুসলিম সেনাপতি আবু উবায়দ যেকোনো মূল্যে শত্রুপক্ষের হাতিগুলোকে অকার্যকর করে ফেলতে চাচ্ছিলেন। তিনি মুসলিম সৈনিকদের হাতিগুলোকে ঘিরে ফেলার এবং হাতির পিঠে বেঁধে রাখা বাক্সগুলোর ফিতা কেটে ফেলার নির্দেশ দেন। তিনি নিজে হাতির পালের মূল হাতিটিকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু হাতিটি তাকে পিষে ফেলে এবং তিনি শহিদ হন। পূর্বেই আবু উবায়দ রাযি. নিজ গোত্র বনু ছাকিফের সাতজন ব্যক্তিকে পর্যায়ক্রমে নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। একে একে তারা প্রত্যেকেই বড় হাতিটিকে হত্যা করার চেষ্টা চালিয়ে সকলেই নিহত হয়। অবশেষে মুসলিম বাহিনীর ঝান্ডা গ্রহণ করেন মুসান্না বিন হারিসা।

প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসান্না সকলকে সেতু পাড়ি দিয়ে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেন। কেননা, মুসলিম বাহিনী ততক্ষণে অবরুদ্ধ

হয়ে পড়েছে এবং সর্ববিচারেই পুনঃআক্রমণ ক্ষতির কারণ বিবেচিত হচ্ছে। কিন্তু ছাকিফ গোত্রের আবদুল্লাহ বিন মুরছাদ নামক জনৈক যোদ্ধার এ সিদ্ধান্ত পছন্দ হচ্ছিল না। আত্মমর্যাদা ও যুদ্ধস্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে সে সেতু কেটে দেয় এবং চিৎকার করে বলতে থাকে, মুসলিম সৈন্যরা! তোমাদের সেনাপতিগণ যে লক্ষ্য অর্জন করতে গিয়ে শহিদ হয়ে গেছেন, তোমরাও সে লক্ষ্যে শাহাদাতের মৃত্যু বরণ করে নাও অথবা সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হও। সেতু কেটে দেওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে যে কেউ বলবে, কিছুক্ষণের মধ্যেই মুসলিম বাহিনী নিশ্চিত ধ্বংসের শিকার হতে যাচ্ছে। মুসলিম বাহিনীর অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে; ডুবে মারা যায় প্রায় দু-হাজার সৈন্য। এদিকে সেনাপতি মুসান্না ও একদল সাহাবি মিলে সেতুটি মেরামত করে পুনরায় ব্যবহার-উপযোগী করতে সচেষ্ট হন। মুসলিম বাহিনী যেন সেতু মেরামত করতে না পারে, এ উদ্দেশ্যে পারসিক বাহিনী বিশেষ করে সেতুর কাছে সমবেত হয়েছিল। তাই মুসলিম বাহিনীর একদল সৈন্য সেতু মেরামত করছিল, অন্যরা পারসিক বাহিনীকে বাধা দিয়ে রাখছিল, যেন প্রথম দল নিরাপদে সেতু মেরামত করতে পারে। পুনরায় সেতু নির্মাণে মুসলিম বাহিনী সফল হওয়ার পর সেনাপতি মুসান্না একদল সৈন্য নিয়ে সেতুর কাছে প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে যান এবং অবশিষ্ট সৈন্যদের নিরাপদে নদী পার হওয়ার পথ করে দেন। সবাই পার হওয়ার পর বাকি থাকেন কেবল মুসান্না বিন হারিসা। ততক্ষণে তিনি শত্রুপক্ষের আঘাতে আঘাতে মৃতপ্রায় অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও নিরাপদে সেতু পাড়ি দিতে সক্ষম হন এবং অন্যদের সঙ্গে মিলিত হন। এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর শহিদানের সংখ্যা ছিল চার হাজার। অপরদিকে পারসিক বাহিনীর নিহত সৈন্যের সংখ্যা ছিল ছয় হাজার। এটি ছিল পারসিক বাহিনীর কাছে মুসলিম বাহিনীর প্রথম ও শেষ পরাজয়।

পরাজিত মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ মানসিকভাবেও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীরে তারা মদিনায় ফিরে আসে। মুসান্নার সঙ্গে রয়ে যায় মাত্র তিন হাজার সৈন্য; পরাজয় যাদেরকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তারা এবার প্রতিশোধ গ্রহণের সংকল্প করে।

প্রত্যাবর্তনকারী সৈন্যরা মদিনায় পৌঁছলে মদিনাবাসী তাদেরকে পলাতক বলে ধিক্কার দিতে থাকে। কিন্তু খলিফা উমর রাযি. সকলকে শান্ত হওয়ার

আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আল্লাহর বান্দারা, অস্থির ও ধৈর্যহারা হয়ো না। হে আল্লাহ, প্রত্যেক মুসলমান আমার পক্ষ থেকে দায়মুক্ত। আমি প্রত্যেক মুসলমানের সহযোগী। শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে যারা প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, আমি তাদের সহযোগী।'

এরপর তিনি বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আবু উবায়দের প্রতি রহম করুন। যদি সে নদী পাড়ি না দিয়ে এপারেই অবস্থান করত কিংবা (শক্তিবৃদ্ধির জন্য) আমাদের কাছে চলে আসত, তাহলে তো আমরা তাকে সহযোগিতা করতে পারতাম।'

এটি আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ যে, সেতুর যুদ্ধে জয়লাভ করার পর পারসিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে সমূলে শেষ করার জন্য পশ্চাদ্ধাবনে আগ্রহী হয়নি। অথচ লক্ষণীয় মাত্রায় সৈন্যসংখ্যার পাল্লা ভারী হওয়ায় তাদের পক্ষে তা একেবারেই সহজ ছিল। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম বিজয়ের আনন্দেই তারা তুষ্ট ছিল। সম্ভবত তাদের কেবল এমন একটি বিজয় প্রয়োজন ছিল, যার মাধ্যমে নিজেদের নুয়ে পড়া মানসিকতাকে পুনরুজ্জীবিত করা যায়।[১১৬]

উল্লায়সের খণ্ডযুদ্ধ : আহত সিংহের প্রতিশোধ

[২৪ শাবান, ত্রয়োদশ হিজরি]
[২৩ অক্টোবর, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

আহত মুসান্না কিন্তু মোটেও হতোদ্যম হননি। পারসিক বাহিনীর গতিবিধির পর্যবেক্ষণে তার চোখজোড়া ছিল নির্ঘুম, অশান্ত। তার সঙ্গী মুসলিম বাহিনীর সদস্যরাও ছিল শত আঘাতে অটল-অবিচল। সেতুর যুদ্ধের পরদিনই পারসিক বাহিনীর দুজন সেনাপতি একদল অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে ফুরাত নদীর পশ্চিম পাশে উল্লায়স নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনে বের হলে মুসলিম বাহিনীর গোয়েন্দারা তাদের সংবাদ পেয়ে যায়। মুসান্না কয়েকজন সৈন্য নিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ

---

১১৬. অবশ্য ঐতিহাসিক ইবনুল আছিরের বর্ণনামতে পারসিক বাহিনীর প্রধান বাহমান পলায়নরত মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনের মনস্থ করেছিল। কিন্তু এরইমধ্যে তার কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, মাদায়েনে পারস্য সাম্রাজ্যের ক্ষমতা নিয়ে ব্যাপক গোলযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে সে মাদায়েনে ফিরে যায়। দেখুন—আবুল হাসান ইযযুদ্দিন ইবনুল আছির, *আল-কামিল ফিত-তারিখ*, ২/২৭৮।

চালান এবং সেনাপতিদ্বয়কে বন্দি ও হত্যা করতে সক্ষম হন। এর ফলে পারসিকদের অন্তরে নতুন করে ভীতি ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

উল্লায়সের যুদ্ধ যদিও অতি সংক্ষিপ্ত ও স্বল্পস্থায়ী একটি যুদ্ধ ছিল; কিন্তু চলমান প্রেক্ষাপটে এর প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। পারসিকরা কল্পনাও করতে পারেনি যে, সেতুর যুদ্ধে এমন কঠিন দুর্যোগের সম্মুখীন হওয়ার পরও এত দ্রুত মুসলমানরা এভাবে তাদের ওপর হামলা চালাতে পারে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই পারসিকদের মানসিক শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। বিপরীতে এই যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসান্নার বাহিনী একদিকে মানসিকভাবে সবল হয়ে ওঠে, অপরদিকে প্রতিপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ দুজন সেনাপতিকে হত্যা করে কিছুটা হলেও সেতুর যুদ্ধের দুঃখ লাঘব করতে সক্ষম হয়।

এরপর পারস্য অঞ্চলে চলমান বিজয়াভিযানের জন্য খলিফা উমর রাযি. নতুন করে সেনাসংগ্রহ শুরু করেন। তিনি এ ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক সেনাসংগ্রহ করেন, যেন ইরাকে যথেষ্ট পরিমাণ সহায়তা পাঠানো যায়। পারস্যের রাজদরবারে এ সংবাদ পৌঁছলে তারা সহায়ক বাহিনী পৌঁছার পূর্বেই মুসান্নাকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং এ উদ্দেশ্যে মিহরান বিন বাযান নামক নতুন এক সেনাপতি নির্ধারণ করে তার নেতৃত্বে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী গঠন করে। শুরু হয় মুসান্না ও তার হাজার-তিনেক সঙ্গীকে চিরতরে শেষ করার চূড়ান্ত পারসিক মিশন।

বুওয়াইবের যুদ্ধ

[রমজান, ১৩ হিজরি]
[নভেম্বর, ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসান্না তখন সসৈন্য হিরায় অবস্থান করছিলেন। পারসিকদের বিশাল সৈন্যসমাবেশের সংবাদ পেয়ে তিনি সেখান থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ফুরাত নদীর পশ্চিম পাড়ে মরুভূমিঘেঁষা বুওয়াইব নামক স্থানে চলে যান। জায়গাটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত ও বিস্তীর্ণ। মুসান্না চাচ্ছিলেন, এবার তিনিই পারসিক বাহিনীর জন্য মোকাবিলার স্থান নির্ধারণ করে দেবেন। পাশাপাশি মুসান্না দ্রুত সাহায্য চেয়ে মদিনায় জরুরি বার্তা পাঠান এবং তিনি যে স্থান পরিবর্তন করেছেন, তা-ও জানিয়ে দেন। ইতিমধ্যে মদিনা হতে জারির বিন আবদুল্লাহ আল-বাজালি রাযি.-এর নেতৃত্বে রওনা

হওয়া অতিরিক্ত ফৌজ পথিমধ্যে মুসান্নার বার্তা পেয়ে পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করে সঙ্গে থাকা নারীদের রেখে যায় এবং নিরাপত্তার জন্য সঙ্গে থাকা ভারী সামানপত্রও রেখে যায়। তারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বেই মুসান্নার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দ্রুত পথ চলতে থাকে এবং সফলও হয়। ফলে মুসান্নার বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় বারো হাজারে। পারসিক বাহিনী নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করে। তাদের সেনাপতি মিহরান মুসান্নার কাছে হুবহু সেই বার্তাই প্রেরণ করে, যা ইতিপূর্বে তার পূর্বসূরি বাহমান আবু উবায়দার কাছে প্রেরণ করেছিল।

মুসান্না প্রত্যুত্তরে বার্তা পাঠান, 'তোমরা পার হয়ে চলে এসো।'

বুওয়াইবের যুদ্ধ ত্রয়োদশ হিজরি সনের রমজান মাসে সংঘটিত হয়। মুসান্না তার বাহিনীর সদস্যদের সেদিন রোজা না রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরু হতেই পারসিক বাহিনী সোৎসাহে মুসলিম বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা মুখে ও ঘণ্টাধ্বনির মাধ্যমে বিকট আওয়াজ সৃষ্টি করে মুসলিম বাহিনীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ অটল-অবিচল থেকে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। সেনাপতি মুসান্না শত্রুপক্ষের মূল অংশে ঢুকে পড়েন এবং শত্রুসেনাপতি মিহরানকে হত্যা করতে সক্ষম হন।[১১৭] সেনাপতির পতনে পারসিক বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং পলায়নে উদ্যত হয়। মুসান্না পূর্বেই তার বাহিনীর একটি অংশকে উপযুক্ত সময়ে শত্রুপক্ষের প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে রেখেছিলেন। তারা এবার সেতু কেটে দেয়। ফলে পারসিক বাহিনীর একজন সৈন্যও সেদিন নিষ্কৃতি পায়নি। হয় তারা মুসলিম সৈন্যদের তরবারির আঘাতে বা নদীতে ডুবে নিহত হয় অথবা মরুভূমিতে পালিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

বুওয়াইবের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও মুসান্না ইরাকের উত্তরাঞ্চলে বিভিন্ন বাজার-ঘাটে একের পর এক ঝটিকা হামলা অব্যাহত রেখে শত্রুপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে রাখেন। এ যেন এক অনিঃশেষ গেরিলা যুদ্ধ! বাধ্য হয়ে পারসিকরা নতুন করে নিজেদের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি বোলায়

---

১১৭. ইবনে কাছির এ ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং মিহরানের হত্যাকারী হিসেবে ভিন্ন নাম উল্লেখ করেছেন। দেখুন : ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/২৯।

এবং নতুন যুবক সম্রাট ইয়াযদিগার্দের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। শুরু হয় মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য নতুন করে সেনাসমাবেশের প্রস্তুতি।

আকস্মিক এই পট পরিবর্তনের সংবাদ[১১৮] মদিনায় খলিফাতুল মুসলিমিনের দরবারেও পৌঁছে যায়। তিনি মুসান্নাকে ইরাকের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ইরাক সীমান্তে সতর্ক অবস্থানের নির্দেশ দেন। উমর রাযি. চাচ্ছিলেন—এই ফাঁকে মুসলিম বাহিনীকে বিন্যস্ত করতে এবং পুরো শক্তি একত্র করে এমন এক চূড়ান্ত অভিযান শুরু করতে, যা সুপ্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের সমাপ্তিরেখা টেনে দেবে।

এ উদ্দেশ্যে উমর রাযি. মুসলিম ভূখণ্ডের শহর-গ্রাম সর্বত্র একটি বার্তা প্রেরণ করেন। বার্তায় উল্লেখ ছিল—যাদের যুদ্ধাস্ত্র, ঘোড়া কিংবা লড়াই-যোগ্যতা আছে, এমন কাউকে বাদ দিয়ো না। প্রত্যেককে বেছে নাও; এরপর আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। দ্রুত! অতি দ্রুত!

এই চূড়ান্ত অভিযানের সর্বাধিনায়ক নির্ধারণের জন্য খলিফা তার উপদেষ্টা-পর্ষদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তারা এ পদে সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-এর নাম প্রস্তাব করলে উমর রাযি. তাতে সম্মতি জানান। নিঃসন্দেহে এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণ সঠিক। হজরত সাদ রাযি. হলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ-সাহাবির অন্যতম। যুদ্ধক্ষেত্রে তার সবিশেষ দক্ষতার কারণে তার উপাধি ছিল আসাদ বা সিংহ। তার জন্যই নবীজি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, আপনি তার দোয়া কবুল করবেন এবং তার নিশানা নির্ভুল করে দেবেন।' তিনি ছিলেন সপ্তম ইসলামগ্রহণকারী। ইসলামগ্রহণের সময় তার বয়স ছিল উনিশ বছর। সম্পর্কে তিনি ছিলেন নবীজির মামা।[১১৯]

---

১১৮. একই সময় ইরাকের বিজিত বিভিন্ন নগরীর জনগণ মুসলমানদের সঙ্গে চুক্তি ভঙ্গ করে অসদাচরণ শুরু করে এবং বিভিন্নভাবে মুসলিম প্রশাসক ও সাধারণ জনগণকে নিপীড়ন করতে থাকে। পরিবর্তিত অবস্থার কারণে খলিফা উমর ইরাকে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন যে, তারা যেন মূল শহরগুলো থেকে সরে এসে সীমান্তে অবস্থান গ্রহণ করে। দেখুন : ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৩৫।

১১৯. ঐতিহাসিকগণ সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-এর গুণ-কীর্তি আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—তিনি ইসলামের জন্য প্রথম তির নিক্ষেপকারী, ইসলামের জন্য প্রথম রক্তপ্রবাহিতকারী। তিনি নবীজির সঙ্গে সবগুলো গাযওয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদ=

খলিফা উমর রাযি. সাদকে তলব করেন এবং শীঘ্রই তিনি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তার জন্য তাকে প্রস্তুত করতে থাকেন। তিনি সাদকে দীর্ঘ সময় ধরে নসিহত করেন। নসিহতের একটি অংশ ছিল—

হে সাদ, মানুষ তোমাকে নবীজির মামা বলে ডাকে, এ বিষয়টি যেন তোমাকে আত্মপ্রবঞ্চনায় না ফেলে। কেননা, আল্লাহ তাআলা তো মন্দ দ্বারা মন্দ মোচন করেন না; বরং কল্যাণ-কর্ম দ্বারা মন্দ মোচন করেন। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের একমাত্র মাধ্যম হলো নেককর্ম ও পূর্ণ আনুগত্য। আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত-সাধারণ সকলে সমান। আল্লাহ সকলের রব আর সকলে তার বান্দা। মানুষের মাঝে মর্যাদার তারতম্য হয় বংশমর্যাদায় নয়; বরং সততার গুণে। আর নেক কর্মের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে। এটি আমার পক্ষ হতে তোমার প্রতি উপদেশ। এসব সদুপদেশ না মানলে এবং এগুলোর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করলে তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তোমার কর্মপ্রচেষ্টা বিনষ্ট হবে।

খলিফা এবার পারস্য অভিযানের জন্য বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন। পূর্ব থেকেই মুসান্নার সঙ্গে বারো হাজার সৈন্য থাকায় পারস্যে এবার মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা হতে যাচ্ছে বত্রিশ হাজার। পাশাপাশি উমর রাযি. শামে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিগণের উদ্দেশে এই বার্তা প্রেরণ করেন যে, ইতিপূর্বে যারা ইরাকে যুদ্ধ করার পর খালিদের সঙ্গে শাম-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল, সেনাপতিগণ যেন তাদেরকে পুনরায় ইরাকের বাহিনীতে পাঠিয়ে দেন।

সাদের এই বাহিনীতে সত্তরের অধিক বদরি সাহাবি ছিলেন। কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইসলামি বিজয়াভিযানে বের হতে এসব বদরি সাহাবিগণ এ পর্যন্ত বিলম্ব করলেন কেন?

=যুদ্ধে তিনি অনন্যসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দেন। কথিত আছে, উহুদ যুদ্ধে তিনি এক হাজার তির নিক্ষেপ করেছিলেন। সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. সমকালীন কুরাইশ বংশের শ্রেষ্ঠতম বীর-যোদ্ধা বিবেচিত হতেন। তিনি সফরে নবীজির প্রহরার দায়িত্ব পালন করতেন। আশারায়ে মুবাশশারা বা দুনিয়াতেই সুস্পষ্ট ভাষায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির অন্যতম সাদ রাযি. সবশেষে মৃত্যুবরণকারী মুহাজির সাহাবি। তিনি হাতেগোনা সেসব সৌভাগ্যবান সাহাবির একজন, যাদের ক্ষেত্রে নবীজি 'আমার মাতা-পিতা তোমার জন্য কুরবান হোক' বাক্য উচ্চারণ করেছেন।

উত্তর হলো—খলিফা উমর রাযি. বদরি সাহাবিদের মহান কাফেলাকে ও অন্যান্য প্রবীণ সাহাবিদেরকে পরামর্শের জন্য নিজের কাছে রাখতেন। রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণে বদরি সাহাবিদেরকে বিশেষ করে আলি রাযি., উসমান রাযি. ও অন্যদেরকে একত্র করতেন। এবার যেহেতু তিনি চূড়ান্ত অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাই তিনি তাদেরকেও কাফেলায় যোগ দিতে অনুমতি দান করেন। তিনি জানতেন, হয়তো তারা আর ফিরে আসবেন না এবং তাদের অভিজ্ঞতা ও কল্যাণ-সংস্পর্শ হতে উম্মাহ চির-বঞ্চিত হবে; কিন্তু এই চূড়ান্ত অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের অটল-অবিচল থাকতে সহায়তা করা এবং তাদের সামনে আদর্শ নমুনা তুলে ধরার জন্য এ সময় বাহিনীতে তাদের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক ছিল। মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে এই মহান ব্যক্তিদের দোয়ার বরকতলাভে ধন্য হতো এবং পরস্পর বলাবলি করত, তারা দোয়া করার পরও আমরা নুসরত ও বিজয় লাভ করব না, এমনটা হতেই পারে না।

নতুন পরিকল্পনা

খলিফা উমর রাযি. সেনাপতি সাদের জন্য অতি সূক্ষ্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। মুসলিম বাহিনী কোথায় শিবির স্থাপন করবে, তিনি তাও নির্দিষ্ট করে দেন। খলিফা সাদকে কাদিসিয়ার ময়দানে[১২০] শিবির স্থাপন করতে বলেন। তিনি তাকে কাদিসিয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি সম্পর্কেও অবগত করেন। খলিফা তাকে আদেশ করেন যে, শত্রুবাহিনী পৌঁছা পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী যেন সেখানেই অবস্থান করে এবং পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, কিছুতেই যেন সে স্থান ত্যাগ না করে। এরপর খলিফা উমর তার উপদেষ্টাদের সঙ্গে নিয়ে মুসলিম বাহিনীর জন্য মূল যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে শুরু করেন।

ইরাকে বিজয়াভিযান যখন শুরু করা হয়, তখন পরিকল্পনা ছিল, মুসলিম বাহিনী প্রথমে ফুরাতের পশ্চিম তীরে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাবে, এরপর হিরা দখল করবে, তারপর ক্রমান্বয়ে তৎকালীন পারস্যের রাজধানী

---

১২০. **কাদিসিয়া :** বর্তমান ইরাকের কুফা ও হিল্লা নগরী হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক নগরীর নাম কাদিসিয়া। ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কাদিসিয়া নগরী ইসলামি বিজয়াভিযানের পূর্বে ক্ষুদ্র একটি জনপদ ছিল।

মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হবে। কিন্তু কাদিসিয়াকে নতুন যুদ্ধক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচনের কারণে উপদেষ্টাগণ পরিকল্পনা পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভব করেন। এবার পরিকল্পনা করা হয়—শত্রুপক্ষকে ধীরে ধীরে কাদিসিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসা হবে। এর ফলে মুসলিম বাহিনীর পেছনে থাকবে আরবদের আজন্ম বিচরণভূমি সুবিশাল মরুভূমি আর উভয় পক্ষের মাঝে থাকবে জালের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নদনদী ও প্রাকৃতিক জলধারাবিশিষ্ট এক জটিল সমতলভূমি। পারসিক বাহিনী বাধ্য হয়েই এই দুর্গম সমতলভূমি পাড়ি দেবে। আর তখন মুসলিম বাহিনীর পেছন দিক অনুকূল হলেও পারসিক বাহিনীর পৃষ্ঠদেশ হবে দুর্গম ও জটিল। আল্লাহর অনুগ্রহে যদি মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়ায় বিজয় লাভ করে, তাহলে এরপর তারা তাদের মূল লক্ষ্য মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হবে। এ ক্ষেত্রে তারা ফুরাত ও দজলা নদীর মাঝে অবস্থিত ইরাকের শ্যামলতম গ্রামীণ অঞ্চল সাওয়াদ হয়ে মাদায়েনে পৌঁছতে চেষ্টা করবে।

পরিকল্পনা প্রণয়ন শেষ। এবার আল্লাহর রহমতের ওপর ভরসা করে তা বাস্তবায়নের পালা। আল্লাহু আকবার তাকবির-ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে চতুর্দশ হিজরির ১৩ শাবান (৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দের ২ অক্টোবর) মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। তারা প্রতিজ্ঞা করে—পারস্য-কিসরা ইয়াযদিগার্দের রাজমুকুট ও ধনভান্ডার না নিয়ে তারা কিছুতেই প্রত্যাবর্তন করবে না।

আল্লাহর কী মহিমা! সাদের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনী মুসান্নার বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অল্প কদিন পূর্বেই ইরাকে ইসলামি বিজয়াভিযান-ইতিহাসের অবিস্মরণীয় নাম মহান সেনাপতি মুসান্না বিন হারিসা রহ. ইন্তেকাল করেন। সেতুর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সদস্যদেরকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি একাই বিশাল পারসিক বাহিনীর সম্মুখে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন এবং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। অবশেষে সেই ক্ষতই তার শাহাদাতের কারণ হয়।

কাদিসিয়া-অভিযান : ইসলামি ইতিহাসের এক নিষ্পত্তিমূলক যুদ্ধ

[শাবান, পঞ্চদশ হিজরি]
[সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

নবীজির ইন্তেকালের পর ইসলামি ইতিহাসে অনেক যুদ্ধই সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসবোদ্ধাদের কাছে অন্য কোনো যুদ্ধই কাদিসিয়ার যুদ্ধের মতো অধিক গুরুত্ব লাভ করেনি। এর কারণও আছে। মূলত কাদিসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমেই পারস্যে মুসলিম বাহিনীর বিজয়াভিযান পূর্ণতা লাভ করে এবং শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবল প্রতাপে সুবিশাল ভূখণ্ড শাসনকারী পারস্য সাম্রাজ্যের পতন নিশ্চিত হয়ে যায়। আর তাই ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ যথেষ্ট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

ঐতিহাসিক তাবারি রহ. বলেন—

> আরব উপদ্বীপের প্রতিটি জনপদের সকল মানুষ এ যুদ্ধের ফলাফল জানার জন্য নিয়মিত যুদ্ধের সংবাদ জানতে সচেষ্ট ছিল। এমনকি তখন আরবের কেউ গুরুত্বপূর্ণ কোনো কাজ সম্পাদনের প্রয়োজন হলেও এ কথা বলত, 'কাদিসিয়ায় কী ঘটে, তা জানার আগে আমি এ বিষয়ে চিন্তাই করব না।'[১২১]

ঐতিহাসিকগণ কাদিসিয়া-যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ যতটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, একই সময়ে শাম অঞ্চলে রোমানদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অভিযানের আলোচনা ততটা বিশদভাবে করেননি। কারণ, রোমানদের বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর যুদ্ধাভিযান তখনও চূড়ান্ত ও নিষ্পত্তিমূলক পর্যায়ে উপনীত হয়নি। রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল এরপরও দীর্ঘ কয়েক শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। অবশেষে ৮৫৭ হিজরি সনে (১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে) সপ্তম উসমানি খলিফা মহাবীর গাজি মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ-এর হাতে কনস্টান্টিনোপল ও রোমান সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে।

কাদিসিয়ায় পৌঁছার পর সেনাপতি সাদ রাযি. এক মাস সেখানেই অবস্থান করেন। কিন্তু পারসিকদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার যুদ্ধতৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না। তখন তিনি খলিফার কাছে বার্তা পাঠিয়ে জানিয়ে

---

১২১. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর-রুসুলি ওয়াল-মুলুক*, ৩/৫৮২।

দেন যে, তারা আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে প্রেরণ করেনি এবং আমাদের জানামতে কাউকে যুদ্ধের দায়িত্বও দেয়নি।

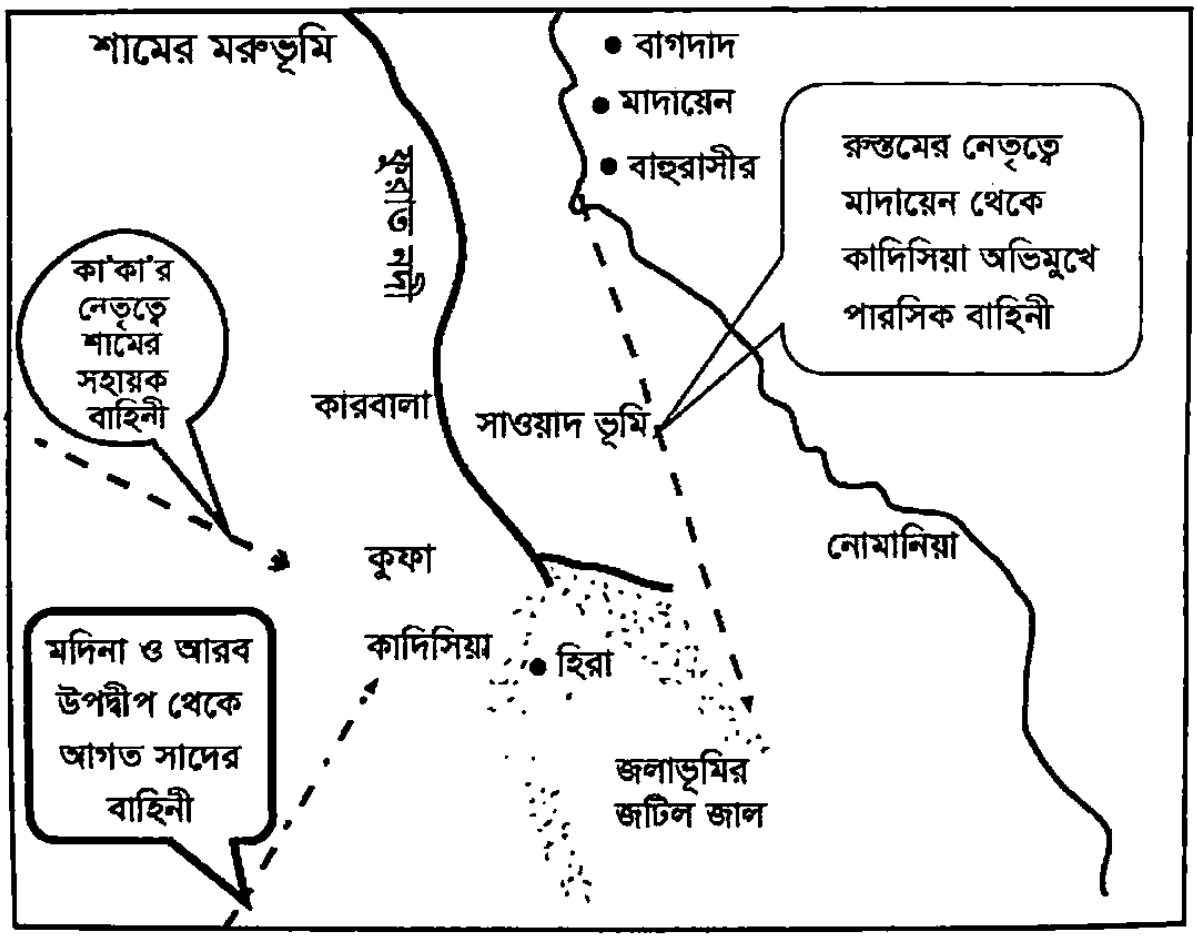
সেনাপতি সাদ রাযি. দীর্ঘ এক বছর সেখানে অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে বিভিন্ন খণ্ডযুদ্ধ ও সংঘর্ষ যেমন হয়, তেমনই সমঝোতা-সংলাপ প্রচেষ্টাও চলে। এই পুরোটা সময় খলিফা উমর রাযি. নিয়মিত সাদ ও তার বাহিনীর সংবাদ রাখছিলেন এবং সাদের উদ্দেশে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও নসিহত প্রেরণ করছিলেন। একবার তিনি সাদকে প্রেরিত পত্রে লেখেন—

> হামদ ও সালাতের পর, তুমি মনোবল অটুট ও সুদৃঢ় রাখবে। সৈন্যদের নিয়মিত নসিহত করবে, নিষ্ঠাপূর্ণ নিয়ত ও সুধারণার প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। যারা এসব বিষয়ে গাফেল, তারাও যেন এসব বিষয়ে পরস্পর বারবার আলোচনা করে। সবসময় অটল-অবিচল থাকবে। কেননা, নিয়তের মান অনুসারে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য আসে এবং নিষ্ঠার পরিমাণ হিসেবে আজর ও সাওয়াব মিলে। আপন দায়িত্ব ও পথ সম্পর্কে সতর্ক থাকবে। আল্লাহর কাছে আফিয়াত ও পূর্ণ সুস্থতা কামনা করবে এবং বেশি বেশি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করবে। আর আমাকে লিখে জানাবে যে, শত্রুবাহিনী কত দূর পৌঁছেছে এবং তাদের নেতৃত্ব কে দিচ্ছে। কারণ, তোমরা যাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছ, তাদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে পূর্ণ অবগতি না থাকায় আমি (তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য) যা লিখতে চাচ্ছি, তা লিখতে পারছি না। আমাকে মুসলিম বাহিনীর মনজিলসমূহ সম্পর্কে অবগত করবে এবং তোমাদের অবস্থানস্থল ও মাদায়েনের মাঝে যেসব এলাকা আছে, সেগুলো সম্পর্কেও বিস্তারিত অবহিত করবে। পুরো বিবরণ এমন সুস্পষ্টভাবে লিখবে, যেন আমার চোখের সামনে সামগ্রিক পরিস্থিতি দৃশ্যমান হয়। আমাকে তোমাদের বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে অবহিত করবে। মহান আল্লাহর প্রতি যুগপৎ ভয় ও আশা পোষণ করবে। আর মনে রাখবে, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ ইয়াকিন ও বিশ্বাস রাখবে। তিনি প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না। এমন যেন না হয় যে, তোমাদের অসতর্কতার কারণে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি

তোমাদের কাছ থেকে সরে যায় এবং আল্লাহ তাআলা এ কাজের জন্য অন্য কাউকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করেন।

অন্য এক পত্রে খলিফা লেখেন—

হামদ ও সালাতের পর, আমি তোমাকে এবং তোমার সঙ্গী সৈনিকদেরকে সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিচ্ছি। কারণ, তাকওয়া হলো যুদ্ধে শত্রুর বিরুদ্ধে শ্রেষ্ঠতম উপকরণ। তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে আরও নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা শত্রুপক্ষের তুলনায় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সচেষ্ট থাকবে। কারণ, শত্রুপক্ষের চেয়ে গুনাহ বেশি থাকা একটি বাহিনীর জন্য অনেক বড় ভয়ের কারণ। প্রতিপক্ষ আল্লাহর অবাধ্য বলেই মুসলমানরা যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য লাভ করে। আর নয়তো তাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোনো শক্তিই থাকত না। জনশক্তি বা অস্ত্রশক্তি, যুদ্ধপ্রস্তুতি কিংবা যুদ্ধসরঞ্জাম, সর্বক্ষেত্রেই তো আমরা তাদের চেয়ে পিছিয়ে। এখন গুনাহের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাদের সমান হয়ে যাই, তাহলে তো আমাদের ওপর তারা শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে যাবে।



মানচিত্র নং-৩

কাদিসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র

মুসলমানদের মোকাবিলায় পারসিক সেনাপতি রুস্তমের শৈথিল্য ও অনাগ্রহ

এভাবেই মুসলিম জাহানের খলিফা হজরত উমর রাযি. পরিস্থিতির প্রতি সার্বক্ষণিক নজরদারির পাশাপাশি সেনাপতি সাদ রাযি.-কে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। অপরদিকে পারস্যে তখন চলছিল তরুণ কিসরা ইয়াযদিগার্দের শাসন। তার বয়স তখনও বিশ পেরোয়নি! ইয়াযদিগার্দ ছিলেন আত্মপ্রবঞ্চিত ও অভিজ্ঞতাহীন একজন শাসক। তিনি তার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি পারস্য সাম্রাজ্যের প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা রুস্তমকে[১২২] মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালানোর এবং সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে মুসলিম বাহিনীকে ধ্বংস করার নির্দেশ দেন।

রুস্তম পূর্ব থেকেই মুসলিম বাহিনীর খোঁজখবর নিচ্ছিল। সে বুঝতে পেরেছিল যে, মুসলমানদেরকে পরাজিত করা মোটেও সহজ হবে না; বরং বিরাজমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমূহ ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই সে দীর্ঘ সময় ধরে কিসরার নির্দেশ পালনে বিলম্ব করতে থাকে। কিন্তু পরিস্থিতি তার অনুকূলে ছিল না। কারণ, মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়ায় শিবির স্থাপন করেই বসে থাকেনি; বরং নিজেদের প্রয়োজনীয় রসদ জোগাড় করতে এবং পারসিক বাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত আগমনে প্ররোচিত করতে তারা ইরাকের সবুজ-শ্যামল অঞ্চলগুলোতে ঝটিকা হামলা শুরু করে দিয়েছিল। ফলে কিসরার কাছে বারবার ব্যবসায়ী ও গ্রামীণ কৃষকসমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসতে থাকে। ইয়াযদিগার্দ তখন সেনাপতি রুস্তমকে দ্রুত বাহিনী প্রেরণের জন্য পীড়াপীড়ি করেন। নিরুপায় হয়ে রুস্তম এবার যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করে।

মাদায়েনে যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণের সংবাদ পেয়ে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সাদ রাযি. খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-কে এ বিষয়ে অবগত করেন। ফিরতি বার্তায় খলিফা লেখেন—

---

১২২. ফার্সি কবি আবুল কাসিম ফিরদাউসি রচিত ইতিহাসনির্ভর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *'শাহনামা'*-তে এই রুস্তমকেই বীর যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং তার পুত্র সোহরাবের সঙ্গে তার মোকাবিলার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। বাংলাভাষায়ও সুপ্রসিদ্ধ এ গল্পটি 'সোহরাব-রুস্তম' নামে সুপ্রসিদ্ধ। আমরা অনেকেই সোহরাব-রুস্তমের ট্রাজেডিক গল্পটি পড়ে কেঁদে বুক ভাসাই; কিন্তু জানিও না যে, এই রুস্তম মুসলমান ছিল না, ছিল ইসলামের ঘোরতর দুশমন!

> তাদের পক্ষ থেকে যেমন প্রস্তুতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, তুমি চিন্তিত হবে না। তুমি আল্লাহর কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করবে এবং আল্লাহর ওপরই ভরসা করবে। আর তাকে (পারসিক সম্রাট) ইসলামের দাওয়াত প্রদানের জন্য কয়েকজন বাগ্মী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে প্রেরণ করবে। আল্লাহ তাআলা এই দাওয়াতের মাধ্যমে পারসিকদের লাঞ্ছনা ও বিচ্ছিন্নতার শিকার করবেন। আর প্রতিদিনের অবস্থা আমাকে লিখে জানাবে।

খলিফার নির্দেশমতো সেনাপতি সাদ রাযি. মুসলিম বাহিনীর চৌদ্দ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে ইয়াযদিগার্দের দরবারে প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিদল মাদায়েনে ইয়াযদিগার্দের রাজদরবারে পৌঁছলে তিনি প্রথমে তাদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করেন; এরপর মুসলমানদের পারস্যে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে হজরত নুমান বিন মুকাররিন রাযি. উত্তরে বলেন—

> আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করে আমাদের কাছে একজন রাসুল প্রেরণ করেছেন। তিনি আমাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেছেন এবং কল্যাণের নির্দেশ দিয়েছেন; অকল্যাণ ও মন্দের পরিচিতি দান করেছেন এবং অকল্যাণ হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, যারা তার নির্দেশনা অনুসরণ করবে, তারা ইহকাল ও পরকালে সমূহ কল্যাণ লাভ করবে। এরপর যাদেরকেই তার আনীত দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, তারা দু-দলে পরিণত হয়েছে। একদল তার নৈকট্য লাভ করেছে, অপরদল তার থেকে দূরে সরে গেছে। উচ্চ পর্যায়ের নিবেদিত ব্যক্তিরাই তার অনুসরণ করেছে। যতদিন আল্লাহ তাআলা চেয়েছেন, ততদিন তিনি এভাবেই দাওয়াত দিয়ে গেছেন। এরপর আল্লাহ তাআলা তাকে তার বিরোধিতাকারী আরবদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করলে সকল আরব ক্রমান্বয়ে ইসলামে প্রবেশ করে দুভাবে—কিছু লোক ইসলামে প্রবেশ করেছিল একান্ত বাধ্য হয়ে; ফলে তারা ঈর্ষান্বিত হয় আর অনেকে ইসলামগ্রহণ করেছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

হয়ে; তারা ঈমানি দৃঢ়তা লাভ করে। ইতিপূর্বে আমরা পরস্পর শত্রুতা ও সংকীর্ণতায় নিমজ্জিত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে যে দ্বীনের সন্ধান দিয়েছেন, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও কল্যাণকামিতা আমরা সকলে উপলব্ধি করি। এরপর নবীজি আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন আমাদের প্রতিবেশীদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ন্যায় ও সুবিচারের প্রতি আহ্বান করি। (নবীজির নির্দেশনার ভিত্তিতে) আমরা আপনাদেরকে আমাদের দ্বীনের প্রতি আহ্বান করছি। আমাদের দ্বীন ভালোকে ভালোরূপে চিহ্নিত করে আর মন্দকে মন্দরূপে। আপনারা যদি আমাদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে আপনাদের জন্য চরম অকল্যাণকর পরিণতি রয়েছে আর তা হলো জিজিয়া প্রদান। যদি জিজিয়া প্রদানেও আপনারা অস্বীকৃতি জানান, তাহলে যুদ্ধ সুনিশ্চিত। আর যদি আপনারা আমাদের দ্বীনকে পছন্দ করেন, তাহলে আমরা আল্লাহর কিতাব আপনাদের জন্য রেখে যাব; আপনারা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী রাষ্ট্রপরিচালনা করবেন। আমরা ফিরে যাব; আপনারা আপনাদের নগরী নিয়ে থাকবেন। যদি আপনারা জিজিয়া প্রদানে সম্মত হন, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করব এবং আপনাদের নিরাপত্তাবিধান করব। যদি তাতেও অস্বীকৃতি জানান, তাহলে যুদ্ধই ফয়সালা।

নুমান রাযি.-এর বক্তব্য শেষ হলে সম্রাট ইয়াযদিগার্দ বলেন—

আমি তো জানতাম যে, পৃথিবীতে তোমাদের চেয়ে হতভাগা, সংখ্যায় স্বল্প ও মন্দ কোনো জাতি নেই। আমরা তো তোমাদের দায়িত্ব আশেপাশের বিভিন্ন শহরতলির হাতে ছেড়ে দিতাম আর তারাই তোমাদের মোকাবিলায় যথেষ্ট হতো। তোমরা না পারসিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আর না তাদের সামনে দাঁড়ানোর সাহস করতে। এখন যদি তোমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তবে তাতে প্রবঞ্চিত হয়ো না। আর যদি ক্ষুধার তাড়নায় তোমরা এ পর্যন্ত এসে থাক, তাহলে তোমাদের সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত আমরা তোমাদের আহার্যের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আমরা তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করব এবং তোমাদের

পরিচ্ছদের ব্যবস্থাও করব। আর তোমাদের জন্য একজন সদয় প্রশাসক নিয়োগ করব, যে তোমাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে।

ইয়াযদিগার্দের কথা শুনে প্রতিনিধিদলের সকলে নিশ্চুপ বসে থাকে। অবশেষে মুগিরা বিন শু'বা রাযি. দাঁড়িয়ে বলেন—

সম্রাট, এরা আরবের নেতৃস্থানীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকজন। আর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সম্ভ্রান্তদের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন। সম্ভ্রান্তরা তো অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কেবল সম্মান করতেই জানেন; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কদর ও মর্যাদা তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই জানেন। তারা যে বার্তা নিয়ে এসেছে, তার সবটুকু আপনাকে বলা হয়নি আর আপনি যা বলেছেন, তার সবটুকু তারা গ্রহণও করেনি। তারা সদাচরণ করেছে আর তাদের মতো ব্যক্তিগণ এরূপ সদাচরণই করে থাকে। আপনি আমাকে সুযোগ দিলে আমি আপনাকে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করব; তারা আমার কথাকে সঠিক বলে সাক্ষ্য দেবে। আপনি আমাদের বিষয়ে যে মন্তব্য করেছেন, প্রকৃত বাস্তবতা হলো সে বিষয়ে আপনার পূর্ণ জানাশোনা নেই। আপনি বলেছেন, আমরা অত্যন্ত মন্দ ছিলাম। বাস্তবেই আমাদের চেয়ে মন্দ কেউ ছিল না। আপনি বলেছেন, আমরা ক্ষুধার্ত। হ্যাঁ, আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম, যার সঙ্গে কোনো ক্ষুধা তুল্য হতে পারে না। আমরা পোকামাকড়, সাপ-বিচ্ছু ভক্ষণ করতাম। এগুলোকেই আমরা খাদ্য বিবেচনা করতাম। আপনি আমাদের বাড়িঘরের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, উন্মুক্ত ভূপৃষ্ঠই ছিল আমাদের ঘরবাড়ি। উট-বকরির পশম দিয়ে তৈরি পরিচ্ছদই ছিল আমাদের পোশাক। পরস্পর খুনোখুনি, অন্যায়-রাহাজানি ছিল আমাদের ধর্ম। খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে আমাদের অনেকে নিজ কন্যাকে জীবন্ত প্রোথিত করত। আমি এতক্ষণ আপনাকে যা বললাম, কদিন পূর্বেও তেমনই ছিল আমাদের অবস্থা। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছে এমন একজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করলেন, যার বংশপরিচয় আমাদের জানা আছে। আমরা তাকে চিনি, তার জন্মস্থান সম্পর্কে জানি। তার জন্মভূমি সর্বোত্তম জন্মভূমি; তার বংশ আমাদের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ। তার পরিবার আমাদের সবচেয়ে মহান পরিবার;

তার গোত্র আমাদের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত গোত্র। তিনি নিজে আমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সবচেয়ে সত্যবাদী, সবচেয়ে ধৈর্যশীল।

তিনি আমাদেরকে একটি পথে আহ্বান জানালেন। আমাদের কেউ তার আহ্বানে সাড়া দিলো না। প্রথম যিনি তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন, তিনিই পরবর্তী সময়ে তার প্রথম খলিফা হন। তিনি বললেন, আমরাও বললাম। তিনি সত্য বললেন, আমরা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম। তিনি আমাদেরকে অগ্রসর করতে চাইলেন, আমরা কেবল পিছু হটলাম। তিনি যা বলছিলেন, তা-ই বাস্তবায়িত হচ্ছিল। এরপর আল্লাহ তাআলা আমাদের অন্তরে তাকে সত্যবাদীরূপে মেনে নেওয়ার এবং তার অনুসরণ করার মানসিকতা তৈরি করে দিলেন। তিনি আমাদের ও জগৎসমূহের প্রতিপালকের মাঝে সেতুবন্ধন হলেন। তিনি আমাদের যা বলতেন, তা মূলত আল্লাহর বাণী। তিনি আমাদেরকে যে নির্দেশনা দিতেন, তা মূলত আল্লাহরই নির্দেশ। তিনি আমাদেরকে বলেছেন, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, আমিই আল্লাহ। আমি একক; আমার কোনো শরিক নেই। যখন কোনো কিছু ছিল না, তখনও আমি ছিলাম। আমি ব্যতীত অন্য সবকিছু একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমিই সবকিছু সৃষ্টি করেছি আর সবকিছু আমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। আমার দয়া ও করুণা তোমাদের ভাগ্যে জুটেছে। তাই আমি তোমাদের মাঝে এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছি। তার মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সে পথের সন্ধান দেবো, যে পথে চললে আমি তোমাদের মৃত্যুর পর আমার আজাব থেকে নিষ্কৃতি দেবো এবং তোমাদেরকে আমার নির্মিত দারুস সালামে (জান্নাতে) স্থান দেবো। স্বয়ং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি মহান সত্তার পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়ে আগমন করেছেন। তিনি বলেছেন, যারা এই দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের অনুসরণ করবে, তারা তোমাদের সম-অধিকার ভোগ করবে, সমদায়িত্ব পালন করবে। আর যারা এই দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করবে, তাদেরকে জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেবে। তারা জিজিয়া প্রদান করলে তোমরা যেভাবে নিজেদের

নিরাপত্তাবিধান করো, সেভাবে তাদেরও নিরাপত্তা প্রদান করবে। আর যারা জিজিয়া প্রদানেও অস্বীকৃতি জানাবে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে আমিই তোমাদের মাঝে ফয়সালা করব। তোমাদের যারা যুদ্ধে নিহত হবে, আমি তাদেরকে আমার জান্নাতে দাখিল করব, আর যারা জীবিত থাকবে, তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করব।

সুতরাং এখন আপনি চাইলে হীনবল হয়ে জিজিয়া প্রদানের শর্ত গ্রহণ করতে পারেন, চাইলে যুদ্ধও করতে পারেন; অথবা ইসলামগ্রহণ করে নিজেকে মুক্তও করতে পারেন।

মুগিরা রাযি.-এর বক্তব্য শেষ হলে ইয়াযদিগার্দ বলেন, 'তুমি আমাকে সম্বোধন করে এসব কথা বললে?' উত্তরে মুগিরা রাযি. বলেন, 'যিনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, আমি তার সঙ্গেই কথা বলেছি। যদি আপনি ছাড়া অন্য কেউ আমার সঙ্গে কথা বলত, তাহলে আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতাম না।'

এরপর ইয়াযদিগার্দ বলেন, 'দূতদেরকে হত্যা করার রীতি নেই। অন্যথায় আমি তোমাদের সবাইকে হত্যা করতাম। আমার কাছে তোমাদের কিছুই পাওয়ার নেই।'

এরপর ইয়াযদিগার্দ তার অনুচরদের বলেন, 'একটুকরি মাটি নিয়ে এসো।' মাটি নিয়ে আসা হলে তিনি বলেন, 'টুকরিটি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্তজনের মাথায় তুলে দাও। তারপর তাদেরকে তাড়িয়ে মাদায়েনের নগরদ্বার দিয়ে বের করে দাও।'

এরপর তিনি প্রতিনিধিদলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'তোমরা তোমাদের সেনাপতির কাছে ফিরে যাও। তাকে গিয়ে জানাও যে, আমি তোমাদের দফারফা করার জন্য রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে তাকে-সহ তোমাদেরকে কাদিসিয়ার গর্তে দাফন করবে এবং তোমাদের সকলকে চূড়ান্ত লাঞ্ছিত করে ছাড়বে। এরপর আমি তাকে তোমাদের দেশেও পাঠাব। আমাদের সাবেক সেনাপতি সাবুর তোমাদেরকে অতীতে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা উপহার দিয়েছিল, রুস্তম তোমাদেরকে তারচেয়েও বেশি কিছু উপহার দেবে।'

এরপর ইয়াযদিগার্দ প্রশ্ন করেন, 'তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত কে?' সকলে চুপ করে থাকলে হজরত আছিম বিন আমর রাযি. মাটির টুকরি

নেওয়ার জন্য অগ্রসর হয়ে বলেন, 'আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত এবং তাদের সর্দার। আমার মাথায় টুকরিটি তুলে দিন।' ইয়াযদিগার্দ সকলকে জিজ্ঞেস করেন, 'তার দাবি কি সত্য?' সকলে সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলে সম্রাটের নির্দেশে টুকরিটি আছিম রাযি.-এর কাঁধে তুলে দেওয়া হয়। আছিম রাযি. টুকরিটি নিয়ে দ্রুত রাজপ্রাসাদ থেকে বের হয়ে যান এবং নিজের বাহনের কাছে পৌঁছে টুকরিটি বাহনে তুলে নেন। এরপর প্রতিনিধিদলের সকলে সেনাপতি সাদের কাছে ফিরে আসেন। আছিম বিন আমর রাযি. সবার আগে তার কাছে পৌঁছান এবং সাদ রাযি.-কে বলেন, 'মহান সেনাপতি! বিজয়ের সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আল্লাহ চাহে তো আমরাই বিজয়ী হব।' এরপর তিনি মাটিগুলো পাথরের ওপর ফেলে দেন এবং সাদের কাছে ফিরে এসে তাকে বিস্তারিত অবহিত করেন। সব শুনে সাদ রাযি. বলেন, 'সকলে সুসংবাদ গ্রহণ করো। আল্লাহ আমাদের হাতে তাদের রাজত্বের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছেন।'

এদিকে ইয়াযদিগার্দের নির্দেশে সেনাপতি রুস্তম এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে, যার অর্ধেকই ছিল অশ্বারোহী সৈনিক। মূল বাহিনীর সঙ্গে আরও ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার ভৃত্য ও সেবক। বাহিনীর সঙ্গে বেশ কয়েকটি হাতিও নেওয়া হয়।

যুদ্ধসরঞ্জাম ও বিলাসসামগ্রীর এক বিশাল বহর নিয়ে রুস্তম মহা সমারোহে মাদায়েন হতে রওনা হয়। সাজসরঞ্জাম পরিমাণে এত বেশি ও ভারী ছিল যে, রাজধানী মাদায়েন থেকে কাদিসিয়া পর্যন্ত একশ ষাট কিলোমিটারের চেয়ে সামান্য বেশি পথ পাড়ি দিতে পারসিক বাহিনীর সময় লাগে প্রায় চার মাস! অর্থাৎ দৈনিক গড়ে মাত্র সোয়া এক কিলোমিটার!

রুস্তমের সামনে মুসলমানদের প্রথম প্রতিনিধি

কাদিসিয়ায় পৌঁছে পারসিক সেনাপতি রুস্তম মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সমঝোতা-আলোচনা করার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাতে অনুরোধ করায় মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সাদ রাযি. শুধু রিবয়ি বিন আমির রাযি.-কে পাঠান। মুসলিম প্রতিনিধির আগমনের পূর্বে রুস্তম তার অনুচরদের অভ্যর্থনা-স্থান প্রস্তুত করতে নির্দেশ দেয়। প্রচুর সাজসজ্জা করা হয়, অতি মূল্যবান ফরাশ ও গালিচা বিছানো হয়, দামি দামি বালিশ ও কুশন-তাকিয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেনাপতি রুস্তম নিজেও তার পূর্ণ রাজকীয়

সাজে সজ্জিত হয়। এর মাধ্যমে সে আগত প্রতিনিধিদলের মাঝে প্রভাব বিস্তার করতে চাচ্ছিল। এরইমধ্যে হজরত রিবয়ি বিন আমির রাযি. তার বর্শায় ভর দিয়ে রুস্তমের দরবারে প্রবেশ করেন। তিনি হাতের বর্শা দিয়ে গালিচা ও কার্পেটে চাপ দিতে দিতে সামনে অগ্রসর হন। রুস্তমের কাছাকাছি পৌঁছতেই প্রহরী তাকে আটকে দিলে তিনি জমিনেই বসে পড়েন এবং হাতের বর্শাটি গালিচায় বিদ্ধ করেন। প্রহরীরা বিবয়ি রাযি.-কে জিজ্ঞেস করে, 'আপনি এরূপ আচরণ কেন করলেন?' তিনি উত্তর দেন, 'আমরা তোমাদের এই বিলাস-সজ্জার ওপর বসা পছন্দ করি না।'

এরপর সেনাপতি রুস্তম তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আপনারা আমাদের দেশে কেন এসেছেন?' উত্তরে এই মহান সাহাবি দীপ্ত কণ্ঠে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন যে, আল্লাহ যাদের তাকদিরে মঞ্জুর করেন, আমরা যেন তাদেরকে সৃষ্টির দাসত্ব-লাঞ্ছনা হতে উদ্ধার করে স্রষ্টার দাসত্ব-গৌরবের পথে নিয়ে আসি; পৃথিবীর সংকীর্ণতা থেকে উভয় জগতের প্রশস্ততার দিকে এবং ভ্রষ্ট ধর্মসমূহের অবিচার হতে ইসলামের ন্যায়-নীতির পথে নিয়ে আসি। আল্লাহ আমাদেরকে তার দ্বীনের নিয়ামত দান করে তার দ্বীনের পথে আহ্বান করার জন্য মানুষের কাছে পাঠিয়েছেন। যারা এ দ্বীন গ্রহণ করবে, আমরা তাদেরকে আপন করে নেব, অভিযান প্রত্যাহার করে তাদের ভূখণ্ড তাদের হাতে রেখেই ফিরে যাব; আর যারা এ দ্বীনের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে, তাদের সঙ্গে আমরা লড়াই করে যাব; যতক্ষণ না আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি লাভ করি।'

'আল্লাহর নির্ধারিত প্রতিশ্রুতি কী?' রুস্তম জিজ্ঞেস করে।

রিবয়ি বিন আমির রাযি. উত্তর দেন—

'অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে শহিদ হলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি জান্নাত আর জীবিত থাকলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি 'বিজয়-সুবাস'।'

'আমি আপনার বক্তব্য শুনলাম। এখন এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য কি আপনারা কিছুদিনের জন্য সিদ্ধান্ত মুলতবি রাখতে পারবেন?'

'হ্যাঁ, আপনি কদিন সময় চান, বলুন; এক দিন, নাকি দুদিন?' রিবয়ি রাযি. জিজ্ঞেস করেন।

'না, বরং এতটুকু সময় দিন, যেন আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পত্রযোগাযোগ করে সিদ্ধান্ত নিতে পারি।'

'আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য যে আদর্শ রেখে গেছেন এবং আমাদের পূর্ববর্তীগণ যা অনুযায়ী আমল করেছেন, তা হলো—আমরা শত্রুপক্ষকে তিন দিনের বেশি অবকাশ দিই না। সুতরাং আমরা তিন দিন সিদ্ধান্তের বিষয়টি মুলতবি রাখব। এরমধ্যেই আপনি আপনার নিজের এবং আপনার জাতির বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চেষ্টা করুন। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার পর আপনাদের তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বেছে নিতে হবে—হয় ইসলামগ্রহণ করবেন, তাহলে আমরা আপনাদের মাতৃভূমি ছেড়ে চলে যাব; কিংবা জিজিয়া প্রদান করবেন, তাহলে আমরা তা গ্রহণ করে আপনাদের ছাড় দেবো। যদি আপনাদের নিরাপত্তা-সাহায্য প্রয়োজন না হয়, আমরা এখান থেকে চলে যাব; আর যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা আপনাদেরকে নিরাপত্তা দেবো। আর এই দুই বিকল্পের একটিও গ্রহণ না করলে চতুর্থ দিন যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হবে। মাঝের এই দিনগুলোতে আমরা যুদ্ধের সূচনা করব না; যদি না আপনারা আগে আমাদের ওপর আক্রমণ করেন। এ বিষয়ে আমি আপনাকে আমার সকল সঙ্গীর পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি।' রিবয়ি রাযি. চূড়ান্ত কথা বলে দেন।

এরপর রুস্তম জিজ্ঞেস করে, 'আপনি কি আপনার জাতির শাসক ও সর্দার?'

রিবয়ি রাযি. উত্তর দেন, 'না; কিন্তু মুসলমানরা পরস্পর এক দেহের মতো। মুসলমানদের সাধারণ সদস্যও সর্বোচ্চ সদস্যের প্রতিরক্ষায় সচেষ্ট থাকে।'

আলোচনা শেষে হজরত রিবয়ি রাযি. প্রস্থান করলে রুস্তম তার উপদেষ্টাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের কী মত? তোমরা কি এই ব্যক্তির কথার চেয়ে সুস্পষ্ট ও মূল্যবান কোনো কথা কখনো শুনেছ?' উপদেষ্টারা উত্তর দেয়, 'আল্লাহর পানাহ! আপনি কিছুতেই এসব কথায় প্রভাবিত হবেন না; এই কুকুরের কথায় আপনার দ্বীন পরিত্যাগ করবেন না। আপনি তার পরিচ্ছদ দেখেননি?'

উপদেষ্টাদের উত্তর শুনে সেনাপতি রুস্তম বিক্ষুব্ধ কণ্ঠে মন্তব্য করে—'ধিক তোমাদের! পোশাক-পরিচ্ছদ দিয়ে মানুষের মান বিচার করো না। তার

কথা, মতামত ও চরিত্র দেখো। আরবরা পোশাক-পরিচ্ছদ ও আহারসামগ্রীকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করে চলে।'

অভিজ্ঞ সেনাপতি রুস্তম যদিও বুঝতে পারছিল যে, মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ানোর পরিণতি মোটেও কল্যাণকর হবে না; কিন্তু পারসিকরা তার দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করছিল না।

এরপর রুস্তম সংলাপের জন্য আরেকজন প্রতিনিধি পাঠাতে অনুরোধ করলে মুসলিম সেনাপতি সাদ রাযি. এবার হুযায়ফা বিন মিহছান রাযি.-কে পাঠান। তার সঙ্গেও রিবয়ি বিন আমরের ন্যায় একই ধরনের কথোপকথন হয়। তৃতীয়বার রুস্তম একই অনুরোধ করায় সাদ এবার পাঠান মুগিরা বিন শুবা রাযি.-কে। মুগিরা ছিলেন কুশলতা ও বিচক্ষণতা এবং বাগ্মিতা ও বাক্‌পটুতায় সমকালীন আরবের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি। বিশালদেহী মুগিরা রাযি. পারসিকদের ভাষায়ও সমান পারদর্শী ছিলেন। রুস্তমের তাঁবুতে প্রবেশ করার পর মুগিরা সামনে অগ্রসর হয়ে রুস্তমের সুসজ্জিত আসনে তার পাশেই বসে পড়েন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে পারসিকরা হইচই শুরু করে এবং মুগিরা রাযি.-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টানতে শুরু করে।

তখন হজরত মুগিরা রাযি. তাদেরকে বলেন—'থামো, হট্টগোল করো না। তোমাদের সম্পর্কে অনেক কিছুই শুনেছি। কিন্তু আমি তোমাদের চেয়ে নির্বোধ কোনো সম্প্রদায় দেখিনি। আমরা আরবরা পরস্পর সমান; কেউ কারও দাসত্ব করি না। অবশ্য কেউ যুদ্ধে বন্দি হলে তার কথা ভিন্ন। আমি তো মনে করেছিলাম, আমরা যেমন পরস্পর সহমর্মিতা প্রদর্শন করি, তোমরাও তেমন কর। আমার সঙ্গে এমন আচরণ না করে আমাকে আগে জানালেই পারতে যে, তোমাদের মধ্যে প্রভুত্ব ও দাসত্বের স্তর রয়েছে এবং প্রভুর আসনে দাসরা বসতে পারে না। তাহলে আমি এখানে বসতাম না, তোমাদের কাছে আসতামও না। তোমরাই তো আমাকে ডেকেছ। আজ জানলাম যে, তোমাদের অবস্থা ক্ষয়িষ্ণুপ্রায় এবং তোমরা প্রকৃতপক্ষে পরাধীন ও পরাজিত এক জাতি। এ ধরনের মেধা ও মনোভাব নিয়ে কোনো রাজত্ব টিকে থাকতে পারে না।'

মুগিরা রাযি.-এর বক্তব্য শুনে উপস্থিত সাধারণ সৈন্যরা বলতে লাগল, 'আল্লাহর শপথ! আরবি ব্যক্তিটি বাস্তব সত্যই বলেছে।'

অপরদিকে উপস্থিত পারস্য সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—'এই লোক তো এমন কথার তির ছুড়েছে যে, আমাদের ক্রীতদাসেরা সব তার প্রতি ধাবিত হয়ে যাবে।'

যুদ্ধ বিলম্বিত করার জন্য এই সংলাপ ছিল রুস্তমের পক্ষ থেকে শেষ প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় তার সামনে আর কোনো বাহানার সুযোগ রইল না এবং মুসলমানদের সঙ্গে সামরিক মোকাবিলা অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. তখন সায়াটিকা, ফোঁড়া ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত ছিলেন। এ কারণে তিনি বসতে বা কোনো বাহনজন্তুতে আরোহণ করতে পারতেন না। তাই তিনি কিদ্দিস নামক একটি দুর্গের চূড়ায় আরোহণ করে একটি বালিশে বুকে ভর দিয়ে অধোমুখ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতি নজর রাখছিলেন। ময়দানে যুদ্ধপরিচালক হিসেবে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছিল খালিদ বিন উরফাতাহ রাযি.-কে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধের প্রাত্যহিক বিবরণ

প্রথম দিন : আরমাছ দিবস

[১৩ শাবান, পঞ্চদশ হিজরি]
[১৯ সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

রীতি অনুযায়ী পারসিক সেনাপতি রুস্তম মুসলমানদের কাছে বার্তা পাঠায় যে, তোমরা নদী পাড়ি দিয়ে এপারে চলে এসো, নয়তো আমরা ওপারে চলে যাই। মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে উত্তর পাঠানো হয়, তোমরাই এপারে চলে এসো।

মুসলিম সেনাপতি সাদ রাযি. তার সৈন্যদেরকে আপন অবস্থানে অটল-অবিচল থাকার নির্দেশ দেন। তিনি ঘোষণা করেন, জোহর নামাজ পর্যন্ত কেউ সামান্য অগ্রসর হয়ো না। জোহর আদায় শেষ হলে আমি একটি তাকবির দেবো। তখন তোমরাও তাকবির দেবে এবং নিজেদের জুতার ফিতা বেঁধে নিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। মনে রাখবে, তোমাদের পূর্বে কোনো জাতিকে তাকবির-নিয়ামত দান করা হয়নি; তোমাদের দৃঢ়পদ রাখতে ও শক্তি জোগাতে এই নিয়ামত দান করা হয়েছে। এরপর আমি যখন দ্বিতীয় তাকবির দেবো, তোমরাও তাকবির দেবে এবং যুদ্ধ শুরু করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যাবে। তারপর আমি তৃতীয় তাকবির দিলে

তোমরাও তাকবির দেবে। তখন যেন তোমাদের অশ্বারোহী অংশ প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে হটিয়ে দেওয়ার জন্য পূর্ণ তৎপর ও উদ্যমী হয়ে যায়। তারপর আমি যখন চতুর্থ তাকবির দেবো, তখন তোমরা দাঁতে দাঁত চেপে অস্ত্র নিয়ে একযোগে প্রতিপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আর মুখে বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

একের পর এক তাকবিরের ধ্বনিতে কাদিসিয়া প্রান্তরের দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত হয়ে ওঠে। তৃতীয় তাকবিরের পর গালিব বিন আবদুল্লাহ আসাদি সামনে অগ্রসর হয়ে প্রতিপক্ষকে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানান। তার আহ্বানে পারসিক বাহিনীর হরমুজ নামক জনৈক সেনাপতি অগ্রসর হয়। গালিব তাকে সামান্য সুযোগ না দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বন্দি করে মুসলিম বাহিনীর সারিতে নিয়ে আসেন।

মুসলিম বাহিনী চতুর্থ তাকবিরের প্রতীক্ষায় থাকতেই পারসিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মূলকেন্দ্রে আক্রমণ চালায়। বাহিনীর এ অংশে ছিল মুসলিম বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ যোদ্ধা-গোষ্ঠী বনু বাজিলার সদস্যগণ। তাদের পাশেই ছিল বনু কিনদা। এই দুই গোত্রই মুসলিম বাহিনীর এক-চতুর্থাংশের (৮০০০) প্রতিনিধিত্ব করছিল।

পারসিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড হামলা চালায়। তাদের হাতিগুলোর কারণে মুসলিম বাহিনীর ঘোড়াগুলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে মুসলিম সৈন্যগণ ঘোড়া হতে নেমে যুদ্ধ করতে শুরু করে। সেনাপতি সাদ রাযি. তার অবস্থানস্থল থেকে বনু আসাদকে বাজিলা গোত্রের প্রতিরক্ষায় অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেন। তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের গোত্র বনু আসাদের অবস্থান ছিল বাজিলা গোত্রের ডান পার্শ্বে। তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল তিন হাজার। সেনাপতির আদেশে বনু আসাদ যুদ্ধক্ষেত্রে অসাধারণ আনুগত্যের পরিচয় দেয় এবং মুসলিম ভাইদের রক্ষা করার জন্য বীরত্বের সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। শত্রুপক্ষকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে আরমাছ দিবসে কেবল বনু আসাদেরই পাঁচশ যোদ্ধা শহিদ হয়।

সেনাপতি সাদ রাযি.-এর নির্দেশনা অনুযায়ী তখনও মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য অংশ আপন আপন স্থানে স্থির ছিল। এরপর সাদ রাযি. যখন চতুর্থ তাকবির উচ্চারণ করেন, আল্লাহর সৈনিকরা বজ্র নিনাদে তাদের মুসলিম ভাইদের রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ পারসিক

বাহিনীর হাতিগুলোর পেটের সঙ্গে বাঁধা বাক্সগুলোর বন্ধনী কেটে ফেলতে সক্ষম হয়। ফলে বাক্সগুলো উল্টে পড়ে যায় এবং বাক্সের মধ্যে অবস্থানরত সৈনিকেরা নিহত হয়।

কাদিসিয়া যুদ্ধের প্রথম দিন যুদ্ধের পাল্লা উভয় দিকে দোদুল্যমান ছিল।

খানাসা রাযি.-এর আপন পুত্রদেরকে কৃত অসিয়ত

আরমাছ দিবসের রাতে খানাসা রাযি. তার চার পুত্রকে একত্র করে বলেন—'তোমরা স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করেছ এবং নিজ ইচ্ছায় লড়াই করছ। কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জন্য যে অকল্পনীয় আজর রেখেছেন, তা তোমরা ভালো করেই জানো। মনে রেখো, এই নশ্বর জগতের চেয়ে চিরস্থায়ী জগৎ শ্রেয়। আল্লাহ চাহে তো তোমরা যদি আগামীকাল সকালে সুস্থ ও নিরাপদ অবস্থায় উপনীত হও, তাহলে তোমরা অভিনিবেশ সহকারে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অগ্রসর হবে এবং আল্লাহর সাহায্য কামনা করে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যখন দেখবে, যুদ্ধ প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে এবং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের রূপ নিয়েছে, তখন যুদ্ধের একেবারে মূলকেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হবে এবং প্রতিপক্ষের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাহলেই তোমরা পরকালের চিরস্থায়ী জগতের মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী হবে।'

আল্লাহু আকবার! ঈমান মানুষের অন্তরে কী বিস্ময়কর পরিবর্তনই-না সৃষ্টি করে! এই খানাসা জাহিলি যুগে তার সাখর নামক এক ভাইয়ের বিচ্ছেদ-শোকে রচনা করেছিলেন এক বিরল শোকগাথা; ভাষা-সৌকর্য ও অত্যুচ্চ্য কাব্যমানের কারণে আরবি সাহিত্যে যা অনন্যসাধারণ স্থান লাভ করেছে। ইসলামগ্রহণ করার পর আজ সেই খানাসা রাযি. তার চার পুত্রের প্রত্যেককে আল্লাহর রাস্তায় আপন জান কুরবানি করতে আহ্বান জানাচ্ছেন!

দ্বিতীয় দিন : আগওয়াছ দিবস

[১৪ শাবান, পঞ্চদশ হিজরি]
[২০ সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

শাম থেকে সহায়ক বাহিনীর আগমন

এ দিন শাম থেকে রওনা হওয়া সহায়ক বাহিনীর অগ্রবর্তী অংশ কাদিসিয়ায় পৌঁছে যায়। অগ্রবর্তী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন হজরত কা'কা' বিন আমর রাযি.। তার সঙ্গে ছিল এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য। আগওয়াছ দিবসের সূর্যোদয়ের সময় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছায়।

প্রতিপক্ষের অন্তরে ভীতি সঞ্চারের জন্য কা'কা' এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করেন। তিনি তার সঙ্গী এক হাজার সৈন্যকে দশ-দশজন করে একশটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেক অংশকে বলে দেন, যখন তারা মুসলিম শিবিরের দৃষ্টিপথে পৌঁছে যাবে, তখন একটি অংশ শিবিরে প্রবেশ করবে। প্রথম দশজন নির্ধারিত দূরত্ব অতিক্রম করার পর পরবর্তী দল তাদের অনুগামী হবে। এভাবে একের পর এক দলের আগমনে যে ধূলিঝড়ের সৃষ্টি হবে, তাতে সূর্যের আলো ঢেকে যাবে এবং শত্রুপক্ষের চোখে আগত মুসলিম বাহিনীকে অনেক বড় মনে হবে।

দ্বিতীয় দিনের শুরুতে কা'কা' রাযি. সারি থেকে বেরিয়ে এসে প্রতিপক্ষকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান জানান। পারসিক বাহিনীর সারি থেকে সেতু-যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বাহমান দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য অগ্রসর হয়। কা'কা' রাযি. প্রথমে তাকে চিনতে না পেরে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করেন। একটু পরেই তাকে চিনতে পেরে তিনি চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'আবু উবায়দের ঘাতক, এখনই প্রতিশোধ নিচ্ছি!' এ কথা বলেই তিনি এক আঘাতে বাহমানকে শেষ করে দেন। এভাবে দ্বিতীয় দিনের সূচনা হয় মুসলিম বাহিনীর সফলতার মাধ্যমে। প্রকৃতপক্ষে এদিন মুসলিম বাহিনীর মাঝে তিনটি নতুন বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল।

- বাহিনীতে বিশিষ্ট সাহাবি কা'কা' রাযি.-এর উপস্থিতি। খলিফা উমর রাযি. তার সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, 'যে বাহিনীতে কা'কা' রয়েছে, সে বাহিনী পরাজিত হবে না।' তিনি আরও বলেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে কা'কা'র কণ্ঠস্বর এক হাজার অশ্বারোহী সৈনিকের কাজ দেয়।'

- প্রথম দিন মুসলিম বাহিনী কর্তৃক হস্তিবাহিনীর বাক্সগুলো ধ্বংস করে ফেলায় যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির অনুপস্থিতি। এ দিন পারসিকরা বাক্সগুলো মেরামত করছিল।
- কা'কা' রাযি.-এর গৃহীত একটি কৌশল। তিনি ও তার জ্ঞাতি ভাইয়েরা এদিন মুসলিম বাহিনীর উটগুলোকে বোরকার মতো করে চাদর পরিয়ে দেন। ফলে উটগুলোকে দেখতে ভয়ানক লাগছিল।

ঐতিহাসিক তাবারি রহ. লিখেছেন—

> উটগুলো শত্রুপক্ষের ছোট-বড় যে অংশের দিকেই অগ্রসর হতো, তাদের ঘোড়াগুলো ভয়ে পালাতে শুরু করত। মুসলিম বাহিনীর অন্যান্য অংশের সৈন্যগণ এ দৃশ্য দেখে একই পদ্ধতি অবলম্বন করল। ফলাফল এই দাঁড়াল যে, আরমাছ দিবসে প্রতিপক্ষের হাতির কারণে মুসলিম বাহিনী যে পরিমাণ ক্ষতির শিকার হয়েছিল, আগওয়াছ দিবসে পারসিক বাহিনী ঘোমটা পরিহিত উটের কারণে তার চেয়েও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো।[১২৩]

এদিন পারসিক বাহিনীর দশ হাজার সৈন্য নিহত হয়। মুসলিম বাহিনী হারায় দু-হাজার সৈন্য, যাদের মধ্যে খানাসার চার-পুত্রও ছিলেন। পুত্রদের শহিদ হওয়ার সংবাদ পেয়ে খানাসা রাযি. বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে তাদের শহিদি মৃত্যু দ্বারা মর্যাদাশীল করেছেন। আমি আমার রবের কাছে আশা করি যে, তিনি তাদেরকে আপন রহমতের ছায়াতলে স্থান দেবেন।'

তৃতীয় দিন : আম্মাস দিবস

[১৫ শাবান, পঞ্চদশ হিজরি]
[২১ সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

কা'কা' রাযি.-এর সঙ্গে শাম থেকে রওনা হওয়া সহায়ক বাহিনীর বাকি সদস্যগণ তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে পৌঁছায়নি। এদিকে সারাদিনের প্রচণ্ড যুদ্ধের পরও বীর যোদ্ধা কা'কা'র চোখে ঘুম নেই। তিনি সেনাপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে মুসলিম বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি ও শত্রুপক্ষের মাঝে

---

১২৩. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর-রুসুলি ওয়াল-মুলুক*, ৩/৫৪৫।

ভীতি সঞ্চারের জন্য নতুন আরেকটি কৌশল গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কা'কা' তার এক হাজার অশ্বারোহী সৈনিককে নির্দেশ দেন, তারা যেন অন্ধকারের মধ্যেই সবার অগোচরে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ে এবং যেদিক থেকে সাহায্য আসার কথা, সেদিকে লুকিয়ে থাকে। তিনি এক হাজার সৈন্যকে একশজন করে দশটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং নির্দেশ দেন যে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা একদল একদল করে ময়দানে উপস্থিত হবে। প্রত্যুষে অশ্বারোহী সৈন্যগণ নির্দেশনা মোতাবেক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করে। এরইমধ্যে হাশিম বিন উতবা বিন আবু ওয়াককাসের নেতৃত্বে শামের অবশিষ্ট সহায়ক বাহিনীও পৌঁছে যায়। হাশিম কা'কা'র কৌশলের কথা জানতে পেরে তার সঙ্গীদের নিয়ে একই কৌশল অবলম্বন করেন। পারসিক বাহিনীর সৈন্যদের অন্তরে ভীতি সৃষ্টিতে এ কৌশল বিরাট ভূমিকা রাখে।

এদিন পারসিক বাহিনীর হাতিগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে আসে। হাতিগুলোর প্রতিরক্ষার জন্য তারা প্রতিটি হাতির পাশে একদল পদাতিক সৈন্য মোতায়েন করেছিল। হস্তিবাহিনীর প্রত্যাবর্তনে পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে মুসলিম বাহিনীর সর্বাধিনায়ক সাদ রাযি. নওমুসলিম কয়েকজন পারসিককে তলব করে জিজ্ঞেস করেন, হাতির শরীরে কি এমন কোনো স্থান আছে, যেখানে আঘাত করলে হাতিকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বের করে দেওয়া সম্ভব হবে?

তারা জানায়, হ্যাঁ, চোয়াল ও চোখে আঘাত করতে পারলে হাতিগুলো আর যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো কাজে লাগবে না। সাদ রাযি. তৎক্ষণাৎ কা'কা' ও তার ভাই আছিমকে বার্তা পাঠান, 'তোমরা দুজন হস্তি-বাহিনীর মূল কর্তা শ্বেত হস্তিটিকে শেষ করবে।' আর পদাতিক বাহিনীর প্রধান হামমাল বিন মালিক ও রাবিল বিন আমরকে বার্তা পাঠান, 'তোমরা উভয়ে হস্তিবাহিনীর আরেক প্রধান উট পাঁচড়াবিশিষ্ট উটটিকে শেষ করবে।'

নির্দেশ অনুযায়ী উভয় দল বর্শা নিক্ষেপ করে হাতিদুটির চোখ নষ্ট করতে এবং শুঁড় কেটে ফেলতে সক্ষম হন। ফলে হাতিদুটি বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং আরোহী সৈন্যদের ফেলে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করে। এই হাতিদুটি অন্যান্য হাতিগুলোকে পরিচালনা করত। ফলে সেগুলোও হতবুদ্ধি হয়ে নেতাদ্বয়ের অনুসরণ করে।

আম্মাছ দিবসে দিনরাত একটানা চব্বিশ ঘণ্টা যুদ্ধ চলে।

চতুর্থ দিন : কাদিসিয়া দিবস

[১৬ শাবান, পঞ্চদশ হিজরি]
[২২ সেপ্টেম্বর, ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দ]

মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দ এ সময় একটানা যুদ্ধ অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কারণ, ইতিমধ্যে পারসিক-শক্তির মধ্যে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। কা'কা' রাযি.-ও পূর্বের ন্যায় মুসলিম বাহিনীর উদ্যম বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট ছিলেন। এদিন কা'কা' ও তার সঙ্গীগণ পারসিক সেনাপতি রুস্তমকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন এবং সফল হন। রুস্তম নিহত হওয়ায় পারস্য-বাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক তাবারি রহ. আবাসি গোত্রের জনৈক ব্যক্তির বরাতে লিখেছেন—

> কাদিসিয়ার দিন পরাজিত হওয়ার পর পারসিক বাহিনী এমন বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল, যা ইতিপূর্বে কোনো জাতি হয়নি। তারা নির্বিচারে নিহত হতে থাকে। এমনকি যখন কোনো মুসলিম সৈন্য কোনো পারসিক সৈন্যকে আহ্বান করত, সে মুসলিম সৈন্যের সামনে দাঁড়িয়ে যেত এবং মুসলিম সৈন্য তাকে সহজেই হত্যা করত। এমনও হয়েছে যে, মুসলিম সৈন্য পারসিক সৈন্যের অস্ত্র নিয়ে তার অস্ত্র দিয়েই তাকে হত্যা করেছে। আবার এমনও হয়েছে যে, দুজন পারসিক সৈন্যকে আদেশ করা হয়েছে, তোমরা একে অপরকে হত্যা কর। তারা নির্দ্বিধায় নির্দেশ পালন করেছে। কয়েকজনকে একসঙ্গে একই নির্দেশ প্রদান করা হলে তারাও তা পালন করেছে।[১২৪]

কাদিসিয়া দিবসের আছরের সময় হওয়ার পূর্বেই বিজয় মুসলিম বাহিনীর পদচুম্বন করে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাড়ে আট হাজার সৈন্য শহিদ হয়। অপরদিকে পারসিক বাহিনীর নিহতের সংখ্যা ছিল গণনাতীত।

প্রধান সেনাপতি সাদ রাযি. বিজয়ের বিস্তারিত বিবরণসহ খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর কাছে বার্তা প্রেরণ করেন। তিনি লেখেন—

---

১২৪. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৩/৫৬৯।

হামদ ও সালাতের পর, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে পারসিকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন এবং দীর্ঘ যুদ্ধ ও প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিস্থিতির পর তাদেরকে সেই পরিণতির মুখোমুখিই করেছেন, যার মুখোমুখি ইতিপূর্বে তাদের স্বধর্মীয়রা হয়েছিল। তারা এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় এত বিশাল সৈন্যসমাবেশ ঘটিয়েছিল যে, ইতিপূর্বে কেউ তা দেখেনি। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে তা তাদের কোনো কাজে আসেনি। বরং তাদের সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র আল্লাহ তাআলা তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মুসলমানদের দান করেছেন। যুদ্ধশেষে মুসলিম বাহিনী তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে বিভিন্ন নদীনালা, বন-প্রান্তর ও ঘাঁটিতে গিয়েছে। মুসলিম বাহিনীর সাইদ বিন উবায়দ আল-কারি ও অমুক অমুক শাহাদাত বরণ করেছেন। এ ছাড়াও এমন অনেক মুসলিম মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন, যাদের নাম-পরিচয় আমরা জানি না; কিন্তু আল্লাহ তাদের সকলের পরিচয় জানেন। রাতের আঁধারে তারা মধুমক্ষিকার গুঞ্জরনের ন্যায় গুনগুন করে কুরআন তেলাওয়াত করত। তারা ছিল মুসলিম বাহিনীর সিংহ। বনের সিংহও সাহস ও বীরত্বে তাদের সঙ্গে তুল্য নয়। মুসলিম বাহিনীর যারা শহিদ হয়েছে এবং যারা জীবিত রয়েছে, উভয় দলের মাঝে শাহাদাতের ফজিলত ব্যতীত কোনো স্তর-পার্থক্য নেই। একদলের ভাগ্যে (কাদিসিয়ার রণক্ষেত্রে) শাহাদাতের গৌরব লেখা ছিল, অপরদলের ভাগ্যে ছিল না।

যুদ্ধশেষে মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের মাঝে গনিমত-সম্পদ বণ্টন করা হয়। প্রত্যেকেই প্রচুর সম্পদ লাভ করে।

এরপর খলিফার নির্দেশে মুসলিম বাহিনী উত্তর দিকে মাদায়েনের পথে অগ্রসর হয়। উল্লেখযোগ্য কোনো প্রতিরোধের সম্মুখীন হওয়া ব্যতিরেকেই তারা কুফা নগরী জয় করে। অভিযান অব্যাহত রেখে একপর্যায়ে মুসলিম বাহিনী পৌঁছায় বাহুরাসীর নগরীতে। মাদায়েনের আগে এটিই ছিল শেষ দুর্গ এবং অতি সুরক্ষিত একটি নগরী। দীর্ঘ প্রায় ছয় মাস মুসলিম বাহিনী নগরীটি অবরোধ করে রাখে। এখানেই মুসলিম বাহিনী কাদিসিয়া যুদ্ধে

লব্ধ পারসিকদের অস্ত্রশস্ত্র প্রথমবারের মতো ব্যবহার করে এবং দুর্গপ্রাচীর ধ্বংস করতে মিনজানিক ব্যবহার করে।

একটি চমকপ্রদ ঘটনা

ঐতিহাসিক তাবারি রহ. উনায়স বিন হুলায়স-সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—

> আমরা বাহুরাসীর নগরী অবরোধ করে রেখেছিলাম। একদিন অবরুদ্ধ পারসিকদের পক্ষ হতে জনৈক দূত আগমন করল। সে বলল, আমাদের শাসক তোমাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করতে রাজি আছেন এবং তোমাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি এই শর্তে সন্ধিচুক্তি করতে রাজি আছ যে, আমাদের এখান থেকে দজলা পর্যন্ত ভূখণ্ড ও পাহাড় আমাদের অধিকারে থাকবে আর দজলা থেকে তোমাদের পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত বাকি পুরো এলাকা তোমাদের অধিকারে থাকবে? তোমরা কি এতেও তুষ্ট হবে না?! আল্লাহ তোমাদের উদর পূর্ণ না করুন!
>
> দূতকে উত্তর প্রদানের জন্য আমাদের মধ্য হতে আবু মুফাজ্জার ইবনুল আসওয়াদ বিন কুতবা অগ্রসর হলেন। আল্লাহ তাআলা তার জবান হতে এমন এক উত্তর বের করে দিলেন, যা না আমরা জানি, না তিনি জানেন! দূত ফিরে গেল। কিছুক্ষণ পর আমরা দেখতে পেলাম, পারসিকরা নগরী ছেড়ে পালিয়ে নদীপথে মাদায়েনে চলে যাচ্ছে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আবু মুফাজ্জার! আপনি দূতকে কী বলেছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি নিজেও জানি না যে, কী বলেছি। এতটুকু মনে আছে যে, আমার ওপর এক আশ্চর্য প্রশান্তি ও আত্মসমাহিতভাব বিরাজ করছিল। আর আমার বিশ্বাস—আমার মুখ থেকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এমন কোনো উত্তরই বের হয়েছে, যা কল্যাণকর ছিল।' তারপরও সকলে বিস্ময়ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছিল—কীভাবে আবু মুফাজ্জারের একটিমাত্র কথায় বাহুরাসীর নগরীর প্রতিরক্ষা-বাহিনী নগরী ফেলে মাদায়েনে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো?!

কিছুক্ষণ পর জনৈক দুর্গবাসী চিৎকার করে নিরাপত্তা প্রার্থনা করল। সে বলল, 'নগরঅভ্যন্তরে কেউ অবশিষ্ট নেই; তারপরও আপনারা কেন ভেতরে প্রবেশ করছেন না?!' লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'পারসিকরা পালিয়ে গেল কেন?'

সে উত্তর দিলো, আমাদের শাসক আপনাদের কাছে একটি সন্ধিপ্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। আপনারা তাকে উত্তর দিয়েছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আমাদের কোনো সন্ধি হবে না, যতক্ষণ না আমরা কুছা নগরীর জাম্বির (কাগজি লেবু) দিয়ে আফরিযিন ফুলের মধু পান করব। এ উত্তর শুনে আমাদের শাসক বলেছেন, হায়! হায়! আল্লাহর শপথ! তাদের মুখে তো ফিরেশতারা কথা বলছে! ফিরেশতারাই আরবদের পক্ষ থেকে আমাদেরকে উত্তর দিচ্ছে। আর এমনটি না হয়ে থাকলে এই লোকটির জবানে ইলহাম হচ্ছে, যেন আমরা এখান থেকে চলে যাই। এরপর সকলে পালিয়ে যায়!

বাহুরাসীর নগরী ষোড়শ হিজরি সনের সফর মাসে (৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) বিজিত হয়।

অশ্বপৃষ্ঠে দজলা পাড়ি!

তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে পৌঁছতে মুসলিম বাহিনীর সামনে তখন বাধা কেবল দজলা নদী। দজলা ছিল ছয় মিটার গভীর একটি প্রশস্ত ও খরস্রোতা নদী। মুসলিম বাহিনীর সদস্যদের প্রবল উদ্দীপনা সত্ত্বেও সেনাপতি সাদ প্রথমে দজলা পাড়ি দিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। এ সময় নওমুসলিম একদল পারসিক নাগরিক এসে সাদ রাযি.-কে দজলার তুলনামূলক অগভীর একটি অংশ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু এরপরও তিনি দ্বিধায় ভুগছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা তার দ্বিধা দূর করে দেন এবং তিনি সিদ্ধান্ত নেন, প্রথমে পুরো বাহিনীর পরিবর্তে ক্ষুদ্র একটি অংশ নদী পার হবে। তিনি ঘোষণা করেন, কারা আমাদের জন্য নদীর অপর তীরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রথমে নদী পাড়ি দিতে রাজি আছ? তখন কা'কা' বিন আমর রাযি.-এর সহোদর আছিম রাযি. অগ্রসর হন। তার সঙ্গে এগিয়ে আসেন আরও ছয়শ জানবাজ দুঃসাহসী মুসলিম সৈন্য। আছিম ও তার সঙ্গীরা এক বিরল দুঃসাহসী উদ্যোগ নেন এবং ঘোড়ার পিঠে চড়েই নেমে পড়েন খরস্রোতা দজলার বুকে।

মুসলিম সৈন্যদেরকে অশ্বপিঠে চড়েই দজলায় নামতে দেখে পারসিকরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তারা মুসলিম বাহিনীকে বাধা দিতে চাইলেও পরাজিত হয় এবং মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই নদীর পূর্ব তীরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর সেনাপতি সাদ রাযি. পুরো বাহিনীকে দজলা পাড়ি দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি সকলকে এই দোয়া পাঠ করতে বলেন—

نَسْتَعِيْنُ بِاللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ.

আমরা আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করছি এবং তার প্রতিই ভরসা রাখছি। আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর তিনিই সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক। মহান-মহীয়ান আল্লাহপ্রদত্ত শক্তিসামর্থ্য ব্যতিরেকে আমাদের কোনো শক্তিসামর্থ্য নেই।

সেনাপতির আদেশে মুসলিম বাহিনীর সকলে নদীবক্ষে নেমে পড়ে। নদী পাড়ি দেওয়ার সময় সকলে নিশ্চিন্তে নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। সাদ রাযি. সকলকে দুজন দুজন করে একসঙ্গে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। খরস্রোতা দজলা পাড়ি দেওয়ার সময় মুসলিম বাহিনীর কোনো সদস্য পানিতে ডুবেনি, তাদের কোনো সরঞ্জামও হারায়নি।[১২৫] এ দৃশ্য দেখে পারসিক সৈন্যরা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, আল্লাহর শপথ! তোমরা তো কোনো মানুষের বিরুদ্ধে লড়ছ না; তোমরা যে যুদ্ধ করছ একদল জিনের বিরুদ্ধে!

নদী পাড়ি দেওয়ার সময় সেনাপতি সাদ রাযি.-এর পাশে ছিলেন বিখ্যাত সাহাবি সালমান ফারসি রাযি.। তারা দুজনও ঘোড়ার পিঠে চড়ে নদী পাড়ি দেওয়ার সময় পরস্পর কথা বলছিলেন। এ সময় সাদ বলেন, 'এ তো পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার ফয়সালা। আমাদের জন্য

---

১২৫. মালিক বিন আমির নামক জনৈক মুসলিম যোদ্ধার একটি বাটি দজলা পাড়ি দেওয়ার সময় নদীতে পড়ে গিয়েছিল। তিনি তখনই আল্লাহর কাছে দোয়া করেন—হে আল্লাহ, আমার সঙ্গীদের মধ্যে আমার পরিণতি যেন এমন না হয় যে, আমার সামানটি হারিয়ে যাবে। পরে বাটিটি নদীর ওপারে পাওয়া যায় এবং অন্যরা তা উঠিয়ে মালিক বিন আমিরকে ফেরত দেয়। দ্রষ্টব্য : ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৬৪।

আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি কত উত্তম কর্মবিধায়ক! আল্লাহর শপথ! যদি সৈন্যদলের মধ্যে কোনো সত্যদ্রোহী না থাকে এবং যদি পুণ্যের ওপর প্রাধান্য পায় এমন পাপ না থাকে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তার বন্ধুদেরকে সাহায্য করবেন, তার দ্বীনকে বিজয়ী করবেন এবং অবশ্যই তার শত্রুদের পরাজিত করবেন।'

তখন সালমান রাযি. তাকে বলেন, 'ইসলাম চির-তরুণ ধর্ম। আল্লাহর শপথ! ইসলামের অনুসারীদের জন্য যেভাবে স্থলভাগ অনুগত হয়ে গেছে, অনুগত হয়ে গেছে জলভাগও। যে মহান সত্তার হাতে আমি সালমানের প্রাণ, তার শপথ করে বলছি—মুসলিম বাহিনী যেমন দলবদ্ধভাবে পানিতে নেমেছে, তেমন দলবদ্ধভাবেই তীরে উঠবে।'

মুসলিম বাহিনীর আগমন-সংবাদ পেয়ে কিসরাসহ পারস্য সাম্রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও মাদায়েনের অধিবাসীরা মাদায়েন ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলিম বাহিনী মাদায়েনে প্রবেশ করে দেখতে পায়, পুরো নগরী জনশূন্য। কিসরার প্রাসাদের কাছে পৌঁছে হজরত সাদ রাযি. এই আয়াত তেলাওয়াত করেন—

﴿كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ وَّ زُرُوْعٍ وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّ نَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ كَذٰلِكَ ۖ وَ اَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ﴾

তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছে কত উদ্যান ও ঝরনা! কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য বসতবাড়ি! এবং কত বিলাসসামগ্রী, যা নিয়ে তারা আনন্দ-ফুর্তি করত। এরূপই হয়েছিল তাদের পরিণাম। আর আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ন এক সম্প্রদায়কে। [সুরা দুখান : ২৫-২৮]

ষোড়শ হিজরি সনের সফর মাসেই (৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে) মাদায়েন বিজিত হয়।

সাদ রাযি. ইসলামের দাওয়াত দিতে হজরত সালমান রাযি.-কে পারসিকদের কাছে প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ ইসলামগ্রহণের পরিবর্তে জিজিয়া প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মাদায়েনে মুসলিম বাহিনী প্রভূত গনিমত-সম্পদ লাভ করে। কিন্তু ইসলামের এই মহান সৈনিকগণের কেউ গনিমতের অবাধ প্রাচুর্য সত্ত্বেও তা থেকে এক

দিরহাম পরিমাণ সম্পদও আত্মসাৎ করার চিন্তা করেননি। ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন, মুসলিম বাহিনী যখন মাদায়েন জয় করে এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পদ জমা করে, তখন জনৈক যোদ্ধা একটি বাক্স নিয়ে এসে দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে জমা দেন। বাক্সটি দেখে দায়িত্বশীল ব্যক্তি ও তার সঙ্গীরা মন্তব্য করে, এত মূল্যবান বাক্স আমরা কখনো দেখিনি; এর সমমূল্যের বা কাছাকাছি মূল্যের কোনো সম্পদও এর পূর্বে আমাদের কাছে জমা হয়নি। এরপর তারা তাকে জিজ্ঞেস করে, আপনার পরিচয় কী? উত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে আমার পরিচয় দেবো না। আল্লাহর প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস না থাকলে আমি এ বাক্সটি তোমাদের কাছে নিয়ে আসতাম না। সকলে বুঝতে পারে যে, তিনি কোনো মহান ব্যক্তি হবেন। তারা পুনরায় তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন, না, আল্লাহর শপথ! আমার প্রশংসা করবে বলে আমি তোমাদেরকে বা অন্য কাউকে আমার পরিচয় দেবো না। বরং আমি আল্লাহর প্রশংসা করব এবং আল্লাহপ্রদত্ত আজর ও সাওয়াবে সন্তুষ্ট থাকব। তিনি চলে গেলে লোকেরা তার অজান্তে তার অনুসরণ করে। তিনি যখন তার সঙ্গীদের কাছে পৌছান, তখন তারা তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে যে, তিনি হলেন সাহাবি আমির বিন আবদে কায়স রাযি.।

বর্ণিত আছে, কাদিসিয়ার মহান সেনাপতি হজরত সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. কাদিসিয়ার অভিযাত্রীদের সম্বন্ধে বলতেন, আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে এ বাহিনী অত্যুচ্চ ঈমান ও আমানত এবং সততা ও বিশ্বস্ততার অধিকারী। যদি বদরের অভিযাত্রীদের মর্যাদা পূর্ব হতেই সুনির্ধারিত না হতো, তাহলে আমি বলতাম, আল্লাহর শপথ! এরা বদরিদের ন্যায় মর্যাদার অধিকারী। আমি অনেক সম্প্রদায়কে দেখেছি অর্জিত সম্পদ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসংবাদে জড়িয়ে পড়তে; কিন্তু এদের (মাদায়েনে প্রবেশকারী কাদিসিয়ার যোদ্ধাদের) ক্ষেত্রে আমি কোনো ধরনের বিবাদবিসংবাদের কথা শুনিনি, ধারণাও করিনি।

পারস্য-কিসরার রাজপ্রাসাদ হতে মুসলিম বাহিনী যে সম্পদ লাভ করে, তা ছিল মানে ও পরিমাণে অবিশ্বাস্য। কিন্তু তারা সব সম্পদ বায়তুল মালে জমা করে দেয়।

আল্লাহর শপথ! নিঃসন্দেহে এ এক বিরল বিস্ময়কর ঘটনা! দজলা পাড়ি দেওয়ার চেতেও বিস্ময়কর ও অলৌকিক ঘটনা এটি! উন্মুক্ত পৃথিবী ও

অবারিত পার্থিব সম্পদভান্ডার এ সকল অভিযাত্রীদের হৃদয়জগতে সামান্য স্পন্দনও সৃষ্টি করতে পারেনি। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আল্লাহর কাছে যা আছে, তাই শ্রেয়তর ও স্থায়ী। সকল প্রশংসা ও অনুগ্রহ কেবল আল্লাহর তরে।

পারস্য অভিযানে প্রাপ্ত সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ যখন খলিফা উমর রাযি.-এর কাছে পৌঁছায় এবং বায়তুল মালে জমা হয়, তখন উমর রাযি. কাঁদতে থাকেন। খলিফাকে কাঁদতে দেখে হজরত আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. জিজ্ঞেস করেন, 'আমিরুল মুমিনিন! কাঁদছেন কেন?! আল্লাহর শপথ! এখন তো শোকর ও কৃতজ্ঞতার মুহূর্ত।'

উত্তরে উমর রাযি. বলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এজন্য কাঁদছি না। আমি কাঁদছি এ কারণে যে, যাদেরকেই আল্লাহ তাআলা এসব বিলাস-সম্পদ দান করেছেন, তারাই পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়েছে। আর যারাই হিংসা-বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়েছে, আল্লাহ তাদেরকে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে দিয়েছেন।'[১২৬]

জালুলা ও হুলওয়ান বিজয়

[জিলকদ, ষোড়শ হিজরি]
[নভেম্বর, ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দ]

পারস্য সম্রাট ইয়াযদিগার্দ ও পরাজিত পারসিক বাহিনীর অবশিষ্ট সৈন্যগণ মাদায়েন থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে হুলওয়ানে আশ্রয় নেয়। এরপর সেখান থেকে পারসিক বাহিনীর একটি অংশ অগ্রসর হয়ে জালুলায় সমবেত হয়। জালুলা ছিল পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি দুর্গ। নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও দুর্ভেদ্য করে তোলার জন্য পারসিকরা পরিখার বাইরে বিস্তৃত এলাকাজুড়ে মাইনের মতো করে লোহার পেরেক বিছিয়ে রেখেছিল।

সংবাদ জানতে পেরে মুসলিম সেনাপতি সাদ রাযি. খলিফা উমর রাযি.-কে বিস্তারিত অবহিত করেন। এরপর তিনি খলিফার নির্দেশনা অনুযায়ী হাশিম

---

১২৬. ইবনে জারির তাবারি, *তারিখুর রুসুলি ওয়াল মুলুক*, ৪/৩০ ও ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৭/৬৯।

বিন উতবা রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর বারো হাজার সৈন্যের একটি অংশকে জালুলায় প্রেরণ করেন।

জালুলায় পৌঁছে মুসলিম বাহিনী পারসিকদের অবরোধ করে। অবরুদ্ধ অবস্থায় কেটে যায় প্রায় তিন মাস। এ সময় পারসিকরা মাঝেমধ্যেই বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাত। তিন মাসে প্রায় আশিবার উভয় বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং প্রতিবারই মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। এরইমধ্যে একদিন পারসিক বাহিনী যুদ্ধ করার জন্য বেরিয়ে এলে আল্লাহ পাকের কুদরতে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু শুরু হয় এবং পুরো নগরী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গভীর অন্ধকারে পারসিক সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অনেকেই পরিখায় পড়ে যায়। বিষয়টি অবগত হয়ে মুসলিম সৈন্যরা বজ্র নিনাদে পারসিক বাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় এদিনের লড়াইকে কাদিসিয়া যুদ্ধের শেষ দিনের লড়াইয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়। অবশেষে হজরত কা'কা' বিন আমর রাযি. পরিখা অতিক্রম করে ভেতরে প্রবেশের পথে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এরপর মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে পারসিক মুশরিকরা নিহত হতে থাকে এবং বিজয় মুসলিম বাহিনীর পদচুম্বন করে। জালুলার যুদ্ধে পারসিক বাহিনীর প্রায় এক লক্ষ সৈন্য নিহত হয়। ষোড়শ হিজরি সনের জিলকদ মাসে (৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে) জালুলা বিজিত হয়। জালুলায় পারসিক বাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে সম্রাট ইয়াযদিগার্দ হুলওয়ান ছেড়ে রায় নগরীতে চলে যান।

এরপর কা'কা' রাযি.-এর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর একটি অংশ হুলওয়ানে অভিযান পরিচালনা করে নগরীটি জয় করে নেয়।

মুসলিম বাহিনীর আরেকটি অংশ দজলার তীরে অবস্থিত তিকরিত, মসুল ও নিনাবেহ (Nineveh) নগরী জয় করে। আরেক অংশ জয় করে ফুরাত তীরের হীত ও কার্কাসিয়া (Circesium) নগরী। তৃতীয় আরেকটি দল জয় করে উবুল্লা, শাত্তাল আরব (Shatt al-Arab) ও আহবায (Ahvaz) নগরী। জালুলা যুদ্ধের চৌদ্দ মাস পর সপ্তদশ হিজরিতে (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিম বাহিনী কুফা নগরীতে শিবির স্থাপন করে এবং কুফাকে নিজেদের স্থায়ী সামরিক ঘাঁটি নির্ধারণ করে। বিজিত অন্যান্য অঞ্চলে কেবল প্রতিরক্ষা ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। এরপর আরবের প্রতিটি গোত্রের

অধিবাসীরা কুফার বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু করে। খলিফা উমর রাযি. সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

রামাহুরমুয বিজয়

সম্রাট ইয়াযদিগার্দের প্রচেষ্টায় কিছুদিন পর পারসিকরা আরও একবার সংগঠিত হতে শুরু করে। এবার তারা হরমুযানের নেতৃত্বে রামাহুরমুয এলাকায় সমবেত হয়। রুস্তমের মৃত্যুর পর হরমুযান ছিল তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম সেনাপতি।

সংবাদ পেয়ে কুফার গভর্নর সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি. খলিফা উমর রাযি.-কে বিস্তারিত অবহিত করেন। খলিফা সাদ রাযি.-কে নুমান বিন মুকাররিন রাযি.-এর নেতৃত্বে কুফা থেকে একটি বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন আর বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে সাহল বিন আদি রাযি.-এর নেতৃত্বে বসরা থেকে একটি বাহিনী প্রেরণের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি খলিফা নির্দেশ দেন যে, উভয় বাহিনী মিলিত হওয়ার পর সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব থাকবে আবু সাবরা বিন আবু রুহম রাযি.-এর হাতে।

নির্দেশমতো নুমান বিন মুকাররিন রাযি. কুফার বাহিনী নিয়ে রামাহুরমুয অভিমুখে রওনা হন। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে হরমুযান রামাহুরমুয ছেড়ে বেরিয়ে এসে আরবাক অঞ্চলে উপস্থিত হয়। আরবাকে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করে। হরমুযান পালিয়ে আশ্রয় নেয় সুসতার[১২৭] নগরীতে। নুমান বিন মুকাররিনও হরমুযানকে পাকড়াও করতে সুসতার অভিমুখে রওনা হন।

অপরদিকে সাহল বিন আদি রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন বসরার বাহিনী রামাহুরমুয অভিমুখে রওনা হয়ে ততক্ষণে আহওয়াযে পৌঁছেছিল। তাদের কাছে যখন সংবাদ পৌঁছায় যে, হরমুযান এখন সুসতারে আশ্রয় নিয়েছে, তখন তারা গন্তব্য পরিবর্তন করে সুসতার অভিমুখে রওনা হয়।

---

১২৭. **সুসতার** : বর্তমান ইরানের খোজেস্তান প্রদেশের অন্তর্গত আহওয়ায নগরীর উত্তরে অবস্থিত একটি নগরীর নাম সুসতার (Shushtar)। ফার্সিতে নগরীটির নাম شوشتر (শুশতার), আর আরবিতে تُستَر (তুসতার)।

সুসতারের যুদ্ধ

মুসলিম বাহিনীর উভয় অংশ সুসতারে এসে মিলিত হয় এবং খলিফার নির্দেশমতো হজরত আবু সাবরা রাযি. পুরো বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আবু সাবরা রাযি. খলিফার কাছে আরও সৈন্যপ্রেরণের আবেদন জানালে খলিফার নির্দেশে বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রাযি. আরও কিছু সৈন্য নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। ফলে মুসলিম বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। এরপর মুসলিম বাহিনী নগরীটি অবরোধ করে।

উচ্চভূমিতে অবস্থিত সুসতার ছিল তৎকালীন পারস্যের অন্যতম প্রাচীন, বৃহৎ, সুরক্ষিত ও দুর্ভেদ্য নগরী। প্রায় দেড় লক্ষ পারসিক সৈন্য তখন সুসতারে অবস্থান করছিল। নগরীর চারপাশে ছিল সুউচ্চ নগরপ্রাচীর। নগরপ্রাচীর ছিল দু-স্তরবিশিষ্ট, দুই প্রাচীরের মাঝে বেশ প্রশস্ত খালি জায়গা ছিল। নগরপ্রাচীরের স্থানে স্থানে বুরুজ বা পর্যবেক্ষণ-চৌকি নির্মাণ করা হয়েছিল। সেখান থেকে পারসিক সৈন্যরা সহজেই বাইরে অবস্থানরত মুসলিম সৈন্যদের লক্ষ করে তির নিক্ষেপ করতে পারত। কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা তির নিক্ষেপ করলেও তা এত উঁচুতে পৌঁছত না। পারসিক রীতি অনুযায়ী নগরপ্রাচীরের চারপাশে ছিল সুগভীর পরিখা। তবে অন্যান্য পরিখার চেয়ে সুসতারের পরিখার ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, পরিখাটি পানিতে পূর্ণ ছিল। তাই মুসলিম সৈন্যদের পক্ষে তা পাড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন বিবেচিত হচ্ছিল। নগরীর এক পাশে কিছু স্থানে পরিখা না থাকলেও সেখানে প্রচুর সৈন্যসমাবেশ করা হয়েছিল। সেদিক দিয়ে কেউ নগরীতে প্রবেশের চেষ্টা করলেই প্রতিপক্ষের তিরবৃষ্টির মুখে পড়তে হতো। নগরীর অভ্যন্তরে যথেষ্ট পরিমাণ আহারসামগ্রী ও অন্যান্য রসদসামগ্রীর ব্যবস্থা ছিল। এসব কারণে দীর্ঘ দিন অবরোধ করে রাখার পরও সুসতারে অবস্থানরত পারসিক সৈন্যদের মাঝে মোটেও দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল না।

জালুলার মতো সুসতারেও পারসিক সৈন্যরা মাঝে-মধ্যেই বেরিয়ে এসে মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালাত এবং বিলম্ব না করে দ্রুত সরে পড়ত। এভাবে তারা আশিবার মুসলিম বাহিনীর ওপর হামলা চালায়। প্রতিটি সংঘর্ষে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করলেও পারসিকরা দ্রুত সটকে

পড়ার কারণে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন সম্ভব হচ্ছিল না। ফলে সুসতার অবরোধ প্রায় আঠারো মাস দীর্ঘায়ত হয়।

বান্দা, বলো—তোমার চাওয়া কী!

মুসলিম বাহিনীতে অন্যান্য অনেক সাহাবির সঙ্গে হজরত আনাস রাযি.-এর ভাই হজরত বারা বিন মালিক রাযি.-ও ছিলেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন—

«كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِيْ طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَه؛ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّه. مِنْهُمُ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ».

> আল্লাহর অনেক বান্দা এমন আছে, যাদের চুল এলোমেলো-ধূলিমলিন, পরনের পরিচ্ছদ জীর্ণশীর্ণ। তাদের প্রতি কারও গুরুত্ব নেই। কিন্তু (আল্লাহ তাআলার কাছে তারা এত প্রিয় যে,) তারা যদি আল্লাহর নাম নিয়ে কোনো শপথ করে, আল্লাহ অবশ্যই তা পূর্ণ করেন। বারা বিন মালিক তাদেরই একজন।[১২৮]

দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও সুসতার বিজিত না হওয়ায় মুসলিম বাহিনীর সদস্যগণ বারা বিন মালিক রাযি.-এর কাছে গিয়ে অনুরোধ করে যে, আপনি তো আমাদের অবস্থা দেখছেন। দীর্ঘদিন অবরোধের পরও প্রতিপক্ষ সামান্য বশীভূত হচ্ছে না। তারা মাঝেমধ্যেই হামলা করে সটকে পড়ছে আর আমরা আক্রমণ করতে গেলে তাদের তিরবৃষ্টির শিকার হচ্ছি। তাই আপনি শপথ করে আল্লাহকে কিছু বলুন। তখন বারা রাযি. দোয়া করেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি আপনাকে শপথ দিয়ে বলছি—আপনি আমাদেরকে তাদের স্কন্ধমূল দান করুন, তাদের ওপর কর্তৃত্ব দান করুন এবং আমাকে আপনার নবীর সঙ্গে মিলিত করুন।'

এরপরই হঠাৎ মুসলিম বাহিনীর সদস্য আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর পায়ের কাছে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত একটি তির এসে পড়ে। তিরটির সঙ্গে একটি পত্র বাঁধা! পত্রটিতে জনৈক পারসিক যোদ্ধা তাকে জানমালের নিরাপত্তাদানের বিনিময়ে মুসলিম বাহিনীকে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের

---

১২৮. *সুনানে তিরমিজি*, হাদিস নং ৩৮৫৪।

পথ জানিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। আবু মুসা আশআরি রাযি. মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি আবু সাবরা রাযি.-কে বিষয়টি জানালে তিনি উক্ত সৈনিককে নিরাপত্তাপ্রদান করেন। এরপর আবু মুসা আশআরি রাযি. একটি পত্রে নিরাপত্তাঘোষণার কথা লিখে যে স্থান থেকে তার কাছে তির নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তিরের মাধ্যমে পত্রটি সেখানে নিক্ষেপ করেন।

অনন্যসাধারণ বীরত্ব

রাত গভীর হলে পারসিক সৈন্যটি নিরাপত্তাপত্র সঙ্গে নিয়ে মুসলিম সেনাপতি আবু সাবরা রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলে, 'আমার সঙ্গে আপনাদের একজন লোককে দিন, আমি তাকে পথটি চিনিয়ে দেবো। এরপর সে এসে আপনাদেরকে নিয়ে যাবে।' আবু সাবরা এ বিষয়ে হজরত মাজযাআ বিন ছাওর আস-সাদুসি রাযি.-এর সঙ্গে পরামর্শ করলে তিনি নিজের নাম পেশ করেন। পারসিক সৈন্যটি বলে, 'আমার সঙ্গে এমন ব্যক্তিকেই পাঠাতে হবে, যে ভালো সাঁতার জানে।' মাজযাআ রাযি. উত্তর দেন, 'আমি ভালো সাঁতার জানি।' আবু সাবরা রাযি. মাজযাআ রাযি.-কে তার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেন এবং বলে দেন যে, 'আপনি ভালো করে পথটি চিনে নিয়েই আমাদের কাছে ফিরে আসবেন; কোনো অবস্থাতেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াবেন না।'

মাজযাআ রাযি. পারসিক সৈন্যটিকে অনুসরণ করে পথ চলতে থাকেন। কিছুদূর যাওয়ার পর লোকটি পরিখার পানিতে নেমে পড়লে তিনিও তার অনুসরণ করেন। এরপর লোকটি পানিতে ডুব দিলে তিনিও ডুব দেন। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে একটি সুড়ঙ্গের প্রবেশমুখে আবিষ্কার করেন। সুড়ঙ্গটি নগরপ্রাচীরের নিচ দিয়ে নগরীর অভ্যন্তরে চলে গেছে।

লোকটির পিছু পিছু তিনি সুড়ঙ্গ ধরে অগ্রসর হতে থাকেন। সুড়ঙ্গটি বিভিন্ন স্থানে এত সংকীর্ণ ছিল যে, উভয়কে অত্যন্ত কষ্ট করে তা অতিক্রম করতে হচ্ছিল। কোথাও সুড়ঙ্গের ছাদ অত্যধিক নিচু হওয়ায় পানিতে ডুব দিয়ে অতিক্রম করতে হচ্ছিল। অবশেষে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উভয়ে অন্ধকার সুড়ঙ্গটির অপর প্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হন। এরপর পারসিক সৈন্যটি মাজযাআ রাযি.-কে পারসিক পোশাক এনে দিলে তিনি তা পরিধান করে নগরীর নিরাপত্তাব্যবস্থার খোঁজখবর নিতে থাকেন। মাজযাআ রাযি. সুসতার নগরীর মূল প্রবেশদ্বার, দুর্গের অবস্থান, প্রাসাদের অবস্থান ইত্যাদি

ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। প্রাসাদ পর্যবেক্ষণ করার সময় তিনি হঠাৎ করেই পারসিক সেনাপতি হরমুযানকে সেখান থেকে বের হতে দেখেন। কিন্তু সেনাপতি আবু সাবরা রাযি.-এর নির্দেশ স্মরণ করে তিনি নিজেকে নিবৃত্ত রাখেন।

এরপর মাজযাআ রাযি. পারসিক সৈন্যটিকে বিদায় জানিয়ে আবার সেই দুর্গম সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে মুসলিম শিবিরে ফিরে আসেন। তিনি সেনাপতি আবু সাবরা রাযি.-কে বিস্তারিত অবহিত করে অনুরোধ করেন—'আমার সঙ্গে কয়েকজন সৈন্য দিন। আমি তাদেরকে নিয়ে যেকোনো মূল্যে আপনাদের জন্য নগরদ্বার খুলে দেবো।'

হজরত আবু সাবরা রাযি. এই সুকঠিন দায়িত্ব পালনের জন্য কাউকে বাধ্য করার পরিবর্তে সবাইকে স্বেচ্ছায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দেন। তিনশ জানবাজ মুজাহিদ এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তাদের মধ্যে স্বয়ং সেনাপতি আবু সাবরা রাযি.-ও ছিলেন। আবু সাবরা রাযি. মাজযাআ রাযি.-কেই এই তিনশ জনের আমির নির্বাচিত করেন।

ততক্ষণে মধ্যরাত পেরিয়ে আরও দেড়-দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। সুবহে সাদিকের ঘণ্টা দুয়েক বাকি। তিনশ দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা এক সুকঠিন মিশন বাস্তবায়নের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন। অতিরিক্ত পরিচ্ছদ ও অস্ত্রশস্ত্র বাদ দিয়ে সকলে পাতলা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিয়েছিলেন; বুকের সঙ্গে একটি করে তরবারি বাঁধা। সুড়ঙ্গের অভ্যন্তরে নিকষ অন্ধকার হওয়ায় মাজযাআ রাযি. অনুচ্চকণ্ঠে সকলকে পথপ্রদর্শন করছিলেন। দুর্গম গিরি কান্তার মরু পাড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গের শেষ প্রান্তে পৌঁছার পর মাজযাআ রাযি. দেখতে পান—তার সঙ্গে মাত্র আশিজন যোদ্ধা অবশিষ্ট আছে! বাকি দুইশ বিশজন মুসলিম যোদ্ধাই পথিমধ্যে অজানা পরিণতির শিকার হয়েছে।

ইতিমধ্যে প্রায় দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে গেছে। অবশিষ্ট আশিজনকে নিয়েই মাজযাআ রাযি. সুসতার নগরীর প্রধান প্রবেশদ্বারের কাছে পৌঁছে যান। পারসিক বাহিনীর কল্পনাতেও ছিল না যে, রজনীর এই শেষ প্রহরে মুসলিম বাহিনী আক্রমণের চেষ্টা চালাতে পারে। তাই তারা সকলেই ছিল গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। অবশ্য মূল প্রবেশদ্বারের নিরাপত্তায় নিয়োজিত সৈন্যরা নির্ঘুম পাহারা দিচ্ছিল। মাজযাআ রাযি.-এর নেতৃত্বে সকলে

তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং প্রচণ্ড যুদ্ধের পর ফটকের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়। এরপর তারা উচ্চৈঃস্বরে তাকবির দিয়ে ওঠে। তাকবির-ধ্বনি শুনতেই বাইরে অবস্থানরত মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা বুঝতে পারে যে, নগরদ্বার মাজযাআ রাযি.-এর বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে। তৎক্ষণাৎ মূল মুসলিম বাহিনী পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে প্রবেশদ্বারের কাছে চলে আসে। এরপর ভেতর থেকে দ্বার খুলে দিতেই মুসলিম বাহিনী স্রোতের ন্যায় সুসতার নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

শোরগোল শুনে পারসিক সৈন্যরা জেগে উঠলেও তারা ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। দ্রুত তারা মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় অগ্রসর হলেও তাদের এই অপ্রস্তুত অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম সৈন্যগণ তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আল্লাহ তাআলা বস্তুপূজারি পারসিকদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দেন। মুসলিম যোদ্ধারা পারসিকদের কচুকাটা করতে থাকে।

যুদ্ধ চলাকালে হজরত বারা বিন মালিক রাযি. দূর থেকে হরমুযানকে দেখতে পেয়ে তার কাছে পৌঁছার মনস্থ করেন। তার সামনে তখন যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সৈন্যদের এক বিশাল জনস্রোত। তিনি একে একে একশ পারসিক সৈন্যকে মল্লযুদ্ধে হত্যা করার পর অবশেষে হরমুযানের কাছে পৌঁছতে সক্ষম হন। উভয়ে পরস্পর মুখোমুখি হতেই একে অপরকে হত্যা করার জন্য আঘাত হানে। বারা রাযি.-এর আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর হরমুযানের আঘাতে বারা রাযি. শহিদ হয়ে যান। প্রমাণিত হয় সত্যবাদী নবীজির ঘোষণার সত্যতা—'বারা বিন মালিক তাদেরই একজন।'

দূর থেকে হজরত মাজযাআ রাযি.-ও হরমুযানকে অনুসরণ করছিলেন। তিনিও একে একে একশ পারসিক সৈন্যকে হত্যা করে হরমুযানের কাছে পৌঁছে যান। উভয়ে মুখোমুখি হতেই একে অপরকে হত্যা করার জন্য তরবারি চালনা করে। মাজযাআ রাযি.-এর আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় আর হরমুযানের আঘাতে মাজযাআ রাযি. শহিদ হয়ে যান।

এক রাতে তিন তিনবার দুর্গম সুড়ঙ্গ পাড়ি দিয়েছেন; এরপর প্রবেশদ্বারের কাছে প্রতিপক্ষের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে মুসলিম বাহিনীর প্রবেশ নিশ্চিত করেছেন; তারপর একে একে একশ সৈন্যের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধে লড়ে মাজযাআ রাযি.-এর দেহ-মন তখন বড় ক্লান্ত! এবার তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন, 'প্রিয়তম' ও প্রিয়জনদের সঙ্গে!

মুসলিম সৈন্যদের প্রচণ্ড আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পারসিক সৈন্যরা পালাতে শুরু করে। সেনাপতি হরমুযান পালিয়ে তার দুর্গসম প্রাসাদে আশ্রয় নেয় এবং প্রাসাদের দ্বার বন্ধ করে দেয়। এরপর সে প্রাসাদের ওপর থেকে মুসলিম বাহিনীর উদ্দেশে বলে—'আমার কাছে এখনো একশ তির আছে আর আমার নিক্ষিপ্ত তির কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। এখন বলো, তোমরা কি তোমাদের একশ জন সঙ্গীকে হারিয়ে হলেও আমাকে পাকড়াও করতে চাও?' মুসলিম সৈন্যগণ তাকে জিজ্ঞেস করেন, 'তাহলে তুমি কী চাও?' হরমুযান উত্তর দেয়, 'আমি তোমাদের কাছে এই শর্তে আত্মসমর্পণ করতে চাই যে, তোমরা আমাকে হত্যা না করে খলিফা উমরের কাছে নিয়ে যাবে। তিনি আমার বিষয়ে যে ফয়সালা করবেন, আমি তা মেনে নেব।' পরামর্শের পর মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা হরমুযানের প্রস্তাব মেনে নিলে সে তিরগুলো ফেলে আত্মসমর্পণ করে।

এরপর মুসলিম বাহিনী দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে সুস ও গান্দিসাপুর নগরী জয় করতে সক্ষম হয়।

এক ওয়াক্ত ফজর নামাজ!

মুসলিম বাহিনীর সদস্যরা সুবহে সাদিকের সময় সুসতার নগরীতে প্রবেশ করেছিল। এরপরই তারা প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল অত্যন্ত কঠিন। প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা! চারিদিকে রক্ত, মৃত্যুর হাতছানি! চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন পরিস্থিতি! বড় সঙ্গিন মুহূর্ত! যুদ্ধের প্রচণ্ডতার কারণে এমনকি ইশারায়ও তারা সেদিনের ফজর নামাজ আদায় করতে পারেনি। অবশেষে আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে যখন মুসলিম বাহিনীর অনুকূলে বিজয়ের ইতিহাস রচিত হয়, ততক্ষণে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। এরপর সকলে সেদিনের ফজর নামাজ আদায় করে।

বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আনাস বিন মালিক রাযি.-ও সুসতার অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে যখনই তিনি সুসতারের বিজয়ের কথা স্মরণ করতেন, তখনই কাঁদতেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—দীর্ঘ দেড় বছরের অবরোধ ও প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের পর মহান আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহে অর্জিত এ বিজয় তো মুসলমানদের জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার বার্তা বয়ে নিয়ে এসেছিল।

তাহলে হজরত আনাস রাযি. সুসতার বিজয়ের কথা স্মরণ হলেই কেন কাঁদতেন?!

হজরত আনাস রাযি.-এর জীবনে এই এক দিনই ফজরের নামাজ ছুটে গিয়েছিল। শরিয়তের দৃষ্টিতে তিনি সেদিন অপারগ ও ক্ষমাযোগ্য ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর সকল সদস্য সেদিন অপারগ ছিল। সকলে ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু যা ছুটে গেছে, তা যে অনেক মহান! অনেক গুরুত্বপূর্ণ এক আমল!

সুসতার অভিযানের কথা স্মরণ হলেই হজরত আনাস রাযি. অশ্রুসিক্ত হতেন। তিনি বলতেন, 'সুসতার কী?! আমার তো ফজরের নামাজ ছুটে গেছে। আমি এই নামাজের বিনিময়ে আমার জন্য পুরো পৃথিবীকেও পছন্দ করব না।'

বস্তুত এখানেই নিহিত আছে আসমানি নুসরত ও গায়েবি সাহায্যপ্রাপ্তির গোপন রহস্য।

পবিত্র কুরআনের ভাষায়—

﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾

তোমরা যদি আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য করো, তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদম অবিচলিত রাখবেন।

[সুরা মুহাম্মাদ : ০৭]

—দ্রষ্টব্য—

মহত্ত্ব ও অঙ্গীকার রক্ষা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য

সুসতারের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর সেনাপতি আবু সাবরা রাযি. হজরত আনাস রাযি. ও আহনাফ বিন কায়স রাযি.-সহ একটি প্রতিনিধিদলকে খলিফা উমর রাযি.-এর কাছে প্রেরণ করেন এবং তাদের সঙ্গে ধৃত পারসিক সেনাপতি হরমুযানকে পাঠিয়ে দেন। হরমুযান ইতিপূর্বে তিন-তিনবার মুসলমানদের সঙ্গে অঙ্গীকার ও সন্ধি করলেও তিনবারই ভঙ্গ করেছিল।

খলিফার দরবারে হরমুযানকে উপস্থিত করা হলে কথোপকথনের একপর্যায়ে খলিফা তাকে জিজ্ঞেস করেন—'হরমুযান, তুমি তো একের পর এক বারবার অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ। এ বিষয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করে তোমার কিছু বলার আছে?'

'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আপনি আমাকে এ বিষয়ে কিছু বলার পূর্বেই হত্যা করবেন।' হরমুযান উত্তর দেয়।

'তুমি নিশ্চিন্ত থাক; এমন কিছুর আশঙ্কা করো না।' খলিফা তাকে অভয় জোগান।

এরপর হরমুযান পানি পান করতে চাইলে তার জন্য পানি আনা হয়। পানির পাত্র হাতে নেওয়ার পর হরমুযানের হাত কাঁপছিল। সে বলে ওঠে—'আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, এই পানি পান করার আগেই আমাকে হত্যা করা হবে।' খলিফা তাকে নির্ভয় দিয়ে বলেন, 'পানি পান করা শেষ হওয়ার পূর্বে তোমাকে কিছু করা হবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।'

এ কথা শুনতেই হরমুযান হাতের পানপাত্রটি ফেলে দেয় এবং সবটুকু পানি মাটিতে পড়ে যায়। খলিফা উমর রাযি. উপস্থিত লোকদেরকে পুনরায় তার জন্য পানি আনতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'পানি পান করার পূর্বে তাকে হত্যা করো না।'

তখন হরমুযান বলে ওঠে—'আমার পানির প্রয়োজন নেই। আমার উদ্দেশ্য ছিল আপনার কাছ থেকে নিরাপত্তা আদায় করে নেওয়া আর আমি তা পেয়ে গেছি। আপনি আমাকে কীভাবে হত্যা করবেন? আপনি তো আমাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।'

'তুমি মিথ্যা বলছ!' খলিফা বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন।

তখন দরবারে উপস্থিত হজরত আনাস রাযি. বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! সে সত্য বলেছে। আপনি তাকে নিরাপত্তা প্রদান করেছেন।'

খলিফা অবাক বিস্ময়ে বলেন, 'আনাস! কী বলছ তুমি?! মাজযাআ বিন ছাওর ও বারা বিন মালিকের হত্যাকারীকে আমি নিরাপত্তা দেবো?'

উপস্থিত সকলে আনাস রাযি.-এর কথা সমর্থন করলে খলিফা হরমুযানের সামনে এসে বলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করেছ। কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তোমার সঙ্গে প্রতারণা করব না। তবে তুমি চাইলে ইসলামগ্রহণ করতে পার।'

এরপর হরমুযান ইসলামগ্রহণ করে এবং মদিনাতেই বসবাস করতে থাকে। খলিফা তার জন্য ভাতার ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তী সময়ে হরমুযানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অনুমিত হয় যে, খলিফা হজরত উমর রাযি.-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল।

সেনাপতি সাদ রাযি.-এর বিরুদ্ধে কুফাবাসীর অভিযোগ

ঐতিহাসিকগণ এর বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছেন—

সেনাপতি সাদ রাযি. কুফার ব্যস্ত এলাকায় একটি বাড়িতে বসবাস করতেন। বাড়িটি বাজারের মধ্যে হওয়ায় বাজারের হট্টগোলে তার কথা বলতে সমস্যা হতো। এ কারণে তিনি সাধারণত বাড়ির দরজা বন্ধ রাখতেন। উমর রাযি. বিষয়টি জানতে পারলেন। তিনি আরও জানতে পারলেন যে, জনগণ বাড়িটিকে 'গভর্নর সাদের প্রাসাদ' বলে। তিনি বিষয়টি অপছন্দ করলেন এবং মনঃক্ষুণ্ন হলেন। এরপর তিনি সাহাবি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি.-কে তলব করে তাকে কুফায় প্রেরণ করলেন। তিনি তাকে বলে দিলেন, কুফার পৌঁছে সাদের প্রাসাদের দরজাটি জ্বালিয়ে দেবে। এরপর কালবিলম্ব না করে ফিরে আসবে।

মুহাম্মাদ বিন মাসলামা মদিনা থেকে রওনা হয়ে কুফায় পৌঁছলেন এবং সাদ রাযি.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই বাজার থেকে লাকড়ি কিনলেন। এরপর সাদের বাড়ির কাছে গিয়ে দরজায় আগুন লাগিয়ে দিলেন। সাদ রাযি.-কে জানানো হলো যে, খলিফার পক্ষ থেকে একজন দূত এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছেন এবং তিনিই এ কাজ করেছেন। সাদ রাযি. দূতের পরিচয় জানার জন্য লোক পাঠালেন। তারা জানাল যে, তিনি মুহাম্মাদ বিন মাসলামা। এবার সাদ তার কাছে লোক পাঠিয়ে তাকে বাড়িতে প্রবেশের অনুরোধ জানালেন; কিন্তু মুহাম্মাদ তাতে অস্বীকৃতি

জানালেন। এরপর সাদ রাযি. নিজে বেরিয়ে এলেন এবং দূত মুহাম্মাদকে বিশ্রাম গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। মুহাম্মাদ এবারও অস্বীকৃতি জানালেন। সাদ রাযি. তাকে রাহাখরচ প্রদান করলে তিনি তা-ও গ্রহণ করলেন না। এরপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাযি. সাদ রাযি.-কে খলিফার পত্র প্রদান করলেন। পত্রে লেখা ছিল—

> আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তুমি একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছ এবং তাকে দুর্গের ন্যায় (দুর্ভেদ্য) করে রেখেছ। প্রাসাদটিকে সাদের প্রাসাদ বলা হয়। আবার তুমি তোমার ও জনসাধারণের মাঝে বাধা হিসেবে একটি দরজাও তাতে স্থাপন করেছ। প্রকৃতপক্ষে এটি তোমার প্রাসাদ নয়; বরং ফাসাদের প্রাসাদ। তুমি এটি ত্যাগ করে বায়তুল মালের কাছাকাছি কোনো জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করো এবং এই প্রাসাদটি বন্ধ করে দাও। আর তোমার বাসস্থানে এমন কোনো দরজা রেখো না, যার কারণে জনসাধারণের আগমন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তুমিও তাদের অধিকার আদায়ে বাধাপ্রাপ্ত হও। (মানুষের প্রবেশাধিকার অবারিত রাখবে) যেন তারা তোমার মজলিসে শরিক হতে পারে এবং তুমি যখন ঘর হতে বের হও, তখন তোমার সঙ্গে মিলিত হতে পারে।

সাদ তখন শপথ করে বললেন যে, মানুষ যা রটিয়েছে, তা সঠিক নয়। এরপর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা তৎক্ষণাৎ মদিনা অভিমুখে রওনা হলেন। পথিমধ্যেই তার পাথেয় শেষ হয়ে গেলে তিনি বাধ্য হয়ে গাছের ছাল গলাধঃকরণ করলেন। মদিনায় পৌঁছে তিনি যখন খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন গাছের ছাল খাওয়ার কারণে তার কষ্ট হচ্ছিল। উমর রাযি. তার কাছ থেকে সবকিছু শোনার পর খুশি হয়ে বললেন, সে-ই অধিক জ্ঞানী, যে আপন সঙ্গীর পক্ষ থেকে কোনো অঙ্গীকার (এর বাধ্যবাধকতা) না থাকা অবস্থায় দূরদর্শিতার সঙ্গে কথা ও কাজ সম্পাদন করে। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা খলিফাকে সাদের শপথের কথাও জানালেন। তখন উমর রাযি. সাদ রাযি.-কে সত্যায়ন করে বললেন, যারা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে এবং যারা আমাকে তা জানিয়েছে, তাদের তুলনায় সাদ অধিক সত্যবাদী। উল্লেখ্য, কুফাবাসীই সাদের বিরুদ্ধে খলিফা উমর রাযি.-এর কাছে অভিযোগ করেছিল।

কুফার গভর্নর-পদ হতে সাদ রাযি.-কে অব্যাহতিদান

কিন্তু খলিফা উমর রাযি. আপন নীতি অনুসারে হজরত সাদ রাযি.-কে কুফার গভর্নর-পদ হতে অব্যাহতিদান এবং তাকে মদিনায় নিজের কাছে উপদেষ্টা হিসেবে রাখাকেই শ্রেয় মনে করেন। খলিফা তার পরিবর্তে আবদুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ বিন ইতবান রাযি.-কে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন।

কিছুদিন পর গভর্নর ইবনে ইতবান রাযি. খলিফার কাছে বার্তা পাঠিয়ে নিহাবন্দে অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। নিহাবন্দে পারস্য-কিসরার তত্ত্বাবধানে বিরাট সৈন্যসমাবেশ ঘটেছিল। ইবনে ইতবান বার্তায় লেখেন, সেখানে দেড় লক্ষ পারসিক যোদ্ধা সমবেত হয়েছে। আমাদের পূর্বে তারাই যদি অভিযানে অগ্রসর হয়, তাহলে তাদের সাহস ও মনোবল বেড়ে যাবে। বিপরীতে আমরা যদি দ্রুত অগ্রসর হয়ে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করতে পারি, তাহলে আমরাই সাহস ও মনোবলে এগিয়ে থাকব।

নিহাবন্দের যুদ্ধ

সর্বদিক বিবেচনা করে খলিফা উমর রাযি. নিহাবন্দে অভিযানের অনুমতি প্রদান করেন। তবে অভিযানের জন্য তিনি নতুন একজন সেনাপতি নির্বাচনের মনস্থ করেন এবং এ বিষয়ে বিশিষ্ট সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। পরামর্শে নিহাবন্দ অভিযানে নেতৃত্বদানের জন্য বিশিষ্ট সাহাবি নুমান বিন মুকাররিন মুযানি রাযি.-এর নাম গৃহীত হয়। তাকে নির্বাচনের সময় খলিফা মন্তব্য করেন, আল্লাহর শপথ! আমি এ বাহিনীর নেতৃত্ব এমন এক ব্যক্তিকে প্রদান করব, আগামীর শত্রুমোকাবিলায় যিনি প্রথম বর্শাধারণকারী হবেন। তিনি হলেন যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ্যে পৌঁছতে অটল-অবিচল ও ধীরস্থির নুমান বিন মুকাররিন।

দায়িত্ব লাভের পর সেনাপতি নুমান রাযি. পারসিক বাহিনীর বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। তিনি জানতে পারেন— প্রতিরক্ষার জন্য পারসিকরা নতুন এক কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে। নিহাবন্দ নগরী তো পূর্ব থেকেই পরিখা ও সুদৃঢ় নগরপ্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। এর পাশাপাশি মুসলিম বাহিনীর অভিযানের সংবাদ পেয়ে পারসিকরা নিহাবন্দ নগরীর চারপাশে (মাইনের ন্যায়) প্রচুর পরিমাণ

লোহার কাঁটা (পেরেক) ছড়িয়ে রেখেছে। ছড়ানো পেরেকের মাঝ দিয়ে চলাচলের জন্য কিছু পথ ছিল, যা কেবল তাদেরই জানা ছিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর জন্য নগরীতে প্রবেশ করা শুধু কঠিনই নয়; অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

এমতাবস্থায় সেনাপতি নুমান রাযি. বাহিনীর প্রবীণ ও অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের সঙ্গে করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ করেন। পরামর্শে জনৈক সদস্য[১২৯] পারসিক বাহিনীকে কৌশলে পরাভূত করার জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ পেশ করেন—

- মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ পারসিক বাহিনীকে উত্তেজিত করতে এবং তাদেরকে যুদ্ধে প্ররোচিত করতে দ্রুত আঘাত করেই পালানোর কৌশল (Hit-and-Run) প্রয়োগ করবে।
- যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সেই অংশটি পারসিক বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পরাজয়ের ভান করে পিছু হটবে।
- পারসিক বাহিনীকে বিভ্রান্ত করার জন্য মুসলিম বাহিনীর মূল অংশও পিছু হটতে শুরু করবে এবং বিভিন্ন স্থানে ওত পেতে থাকবে।
- ক্ষুদ্র অংশটি পিছু হটতে হটতে এমন স্থানে পৌঁছে যাবে, যেখানে পারসিক বাহিনীকে টেনে নিতে পারলে মুসলিম বাহিনী তাদের ওপর একযোগে হামলা চালাতে পারবে।

বাস্তবেও এ পরিকল্পনা সফল হয়। পারসিক বাহিনী যখন দেখতে পায় যে, তাদের প্রতি-আক্রমণে প্রতিপক্ষের আক্রমণরত অংশটি পিছু হটছে, এরপর পিছু হটছে মূল মুসলিম বাহিনীও, তখন তারা চিৎকার করে বলতে থাকে, এই তো মুসলিম বাহিনী পরাজিত হয়ে পালাচ্ছে। তারা দ্রুত মুসলিম বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে এবং বিছিয়ে রাখা পেরেকগুলো সরিয়ে ফেলে। পারসিক বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে দুর্গ ও

---

১২৯. পরামর্শটি প্রদান করেছিলেন তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মত্যাগ ফিতনার সময় তিনি মুরতাদ হয়ে যান এবং পরবর্তীকালে পুনরায় ইসলামগ্রহণ করেন। দ্বিতীয়বার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি ইরাক অভিযানে বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং কাদিসিয়া ও নিহাবন্দের যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি নিহাবন্দের যুদ্ধেই শহিদ হন।

পরিখার বাইরে চলে আসে। তখন ছিল দিবসের প্রথমভাগ। সেনাপতি নুমান রাযি. মূল বাহিনীর সৈন্যদেরকে আপন আপন স্থানে স্থির থাকার নির্দেশ দেন এবং তিনি অনুমতি দেওয়ার পূর্বে যুদ্ধ শুরু করতে নিষেধ করেন। মুসলিম বাহিনী সেনাপতির নির্দেশনা মোতাবেক নিজেদের স্থানে অবস্থান করে ঢাল ব্যবহার করে প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত তির হতে আত্মরক্ষা করতে থাকে। পারসিকরা আরও অগ্রসর হয়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর তিরবর্ষণ অব্যাহত রাখে; ফলে অনেক মুসলিম সৈন্য আহত হয়। তারা সেনাপতি নুমানকে বলে, আপনি দেখছেন না, আমরা কী পরিস্থিতিতে আছি?! এখনো কীসের অপেক্ষা করছেন? উত্তরে নুমান রাযি. বলেন, ধীরে! এখনো সময় হয়নি!

দ্বিপ্রহরের (জোহর নামাজের নির্ধারিত) সময় ঘনিয়ে এলে নুমান রাযি. তার ঘোড়ায় চড়ে আপন সৈন্যদের মাঝে ঘুরে ঘুরে বলতে থাকেন, আমি নবীজির একটি আমল স্বচক্ষে দেখেছি বলেই তোমাদেরকে এতক্ষণ যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অভিযানে গেলে দিবসের প্রথম প্রহরে যুদ্ধ করতেন না। যতক্ষণ না (জোহরের) নামাজের সময় হতো, বাতাস প্রবাহিত হতো এবং যুদ্ধ-উপযোগী পরিবেশ তৈরি হতো, ততক্ষণ তিনি তাড়াহুড়া করতেন না। মূলত এ কারণেই আমি তোমাদেরকে আক্রমণের অনুমতি দিইনি।

এরপর তিনি বলেন, নামাজ শেষ করেই তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাবে। নামাজের পর আমি তিনটি তাকবির বলব। প্রথম তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে যারা অপ্রস্তুত থাকবে, তারা যেন প্রস্তুত হয়ে যায়; জুতার ফিতা বেঁধে নেয় এবং যুদ্ধাস্ত্র ঠিক করে নেয়। দ্বিতীয় তাকবিরের সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন পরিধেয় বস্ত্র মজবুত করে বেঁধে নেয়, হামলার জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে যায়। এরপর তৃতীয় তাকবির বলেই ইনশাআল্লাহ আমি হামলা করব, তোমরাও সঙ্গে সঙ্গে হামলা করবে। যুদ্ধে যদি আমি নিহত হই, তাহলে আমার অবর্তমানে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করবে হুযায়ফা। সেও নিহত হলে অমুক, সেও নিহত হলে ...। এভাবে তিনি একে একে সাতজনের নাম ঘোষণা করেন, যাদের মধ্যে শেষজন হলেন মুগিরা বিন শুবা রাযি.।

সেনাপতি নুমান রাযি. সকলকে নিয়ে নামাজ আদায় করেন। এরপর একে একে দুই তাকবির বলেন। দ্বিতীয় তাকবিরের পর তিনি দোয়া করেন, হে আল্লাহ, তোমার দ্বীনকে মর্যাদাশীল করো, তোমার বান্দাদের সাহায্য

করো আর তোমার দ্বীনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় এবং তোমার বান্দাদের সহায়তা প্রতিষ্ঠায় নুমানকে আজকের প্রথম শহিদ হিসেবে কবুল করো। হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি—আজ এমন এক বিজয় দ্বারা আমার চক্ষুযুগলকে শীতল করো, যার মধ্যে ইসলামের মর্যাদা ও সম্মান নিহিত আছে।

দোয়া শেষ করে তৃতীয় তাকবির বলতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। শুরু হয় উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি নুমান রাযি. আহত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাই নুআইম বিন মুকাররিন রাযি. ঝান্ডা তুলে নেন এবং হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি.-এর হাতে তুলে দেন। দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই মুসলিম বাহিনী নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে।

যুদ্ধশেষে হজরত মা'কাল বিন ইয়াসার রাযি. সেনাপতি নুমান রাযি.-এর কাছে যান। নুমান রাযি.-এর ঘোড়া যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তে পিছলে যাওয়ায় তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়েছিলেন। তার তিরাধার তার পাশেই পড়ে ছিল। মা'কাল রাযি. নুমান রাযি.-এর মুখমণ্ডল থেকে ধুলাবালি মুছে দিতে শুরু করেন। নুমান রাযি. অপলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনি কে?'

'মা'কাল বিন ইয়াসার।'

'বাহিনীর কী অবস্থা?' নুমান রাযি. ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

'আল্লাহ আমাদের বিজয় দান করেছেন।'

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। বিজয়ের বার্তা খলিফাতুল মুসলিমিনের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।'

এতটুকু বলতেই সেনাপতি নুমান রাযি.-এর প্রাণবায়ু উড়ে যায় আপন গন্তব্যপানে। রাযিয়াল্লাহু আনহু ওয়া আনহুম আজমাঈন।

আপনার পালনকর্তার বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন!

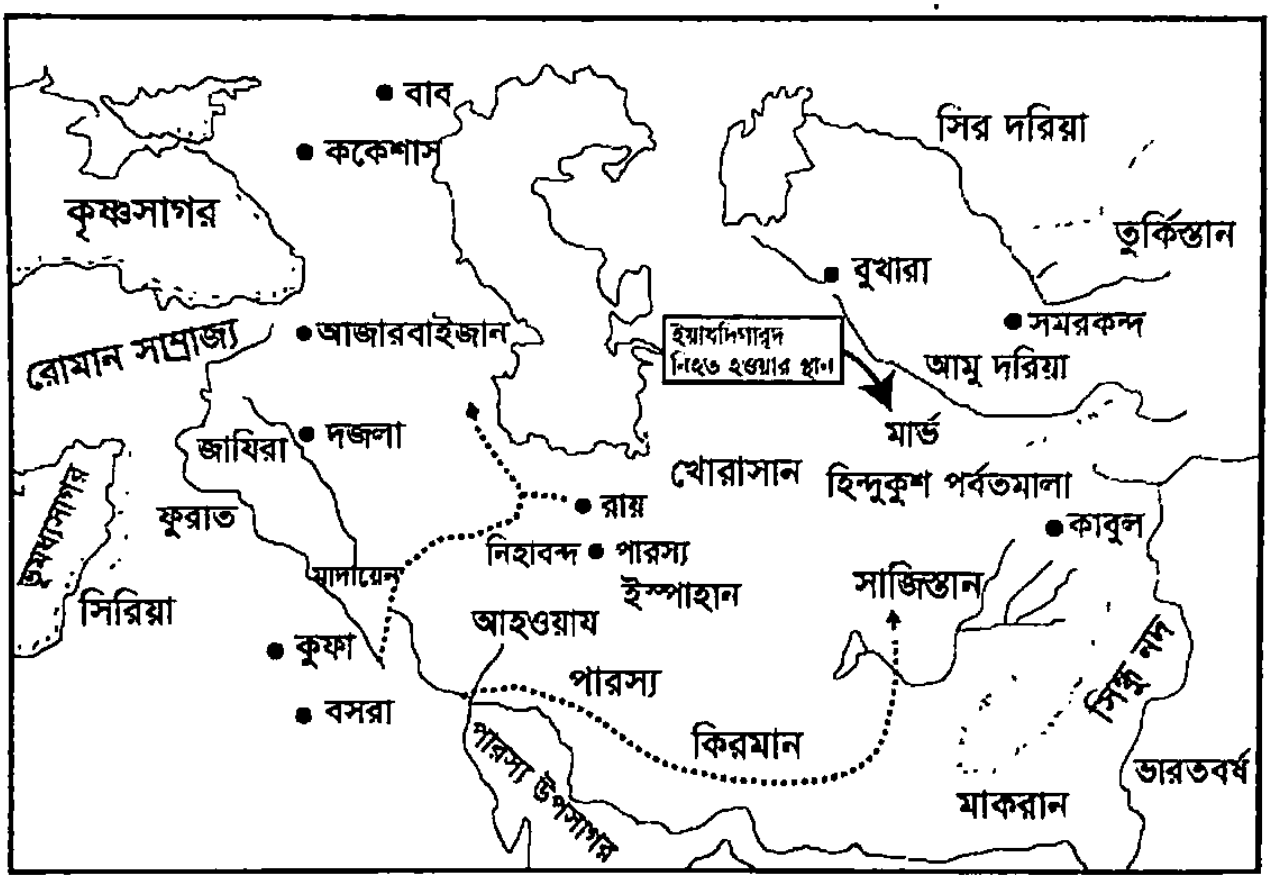
যুদ্ধ চলাকালে বিশিষ্ট যোদ্ধা সাহাবি কা'কা' বিন আমর রাযি. পারসিক সেনাপতি ফিরযানের প্রতি তীক্ষ্ণ নজর রাখছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান যে, ফিরযান পালাতে চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও নুআইম বিন মুকাররিন রাযি. ফিরযানের পিছু নেন এবং হামদান উপত্যকার এক

সংকীর্ণ গিরিপথে তার নাগাল পেয়ে যান। গিরিপথটি ধরে অপরদিক থেকে তখন পারস্য-সম্রাট ইয়াযদিগার্দের জন্য মধুবোঝাই খচ্চর ও গাধার এক বিরাট কাফেলা আসছিল। খচ্চর ও গাধার কাফেলার কারণে ফিরযানের পালানোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। কা'কা' রাযি. তাকে ধরে ফেলেন এবং হত্যা করেন। এখান থেকেই এই ঐতিহাসিক উক্তি প্রসিদ্ধি লাভ করে—'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলার মধুবাহী সৈন্যদলও আছে!' মুসলিম বীরদ্বয় মধুবোঝাই পশুগুলোকে হাঁকিয়ে মুসলিম সৈন্যদলের কাছে নিয়ে আসেন। হামদান উপত্যকার নাম হয় 'মধু-উপত্যকা'!

সমরবিশারদ জনৈক ইতিহাসবিদ লিখেছেন,

> নিহাবন্দ যুদ্ধে তুলায়হা বিন খুওয়াইলিদের উদ্ভাবিত এই পরিকল্পনাটি পরবর্তী সময়ে সামরিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হয়। এরপর অনেক সেনাপতিই পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়েছে। এটিই ছিল পুরো এশিয়া মহাদেশজুড়ে প্রভাব বিস্তারকারী মঙ্গোল-তাতার সেনাপতি চেঙ্গিস খানের সবচেয়ে কার্যকর ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। তিনি প্রথমে শত্রুর ওপর প্রবল আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে সচেষ্ট হতেন। এতে লক্ষ্য বাস্তবায়িত না হলে তিনি পরাজয়ের ভান করে কৌশলে পিছু হটতেন এবং প্রতিপক্ষকে পূর্বপ্রস্তুতকৃত গোপন ফাঁদের দিকে টেনে আনতেন। প্রতিপক্ষ ধীরে ধীরে এমন স্থানে চলে আসত, যেখানে তিনি হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে পর্যুদস্ত করে ফেলতেন এবং কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন করতেন। আইনে জালুতের প্রান্তরে তাতারদের ত্রাস সাইফুদ্দিন কুতুজ রহ.-ও এই একই পদ্ধতি কাজে লাগিয়েছিলেন। তাতারদের পদ্ধতি তাতারদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে তিনি তাদের প্রথমবারের মতো পরাজয় উপহার দিয়েছিলেন। তাতাররা কল্পনাও করতে পারেনি যে, অন্য কেউ তাদের বিরুদ্ধে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারে। সামরিক শাস্ত্রে এ পদ্ধতিটি অ্যামবুশ (Ambush) নামে পরিচিত।
>
> ইসলামি ইতিহাসে নিহাবন্দের যুদ্ধ একটি মীমাংসাকর যুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে। এ যুদ্ধের মাধ্যমেই পারস্য সাম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। বরং এর পরপরই খলিফা উমর

রাযি. পারসিকদের পক্ষ হতে সামান্য হুমকির সম্ভাবনাও সমূলে উৎপাটন করার সংকল্প করেন এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তের খোরাসান হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ফার্‌স (Fars) নগরী পর্যন্ত এবং উত্তর-পশ্চিমের আজারবাইজান হতে দক্ষিণ-পূর্বে মাকরান (Makran) পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যের সবগুলো অঞ্চল জয়ের জন্য একই সঙ্গে নয়টি বাহিনী প্রস্তুত করেন। ২২ হিজরি (৬৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) শেষ হওয়ার পূর্বেই ইস্পাহান, রায়, সাজিস্তানসহ সবগুলো অঞ্চল ইসলামি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।



মানচিত্র নং-৪

২২ হিজরি পর্যন্ত পারস্য সাম্রাজ্যে মুসলমানদের বিজয়াভিযান

শেষ পারসিক সম্রাট ইয়াযদিগার্দের পতন : আল্লাহর জমিনে খোদাদ্রোহীদের চূড়ান্ত লাঞ্ছনাবরণ

২২ হিজরি সনে আহনাফ বিন কায়স রাযি. খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর কাছে পারস্য-সম্রাট ইয়াযদিগার্দকে শায়েস্তা করার জন্য খোরাসান অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। খোরাসান ছিল তৎকালীন পারস্যের পূর্বাঞ্চলের একটি বড় অঞ্চল। খোরাসানে অবস্থান করে ইয়াযদিগার্দ পারসিক নাগরিক ও সৈন্যদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্ররোচিত করে যাচ্ছিলেন।

মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ জানতে পেরে ইয়াযদিগার্দ ছুগদ (Sughd)-এর শাসক, চীনের শাসক ও তুর্কিস্তানের শাসকের কাছে সাহায্য চেয়ে বার্তা পাঠান। কিন্তু তাদের কেউই রাজ্যহারা কিসরার বার্তাকে গুরুত্ব দেয়নি।

আহনাফ রাযি. খোরাসানে প্রবেশ করে একের পর এক নগরী জয় করতে থাকেন আর ইয়াযদিগার্দ এক নগরী থেকে আরেক নগরীতে পালাতে থাকেন। একপর্যায়ে নিরুপায় ইয়াযদিগার্দ খোরাসান ত্যাগ করে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে মাওয়ারাউন নাহার[১৩০] অঞ্চলে আশ্রয় নেন।

আহনাফ পুরো খোরাসানের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রতিটি নগরীতে একজন করে গভর্নর নিযুক্ত করেন এবং এ বিষয়ে বার্তার মাধ্যমে

---

১৩০. **মাওয়ারাউন নাহার** : মধ্য এশিয়ার একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলের নাম মাওয়ারাউন নাহার বা ট্রান্সঅক্সিয়ানা (Transoxiana)। এর বিস্তৃতি পশ্চিমে মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম ও বিখ্যাত নদী আমু দরিয়া হতে পূর্বে মধ্য এশিয়ার আরেক বিখ্যাত নদী সির দরিয়া পর্যন্ত। আধুনিক রাষ্ট্রসীমার উজবেকিস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তানের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ ও কিরগিজস্তানের দক্ষিণ অংশজুড়ে ছিল অঞ্চলটির বিস্তৃতি। মুসলিম অভিযাত্রীগণ খোরাসান থেকে আমু দরিয়া পাড়ি দিয়ে এ অঞ্চল জয় করেন এবং অঞ্চলটিকে মাওয়ারাউন নাহার «بلاد ما وراء النهر» বা 'নদীর ওপারের অঞ্চল' নামে অভিহিত করেন।

প্রথম হিজরি শতকের শেষ দিকে ষষ্ঠ উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের আমলে বিখ্যাত মুসলিম বীর সেনাপতি কুতায়বা বিন মুসলিম বাহিলি রহ.-এর হাতে অঞ্চলটি বিজিত হয় এবং পরবর্তী সময়ে ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। বুখারা, সমরকন্দ, বায়কান্দ, ফারাব, ফারগানা, শাশ, তিরমিজ, কাসান, খোয়ারিজম, কাশগর, দাবুসিয়াসহ বিভিন্ন সুবিখ্যাত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র এ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল।

খলিফা উমর রাযি.-কে অবহিত করেন। খলিফা আহনাফকে নদী পাড়ি দিয়ে মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলে প্রবেশ করতে নিষেধ করে লেখেন, 'তোমার কর্তৃত্বে খোরাসানের যেসব অঞ্চল রয়েছে, সেগুলোর যথাযথ সংরক্ষণ কর।'

ইতিপূর্বে ইয়াযদিগার্দ মাওয়ারাউন নাহার অঞ্চলের বিভিন্ন শাসকের কাছে সাহায্যপ্রার্থনা করলেও কেউ তাকে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু এবার যখন তিনি তাদের দেশে আশ্রয় নেন, তখন রাজন্যবর্গের নীতি অনুসারে তাকে সাহায্য করা তাদের দায়িত্বে এসে যায়। এবার তুর্কি শাসক খাকানে আযম ইয়াযদিগার্দকে সহায়তা করতে সম্মত হন। ইয়াযদিগার্দ তুর্কি শাসকসহ বিশাল এক বাহিনী নিয়ে খোরাসান ফিরে আসেন এবং কিছু নগরী পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। এরপর তিনি আহনাফ বিন কায়সের অবস্থানস্থল অভিমুখে রওনা হন। আহনাফের সঙ্গে তখন ছিল সর্বসাকুল্যে বিশ হাজার সৈন্য। আহনাফ রাযি. তাদের উদ্দেশে বলেন, নিঃসন্দেহে তোমরা সংখ্যায় অল্প আর তোমাদের শত্রুরা অধিক। কিন্তু এর কারণে তোমরা ভীতসন্ত্রস্ত ও হীনবল হয়ো না। এমন কত ছোট দলই-না রয়েছে, যারা আল্লাহর হুকুমে বড় দলের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছে। আর আল্লাহ তো তাদের সঙ্গে আছেন, যারা সবর ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়।

তুর্কিদের এক বিস্ময়কর যুদ্ধনীতি ছিল। তারা কোথাও যুদ্ধ করতে গেলে ততক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের গোপন ঘাঁটি থেকে লড়াইয়ের উদ্দেশ্যে বের হতো না, যতক্ষণ না তাদের মধ্য হতে প্রবীণ তিনজন ব্যক্তি সামনে অগ্রসর হতো। তাদের নীতি ছিল—প্রথমজন বের হয়ে সঙ্গে থাকা তবলায় আঘাত করবে। তার আওয়াজ শুনে দ্বিতীয়জন বের হয়ে আসবে। দ্বিতীয়জনের তবলার আওয়াজ শুনলে তৃতীয়জন বের হয়ে আসবে। আর তৃতীয়জনের তবলার আওয়াজ শুনলে পুরো বাহিনী যুদ্ধ করতে বের হয়ে আসবে।

শত্রুপক্ষ কোথায় রাত্রিযাপন করছে, তা অবলোকন করার জন্য মুসলিম সেনাপতি আহনাফ বিন কায়স রাযি. রাতের আঁধারে কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে বের হন। ভোরের সামান্য পূর্বে তুর্কি শিবির থেকে তবলাধারী তিন ব্যক্তি বের হয়ে এলে আহনাফ একের পর এক তিনজনকেই হত্যা করেন। প্রত্যুষে তুর্কিরা বের হয়ে যখন তিনজনকেই নিহত অবস্থায় পায়, তখন তাদের শাসক একে অশুভ ও কুলক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে মন্তব্য

করেন, এই জাতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমাদের কোনো কল্যাণ নেই। সুতরাং সকলে চলো, ফিরে যাই।

এভাবে কিসরার এবারের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। যাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিলেন, তারা তাকে ছেড়ে চলে যায়। তিনি হয়রান হয়ে ভাবতে থাকেন, কোথায় যাবেন? কার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করবেন?

তার সঙ্গী কয়েকজন জ্ঞানী ব্যক্তি তাকে পরামর্শ দিয়ে বলে, আমাদের মত হলো, আমরা তাদের সঙ্গে (অর্থের বিনিময়ে) সন্ধিচুক্তি করব। কারণ, তারা দ্বীনের দাবি মেনে চলে এবং নিরাপত্তা দান করে। এর ফলে আমরা আমাদের দেশেই থাকতে পারব আর তারা হবে আমাদের প্রতিবেশী। অধিকন্তু তারা আমাদের জন্য অন্যদের তুলনায় কল্যাণকর প্রমাণিত হবে। কিন্তু কিসরা তাদের এই সুপরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেন।

এরপর ইয়াযদিগার্দ চীন-সম্রাটের কাছে সহায়তা প্রার্থনা করে দূত প্রেরণ করেন। চীন-সম্রাট ইয়াযদিগার্দের দূতের কাছে মুসলিম অভিযাত্রীদের বিবরণ জানতে চান। দূত তাকে মুসলমানদের ইবাদতরীতি, যুদ্ধরীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করে। এরপর চীন-সম্রাট ইয়াযদিগার্দের কাছে ফিরতি বার্তায় লেখেন, আমি চাইলেই আপনার সাহায্যার্থে এত বিশাল এক বাহিনী প্রেরণ করতে পারি, যার শুরু অংশ থাকবে মার্ভে (Merv) আর শেষ অংশ থাকবে চীনে। আমার ওপর আপনার অধিকার কতটুকু, সে সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা এ ক্ষেত্রে কোনো অন্তরায় নয়। কিন্তু আপনার দূত যাদের পরিচয়-বিবরণ আমাকে শোনাল, তারা তো এমন (দুর্জেয় ও অদম্য) যে, চেষ্টা করলে পাহাড়পর্বতকেও ধ্বংস করে ফেলতে পারে। সুতরাং (আপনার প্রতি আমার সুপরামর্শ হলো) আপনি তাদের সঙ্গে সমঝোতা করুন এবং সমঝোতার মাধ্যমে যা লাভ করেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন।

চীন-সম্রাটের কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ইয়াযদিগার্দ এবার তার গুটিকয়েক সঙ্গীকে নিয়ে মার্ভে আশ্রয় নেন। মার্ভের কয়েকজন অধিবাসীর কাছে তিনি অর্থসাহায্য চাইলে তারা তাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে নিজেদের জন্য অনিষ্টকর বিবেচনা করে। তারা তুর্কিদের কাছে লোক পাঠিয়ে তাদেরকে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলে। তুর্কিরা এসে ইয়াযদিগার্দের সঙ্গীদেরকে হত্যা করে। ইয়াযদিগার্দ কোনোমতে পালিয়ে নদীর তীরে জনৈক জাঁতাখোদাইকারীর বাড়িতে আশ্রয় নেন।

সেখানে তিনি এক রাত অবস্থান করেন। রাতে ইয়াযদিগার্দ ঘুমিয়ে পড়লে আশ্রয়দাতা তাকে হত্যা করে এবং তার পোশাক ও মুকুট নিয়ে নেয়। এদিকে তুর্কিরা তাকে খুঁজতে খুঁজতে জাঁতাখোদাইকারীর বাড়িতে পৌঁছে তাকে মৃত অবস্থায় পায়। তুর্কিরা এবার লোকটিকে তার পরিবার-পরিজনসহ হত্যা করে এবং কিসরার সব সম্পদ নিয়ে নেয়। এরপর তারা কিসরার মৃতদেহ একটি কফিনে ভরে ইসতাখ্‌রে (Istakhr) নিয়ে যায়। ইয়াযদিগার্দই ছিলেন পৃথিবীর বুকে শেষ পারস্য-শাসক 'কিসরা'। প্রিয় নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«إِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلَا كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُمَا فِي سَبِيلِ اللهِ»

> কায়সারের (রোমান সম্রাট) পতনের পর আর কোনো কায়সার আসবে না আর কিসরার (পারস্য সম্রাট) পতনের পর আর কোনো কিসরা আসবে না। ওই মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! অবশ্যই তাদের সম্পদরাজি আল্লাহর পথে ব্যয় হবে।[১৩১]

খলিফা উমর রাযি.-এর স্মরণীয় দুটি ঘটনা

[এক]

হজরত উমর রাযি.-এর খাদেম আসলাম বলেন, একরাতে আমি উমরের সঙ্গে বের হলাম এবং মদিনা থেকে দূরে চলে এলাম। আমরা দূরবর্তী বাড়িঘরের অধিবাসীদের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম। হঠাৎ আমরা দূরে আগুন দেখতে পেলাম। উমর বললেন, 'আসলাম! মনে হয়, সেখানে কোনো কাফেলা আছে, রাত ও শীতের কারণে তারা সেখানে আটকে গেছে। চলো, আমরা সেখানে যাই।' আমরা দ্রুতপদে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম, একজন নারী কয়েকজন শিশুসহ অবস্থান করছে। আগুনের ওপর একটি ডেকচিও বসানো আছে। উমর তাকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাদের কী অবস্থা?' মহিলাটি উত্তর দিলো, 'আমরা রাত ও শীতের কারণে আটকে গেছি।'

---

১৩১. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৬৬২৯।

'বাচ্চাদের কী হয়েছে? ওরা কাঁদছে কেন?'

'ক্ষুধায়।' মহিলার সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'ডেকচিতে কী রান্না হচ্ছে?' খলিফা জিজ্ঞেস করলেন।

'বাচ্চাদের শান্ত করতে শুধু পানি বসিয়ে রেখেছি, যেন ওরা কাঁদতে কাঁদতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মহিলাটি উত্তর দিলো, 'কিয়ামতের দিন উমর ও আমাদের মাঝে মহান আল্লাহ ইনসাফ করবেন।'

'আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন। আরে! উমর কীকরে আপনাদের দুরবস্থার কথা জানবে?'

'তিনি তো আমাদের দায়িত্ব পালন করছেন,' ক্ষোভভরা কণ্ঠে মহিলাটি উত্তর দিলো, 'তাহলে আমাদের খোঁজখবর রাখবেন না কেন?'

এরপর খলিফা আমার কাছে এসে বললেন, 'আমাকে নিয়ে চলো।' আমরা দ্রুতপদে পথ চলে (বায়তুল মালের) আটার গুদামঘরের কাছে এলাম। তিনি সেখান থেকে এক বস্তা আটা ও এক পাত্র চর্বি-তেল বের করে আমাকে বললেন, 'এগুলো আমার পিঠে তুলে দাও।'

'আমিই আপনার পক্ষ থেকে বহন করছি।' আমি বললাম।

'আরে হতচ্ছাড়া! তুমি কি কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে?!' খলিফা অসন্তোষকণ্ঠে বললেন।

এরপর আমি বস্তা ও পাত্রটি তার পিঠে উঠিয়ে দিলাম। আমরা দ্রুত পথ চলে পূর্বের স্থানে পৌঁছলে তিনি মহিলার কাছে বোঝাগুলো নামিয়ে রাখলেন। এরপর বস্তা থেকে কিছু আটা বের করে মহিলাটিকে বললেন, 'আটাগুলো ডেকচিতে ঢালুন; আমি নাড়ছি।' খলিফা ছিলেন ঘন ও দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট। তিনি যখন ডেকচির নিচে আগুনে ফুঁ দিচ্ছিলেন, আমি দেখলাম, তার দাড়ির ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। রান্না শেষ করে তিনি আগুনের ওপর থেকে ডেকচি নামালেন এবং মহিলাকে বললেন, 'কিছু নিয়ে আসুন।' মহিলাটি একটি বাসন নিয়ে এলে তিনি তাতে সবটুকু খাবার ঢেলে দিলেন। এরপর তিনি মহিলাকে বললেন, 'আমি খাবার (ঠান্ডা করার জন্য) ছড়িয়ে দিচ্ছি; আপনি ওদেরকে খাইয়ে দিন।' বাচ্চারা যখন খেয়ে পরিতৃপ্ত হলো, তখন তিনি বাকি খাবারটুকু মহিলার

কাছে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। আমিও উঠলাম। মহিলা বলল, 'আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আপনি তো সদাচরণে আমিরুল মুমিনিনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ!' খলিফা বললেন, 'তার সম্পর্কে কল্যাণ কামনাই করুন। আর আপনি যখন আমিরুল মুমিনিনের কাছে যাবেন, তখন ইনশাআল্লাহ আমাকে সেখানে পাবেন।'

এরপর খলিফা সেখান থেকে উঠে একটু দূরে গিয়ে বসে রইলেন। আমি তাকে বললাম, 'আপনাকে কেমন যেন মনে হচ্ছে!' তিনি আমার কথার কোনো উত্তর দিলেন না। দূরে তাকিয়ে দেখলাম—মহিলার ছোট ছোট সন্তানগুলো আনন্দে পরস্পর দুষ্টুমি করছে। কিছুক্ষণ পর তারা তৃপ্তির সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন খলিফা উঠে দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর হামদ পাঠ করলেন। এরপর আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আসলাম! প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণেই বাচ্চাগুলো কাঁদছিল এবং নির্ঘুম ছিল। তাই তাদেরকে হাস্যমুখর ও ঘুমন্ত না দেখে আমি এখান থেকে যেতে চাচ্ছিলাম না।'

[দুই]

আরেক রাতে খলিফা উমর বেরিয়েছেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন, একটি ঘর থেকে এক নারীকণ্ঠের রোদনধ্বনি ভেসে আসছে আর ঘরের দরজায় এক ব্যক্তি বসে আছে। উমর রাযি. লোকটিকে সালাম দিয়ে তার পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন। লোকটি জানাল, সে একজন বেদুইন; আমিরুল মুমিনিনের অনুগ্রহ প্রত্যাশায় মদিনায় এসেছে। উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরের ভেতর থেকে কীসের আওয়াজ ভেসে আসছে?'

লোকটি তখনও উমর রাযি.-কে চিনতে পারেনি। সে উত্তর দিলো, 'আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আপনি দয়া করে নিজের কাজে যান, যা জানা আপনার প্রয়োজন নেই, সে বিষয়ে প্রশ্ন করবেন না।' উমর রাযি. বারবার পীড়াপীড়ি করায় সে উত্তর দিলো, 'একজন নারী আসন্ন প্রসববেদনায় কাঁদছে; কিন্তু তার কাছে (সহায়তা করার মতো) কেউ নেই।' উমর রাযি. তৎক্ষণাৎ দ্রুত বাড়িতে ফিরে এলেন এবং তার স্ত্রী (আলি রাযি.-এর কন্যা) উম্মে কুলসুমকে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমার কাছে সাওয়াব অর্জনের এক সুযোগ এনে দিয়েছেন। তুমি কি তা অর্জনে আগ্রহী?' স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, 'তা কী?'

উমর রাযি. তাকে বিস্তারিত অবহিত করলেন এবং সদ্যপ্রসূত শিশুর জন্য প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় এবং প্রসূতি মায়ের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে বললেন। এ ছাড়াও তিনি সঙ্গে একটি ডেকচি এবং কিছু আটা ও ঘি নিতে নির্দেশ দিলেন। উমর রাযি. ডেকচিটি নিলেন আর তার স্ত্রী তার পেছন পেছন চললেন। নির্দিষ্ট বাড়ির কাছে পৌঁছে উমর রাযি. তার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি ভেতরে মহিলার কাছে যাও।' খলিফা নিজে বসলেন বাইরে অপেক্ষমান লোকটির কাছে। এরপর তিনি আগুন জ্বালিয়ে সাথে আনা খাবার রান্না করলেন। লোকটি পাশে বসে সব দেখছিল। তার জানা নেই যে, পাশে বসা ব্যক্তিটিই ...।

প্রসূতি নারীটি সন্তান প্রসব করার পর ভেতর থেকে উমর রাযি.-এর স্ত্রী বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনার সঙ্গীকে পুত্রসন্তানের পিতৃত্বের সুসংবাদ দিন।' বেদুইন ব্যক্তিটি আমিরুল মুমিনিনের পরিচয় পেয়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়ল এবং ভয়ে ও শ্রদ্ধায় উঠে খলিফার কাছ থেকে দূরে সরতে লাগল। উমর রাযি. তাকে বললেন, 'যেভাবে ছিলে, নির্দ্বিধায় সেভাবেই বসে থাক।' এরপর খলিফা ডেকচিটি নিয়ে অসুস্থ মহিলাটিকে খাওয়ানোর জন্য তার স্ত্রীর কাছে দিলেন। সবশেষে উম্মে কুলসুম যখন বেরিয়ে এলেন, তখন খলিফা উমর রাযি. বেদুইন লোকটিকে বললেন, 'আগামীকাল আমার কাছে আসবে; আমি (বায়তুল মাল থেকে) তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র প্রদান করতে বলে দেবো।'

আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর উদ্দেশে উমর রাযি.-এর একটি পত্র

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি. কুফা, বসরা, শাম, মিশরসহ ইসলামি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য কাজি নিযুক্ত করেছিলেন। তাদের কেউ কেউ কেবল বিচারকার্যই আঞ্জাম দিতেন, যেমন কুফার কাজি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি.; আবার কেউ কেউ গভর্নর ও বিচারক—উভয় দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করতেন, যেমন বসরার গভর্নর আবু মুসা আশআরি রাযি.। খলিফা উমর রাযি. বসরার গভর্নর ও কাজি আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর কাছে একটি উপদেশসমৃদ্ধ বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যা পাঠ করলে আমাদের সামনে খলিফা উমর রাযি.-এর বিচারব্যবস্থা ও গৃহীত নীতি সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা অর্জিত হবে। নিম্নে পত্রটির ভাষ্য উল্লেখ করা হলো—

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আল্লাহর বান্দা উমর (আমিরুল মুমিনিন)-এর পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ বিন কায়সের প্রতি। আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। পরকথা, বিচারকার্যের ভিত্তি দুটি—অকাট্য ফরজ বিধান ও অনুসরণীয় সুন্নাত। সুতরাং যখন আপনার কাছে কোনো মোকদ্দমা দায়ের করা হয়, প্রথমে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করুন। কারণ, যে হক কথা বাস্তবায়ন করা হয় না, তার দ্বারা কোনো লাভ নেই।

আচরণ-উচ্চারণ, দৃষ্টিদান ও স্থানদান—সকল ক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান সহমর্মিতা প্রদর্শন করবেন, যেন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আপনার প্রতি অন্যায় আচরণের সাহস না করে এবং কোনো দুর্বল ব্যক্তি আপনার ন্যায়-আচরণ হতে নিরাশ হয়ে না পড়ে। সাক্ষ্য'প্রমাণ উপস্থাপন করা বাদীর কর্তব্য, আর শপথের দায়িত্ব বিবাদীর।

মুসলমানদের মাঝে (বিবাদগত) কোনো বিষয়ে মীমাংসা ও সমঝোতা করা বৈধ; তবে এমন সমঝোতা নয়, যা হারামকে বৈধতা দান করে কিংবা হালালকে অবৈধ করে দেয়।

গতকাল কোনো ফয়সালা করার পর আজ যদি আপনি পুনরায় নিজের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করেন, এরপর আপনার সুবোধের কারণে সঠিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি করতে পারেন, তাহলে পূর্বের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে সত্যকে সাব্যস্ত করতে দ্বিধা করবেন না। কারণ, হক ও সত্য হলো চিরন্তন আর অন্যায় ও গোমরাহির ওপর অটল থাকার চেয়ে ন্যায় ও সত্যকে পুনর্বিবেচনা করাই শ্রেয়।

যে বিষয় কুরআন-সুন্নাহর মাঝে (সুস্পষ্ট উল্লেখ) নেই এবং তার বিধান বিষয়ে আপনার অন্তরে দ্বিধা আছে, তা নিয়ে প্রচুর চিন্তাভাবনা করে বোঝার চেষ্টা করবেন। এরপর উক্ত বিষয়টির সমজাতীয় বিষয় খুঁজে বের করে উদ্দিষ্ট মাসআলার সমাধান অনুমান করবেন এবং যে সমাধানটি আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী ও হকের অধিক সদৃশ বলে মনে হয় তাই গ্রহণ করবেন।

যদি কোনো বিচারপ্রার্থী অদৃশ্য কোনো হক দাবি করে, তাহলে তাকে প্রমাণ প্রদানের সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারলে তার পক্ষে ফয়সালা করবেন, অন্যথায় মোকাদ্দমা বাতিল হয়ে যাবে। এর মধ্যেই সন্দেহ হতে নিষ্কৃতি রয়েছে।

ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি হদের শিকার হয়েছে বা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে অথবা মিত্রতা বা বংশপরিচয়ের দাবির ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হয়েছে, তারা ব্যতীত সকল মুসলমানগণ পরস্পর সাক্ষ্যদানে ন্যায়পরায়ণ। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদের গোপন দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ও শপথের মাধ্যমে সন্দেহ দূরীভূত করেন।

অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা, বিরক্তি ও ক্রোধ, কোনো পক্ষের প্রতি বিরাগভাব, তর্কবিতর্কের সময় বিরক্তি ও অবজ্ঞাভাব ইত্যাদি পরিহার করবেন। কেননা, হকের স্থানে হকের আচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা মহা আজর প্রদান করেন। আর যার নিয়ত বিশুদ্ধ হয় এবং প্রয়োজনে সে নিজের বিরুদ্ধে যায়, মানুষের সঙ্গে তার লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বিপরীতে যে মানুষের সামনে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাব করে, অথচ আল্লাহ জানেন যে, এটি তার প্রকৃত আচরণ নয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন। আর আল্লাহর কাছে যে অপরিসীম রিজিক ও দয়ার ভান্ডারের প্রতিদান রয়েছে, তা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা! ওয়াসসালাম।

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর শাহাদাত

যেহেতু ইসলামের আগমনের মাধ্যমেই সমকালীন ইহুদিদের বিকৃত ধর্মের অসারতা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম নিয়ে তাদের লুকোচুরি ও প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়, তাই প্রথম থেকেই ইহুদিজাতি ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু কালক্রমে প্রথমে আরব উপদ্বীপজুড়ে এবং তারপর আরব সীমানার বাইরেও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে ইহুদিরা অনুভব করে যে, এখন আর তাদের পক্ষে সম্মুখ সমরে মুসলমানদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তখন কতক ইহুদি

যদি কোনো বিচারপ্রার্থী অদৃশ্য কোনো হক দাবি করে, তাহলে তাকে প্রমাণ প্রদানের সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সে সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করতে পারলে তার পক্ষে ফয়সালা করবেন, অন্যথায় মোকাদ্দমা বাতিল হয়ে যাবে। এর মধ্যেই সন্দেহ হতে নিষ্কৃতি রয়েছে।

ইতিপূর্বে যে ব্যক্তি হদের শিকার হয়েছে বা মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছে অথবা মিত্রতা বা বংশপরিচয়ের দাবির ক্ষেত্রে অভিযুক্ত হয়েছে, তারা ব্যতীত সকল মুসলমানগণ পরস্পর সাক্ষ্যদানে ন্যায়পরায়ণ। কারণ, আল্লাহ তাআলা আমাদের গোপন দোষত্রুটি উপেক্ষা করেন এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ ও শপথের মাধ্যমে সন্দেহ দূরীভূত করেন।

অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতা, বিরক্তি ও ক্রোধ, কোনো পক্ষের প্রতি বিরাগভাব, তর্কবিতর্কের সময় বিরক্তি ও অবজ্ঞাভাব ইত্যাদি পরিহার করবেন। কেননা, হকের স্থানে হকের আচরণের কারণে আল্লাহ তাআলা মহা আজর প্রদান করেন। আর যার নিয়ত বিশুদ্ধ হয় এবং প্রয়োজনে সে নিজের বিরুদ্ধে যায়, মানুষের সঙ্গে তার লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। বিপরীতে যে মানুষের সামনে প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম ভাব করে, অথচ আল্লাহ জানেন যে, এটি তার প্রকৃত আচরণ নয়, আল্লাহ তাকে অপদস্থ করেন। আর আল্লাহর কাছে যে অপরিসীম রিজিক ও দয়ার ভান্ডারের প্রতিদান রয়েছে, তা সম্পর্কে আপনার কী ধারণা! ওয়াসসালাম।

খলিফাতুল মুসলিমিন উমর রাযি.-এর শাহাদাত

যেহেতু ইসলামের আগমনের মাধ্যমেই সমকালীন ইহুদিদের বিকৃত ধর্মের অসারতা সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যায় এবং ধর্ম নিয়ে তাদের লুকোচুরি ও প্রতারণার বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায়, তাই প্রথম থেকেই ইহুদিজাতি ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু কালক্রমে প্রথমে আরব উপদ্বীপজুড়ে এবং তারপর আরব সীমানার বাইরেও ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলে ইহুদিরা অনুভব করে যে, এখন আর তাদের পক্ষে সম্মুখ সমরে মুসলমানদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তখন কতক ইহুদি

অন্তরের সুপ্ত বিদ্বেষ গোপন রেখে বাহ্যিকভাবে ইসলামে দাখিল হয়ে যায় এবং মুসলমানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলামের ক্ষতিসাধনের কর্মনীতি অবলম্বন করে।

অপরদিকে মুসলমানদের হাতে পারসিক সাসানি সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে জরথুস্ত্রবাদে বিশ্বাসী পারস্যের মূর্তিপূজারি সম্প্রদায়ের অনেকে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের কাতারে মিশে গিয়ে ইসলামের ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে। এভাবে ইসলামের ক্ষতি করার প্রশ্নে ইহুদি চক্রান্ত ও জরথুস্ত্রবাদী পরিকল্পনা এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। যেহেতু ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পারস্য ভূমিতে ইসলামের বিজয়াভিযানে খলিফা হজরত উমর রাযি.-এর অগ্রবর্তী ভূমিকা ছিল, তাই স্বাভাবিকভাবেই তিনি উভয় পক্ষের প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

গভীর দূরদৃষ্টি ও বিস্তৃত চিন্তাশক্তির অধিকারী খলিফা উমর রাযি. এ সবকিছু সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। এ কারণেই তিনি ইসলামি সমাজে বহিরাগতদের সংমিশ্রণ নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল— মদিনার বাইরে থেকে আগত জরথুস্ত্রবাদী ও যুদ্ধবন্দি কাফিরদের সহাবস্থানে মদিনার মুসলমানদের দ্বীনি চিন্তাচেতনা আক্রান্ত হতে পারে এবং তারা ইসলামি কাঠামোকে ধ্বংস করার চেষ্টা চালাতে পারে। এ কারণে তিনি পারসিকদের মদিনায় বসবাসে বাধা প্রদান করতেন। কিন্তু এরপরও বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রকাশ করে কিছু পারসিক নাগরিক মদিনায় অবস্থান করতে সক্ষম হয় এবং নিজেদের গোপন অভিপ্রায় বাস্তবায়নের সুযোগ খুঁজতে থাকে।

কুফার গভর্নর হজরত মুগিরা বিন শুবা রাযি.-এর ফিরুয নামক একটি ক্রীতদাস ছিল। আবু লু'লুআ উপনামধারী ফিরুয লোহা ও কাঠের কাজসহ বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে দক্ষ ছিল। মুগিরা রাযি. খলিফা উমর রাযি.-কে অনুরোধ করেন যে, ফিরুযকে মদিনায় বসবাসের অনুমতি দেওয়া হলে তার দ্বারা মদিনার মুসলিম সমাজ উপকৃত হবে। ফলে খলিফা তাকে মদিনায় বসবাসের অনুমতি প্রদান করেন।

ফিরুয ছিল অত্যন্ত ধূর্ত ও মন্দ প্রকৃতির লোক। সে অন্তরে ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। মদিনায় কাফির শিশুবন্দিদের দেখলে সে

তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে কাঁদতে শুরু করত এবং বলত, 'উমর আমার কলিজা ছিঁড়ে ফেলেছে।' ফিরুয খলিফা উমর রাযি.-এর চলাফেরা ও কর্মকাণ্ডের প্রতি নজর রেখে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করছিল। অবশেষে সে সিদ্ধান্ত নেয় যে, নামাজের সময়ই হলো খলিফাতুল মুসলিমিনকে হত্যা করার সবচেয়ে সহজ ও উপযুক্ত সময়।

ইমাম বুখারি রহ. খলিফা উমর রাযি.-এর শাহাদাতের ঘটনা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি সহিহ সনদে হজরত আমর বিন মায়মুন রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, আমর বিন মায়মুন বলেন—

যেদিন ভোরে তিনি (খলিফাতুল মুসলিমিন উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.) আহত হলেন, আমি তার কাছেই দাঁড়ানো ছিলাম। আমার ও তার মাঝে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস ব্যতীত অন্য কেউ ছিল না। উমর রাযি. (নামাজ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে) দু-কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন—কাতারে কোনো ত্রুটি নেই, তখন সামনে (ইমামের স্থানে) অগ্রসর হয়ে তাকবির বলতেন। তিনি সাধারণত (ফজরের) প্রথম রাকাতে সুরা ইউসুফ, সুরা নাহল বা এ জাতীয় দীর্ঘ সুরা তেলাওয়াত করতেন, যেন (অনুপস্থিত) লোকেরা জামাতে শরিক হতে পারে। সেদিন তাকবির বলার পরই (যখন তাকে আঘাত করা হলো) আমি তাকে বলতে শুনলাম, কুকুরটি আমাকে হত্যা করেছে (অথবা বলেছেন, আঘাত করেছে)। ঘাতক কাফির গোলামটি পলায়নের সময় ডানে-বামে যাকেই অতিক্রম করছিল, তাকেই তার হাতের দুধারি খঞ্জরটি দিয়ে আঘাত করছিল। এভাবে সে তেরোজনকে আহত করল, যাদের মধ্যে সাতজনই পরে শহিদ হয়। এ অবস্থা দেখে জনৈক মুসল্লি নিজের চাদর ঘাতকের শরীরে নিক্ষেপ করল। ঘাতক যখন বুঝতে পারল যে, সে ধরা পড়ে যাচ্ছে, তখন সে আত্মহত্যা করল।

উমর রাযি. আবদুর রহমান বিন আওফের হাত ধরে তাকে (ইমামতির জন্য) এগিয়ে দিলেন। যারা খুব কাছে ছিল, কেবল তারাই বিষয়টি দেখতে পেল। আর মসজিদের অন্যান্য প্রান্তে যারা ছিল, তারা কেবল এতটুকু উপলব্ধি করতে পারল যে, উমরের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, তাই তারা 'সুবহানাল্লাহ' বলতে লাগল। আবদুর রহমান বিন আওফ সংক্ষেপে নামাজ শেষ করলেন। যখন সকলে চলে গেল, তখন খলিফা ইবনে আব্বাসকে বললেন, 'দেখো তো, আমাকে কে আঘাত করল?' তিনি

কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করার পর এসে বললেন, 'মুগিরার গোলাম।' উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'সেই কারিগর গোলামটি?' ইবনে আব্বাস উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

উমর বললেন, 'আল্লাহ তার সর্বনাশ করুন। আমি তো তাকে ভালো কাজের কথাই বলেছিলাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার মৃত্যু ইসলামের দাবিদার কোনো ব্যক্তির হাতে ঘটাননি। তুমি ও তোমার পিতা (আব্বাস রাযি.) তো মদিনায় অনারবি-অমুসলিম গোলামের সংখ্যাবৃদ্ধি কামনা করতে।' (উল্লেখ্য) আব্বাসের কাছে অনেক কাফির গোলাম ছিল। ইবনে আব্বাস বললেন, 'আপনি চাইলে আমি কাজ সেরে ফেলি (তাদেরকে হত্যা করে ফেলি)।' উমর বললেন, 'ভুল বলছ। তারা তো তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কেবলার দিকে ফিরে ইবাদত করে এবং তোমাদের ন্যায় হজব্রত পালন করে।'

এরপর তাকে তার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। আমরাও তার সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ইতিপূর্বে এরূপ মুসিবত আর কখনো আসেনি। কেউ বলছিল, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিল, তার প্রাণনাশের আশঙ্কা হচ্ছে। তার জন্য নাবিয (খেজুর ভেজানো পানি) আনা হলে তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট থেকে বেরিয়ে গেল। এরপর দুধ নিয়ে আসা হলে তিনি তা পান করলেন। তা-ও তার ক্ষতস্থান দিয়ে বেরিয়ে গেল। তখন সকলে বুঝতে পারল যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। আমরা তার কাছে উপস্থিত হলাম। লোকজন এসে তার প্রশংসা করতে লাগল।

এক যুবক এসে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আপনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন, প্রাথমিক যুগেই ইসলামগ্রহণ করেছেন, যা আপনিও অবগত আছেন, এরপর খলিফা হয়ে ন্যায়-ইনসাফের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন। এরপর আপনি শাহাদাতের (মর্যাদা) লাভ করেছেন।' উমর বললেন, 'আমি কামনা করি যে, তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা কল্যাণকর না হয়ে বরং সমান সমান হয়ে যাক।'

যুবকটি যখন চলে যেতে উদ্যত হলো, তখন তার পরিধেয় লুঙ্গি মাটি স্পর্শ করছিল। তা দেখে উমর বললেন, 'যুবকটিকে আমার কাছে ডেকে আনো।' (যুবকটি আসার পর) তিনি বললেন, 'ভ্রাতুষ্পুত্র! তোমার কাপড়

উঠিয়ে নাও; এতে তোমার কাপড়ও অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে আর তোমার রবের নিকটও অধিক তাকওয়ার কারণ হবে।' এরপর তিনি তার পুত্র আবদুল্লাহকে বললেন, 'আবদুল্লাহ, দেখো, আমার জিম্মায় ঋণের পরিমাণ কত।' হিসাব করে জানানো হলো—ঋণের পরিমাণ ছিয়াশি হাজার দিরহাম বা তার কাছাকাছি।

এরপর তিনি বললেন, 'যদি উমর-পরিবারের অর্থ দিয়েই এই ঋণ আদায় হয়ে যায়, তাহলে তা দিয়েই এ ঋণ পরিশোধ করে দেবে। অন্যথায় আদি বিন কাবের বংশধরদের সাহায্য গ্রহণ করবে। তাতেও না হলে কুরাইশ গোত্রের সাহায্য নেবে। এর বাইরে অন্য কারও সাহায্য নেবে না। আমার পক্ষ থেকে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দেবে। আর তুমি উম্মুল মুমিনিন আয়েশার কাছে যাও। তাকে বলো, উমর আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন। আমিরুল মুমিনিন বলবে না। কারণ, এখন আর আমি মুমিনগণের আমির নই। তাকে বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব তার সঙ্গীদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন।'

এরপর ইবনে উমর আয়েশা রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম করলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। (অনুমতি পাওয়ার পর) ভেতরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন, আয়েশা কাঁদছেন। ইবনে উমর বললেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের পাশে সমাধিস্থ হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন।'

আয়েশা রাযি. বললেন, 'জায়গাটুকু আমি নিজের জন্য কামনা করতাম; কিন্তু আজ আমি এ বিষয়ে তাকে আমার ওপর অগ্রাধিকার দিচ্ছি।'

আবদুল্লাহ বিন উমর যখন ফিরে এলেন, তখন উমর রাযি.-কে বলা হলো, 'এই যে আবদুল্লাহ বিন উমর চলে এসেছেন।' তিনি বললেন, 'আমাকে উঠিয়ে বসাও।' এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসাল। তিনি বললেন, 'বলো, কী সংবাদ নিয়ে এসেছ?' ইবনে উমর বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন! আপনি যা আকাঙ্ক্ষা করেছেন, তা-ই হয়েছে; তিনি অনুমতি দিয়েছেন।' উমর রাযি. বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আর কোনো বিষয় আমার কাছে এরচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমার মৃত্যুর পর তোমরা আমাকে উঠিয়ে নেবে আর তুমি আবার তাকে (আয়েশা রাযি.-কে) সালাম করে বলবে, উমর ইবনুল খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন। (তিনি আশঙ্কা

করছিলেন, এমনও হতে পারে যে, আম্মাজান উমরের জীবদ্দশায় লজ্জা ও সংকোচবশত অনুমতি দিয়েছেন)। তিনি অনুমতি দিলে তোমরা আমাকে প্রবেশ করাবে। আর যদি অনুমতি না দেন, তাহলে আমাকে মুসলমানদের কবরস্থানে নিয়ে যাবে।'

এমন সময় উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাযি. কয়েকজন মহিলাসহ উপস্থিত হলেন। তাদেরকে দেখে আমরা উঠে এলাম। হাফসা তার (পিতার) কাছে গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। কিছুক্ষণ পর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে হাফসা রাযি. ভেতরে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকেও তার কান্নার ধ্বনি শুনতে পেলাম। উপস্থিত লোকেরা খলিফাকে বলল, 'আমিরুল মুমিনিন! অসিয়ত করুন এবং পরবর্তী খলিফা মনোনীত করুন।'

তিনি বললেন, 'আমি খিলাফতের জন্য এই কজনের চাইতে যোগ্যতর কাউকে পাচ্ছি না; এদের প্রতি নবীজি ইন্তেকালের সময় সন্তুষ্ট ছিলেন।' এ কথা বলে তিনি আলি রাযি., উসমান রাযি., যুবায়র রাযি., তালহা রাযি., সাদ রাযি. ও আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি.-এর নাম নিলেন। তিনি বললেন, 'আবদুল্লাহ বিন উমরও তোমাদের সঙ্গে থাকবে; তবে সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। (বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমরের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল শুধু সান্ত্বনা হিসেবে।) যদি খিলাফতের দায়িত্ব সাদের ওপর ন্যস্ত করা হয়, তবে তিনি তো এর যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলিফা নির্ধারিত হয়, তাহলে সে যেন সাদের পরামর্শ গ্রহণ করে। আমি কিন্তু তাকে (কুফার গভর্নরের পদ থেকে) অযোগ্যতা বা কোনো ধরনের বিশ্বাসভঙ্গের কারণে বরখাস্ত করিনি।'

এরপর উমর রাযি. বললেন—আমার পরবর্তী খলিফাকে আমি অসিয়ত করছি, তিনি যেন প্রবীণ মুহাজিরদের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং তাদের মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। আমি তাকে আনসারি সাহাবিগণের প্রতিও সদ্ব্যবহারের অসিয়ত করছি; যারা পূর্ব থেকেই এ নগরীতে বসবাস করছেন এবং মুহাজিরদের পূর্বে ঈমান এনেছেন। তাদের কল্যাণকর্ম যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাদের ত্রুটি যেন মার্জনা করা হয়।

আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, তিনি যেন বিভিন্ন নগরীর অধিবাসীদের সঙ্গে কোমল আচরণ করেন। কারণ, তারাই ইসলামের হেফাজতকারী, অর্থের জোগানদাতা ও শত্রুর চোখের কাঁটা (আধিক্য ও প্রভাবের মাধ্যমে তারা শত্রুদেরকে ক্রোধান্বিত করে)। তাদের কাছ থেকে যেন কেবল তাদের সন্তুষ্টচিত্তে সম্পদের অতিরিক্ত অংশের জাকাত গ্রহণ করা হয়।

আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, তিনি যেন বেদুইনদের সঙ্গেও সদাচরণ করেন। কারণ, তারাই আরবজাতির ভিত্তি ও ইসলামের মূল শক্তি। তাদের সম্পদের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করে যেন তাদের দরিদ্রদের মাঝেই ফেরত দেওয়া হয়। আমি তাকে আরও অসিয়ত করছি, জিম্মিদের সঙ্গে আল্লাহ ও তার রাসুলের কৃত অঙ্গীকার যেন পূরণ করা হয়, (তারা শত্রু-কর্তৃক আক্রান্ত হলে) যেন তাদের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধ করা হয় এবং তাদের ওপর যেন সাধ্যাতীত জিজিয়া আরোপ করা না হয়।

উমরের ইন্তেকাল হলে আমরা তার লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। আবদুল্লাহ বিন উমর আয়েশাকে সালাম করলেন এবং বললেন, 'উমর ইবনুল খাত্তাব অনুমতি চাচ্ছেন।'

আয়েশা বললেন, 'তাকে প্রবেশ করাও।' এরপর তাকে প্রবেশ করানো হলো এবং তার সঙ্গীদ্বয়ের পাশে দাফন করা হলো। দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলো। আবদুর রহমান বিন আওফ বললেন, 'তোমরা বিষয়টি তিনজনের ওপর ছেড়ে দাও (যেন নির্বাচন সহজ হয়ে যায়)।'

যুবায়র বললেন, 'আমি আমার অধিকার আলিকে অর্পণ করলাম।'

তালহা বললেন, 'আমি আমার অধিকার উসমানের কাছে ন্যস্ত করলাম।'

সাদ বললেন, 'আমি আমার অধিকার আবদুর রহমান বিন আওফকে অর্পণ করলাম।'

তখন আবদুর রহমান বিন আওফ উসমান ও আলিকে বললেন, 'আপনাদের দুজনের মধ্য হতে কেউ কি এ দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? তাহলে আমরা অপরজনকে নির্বাচিত করব। তার ওপর আল্লাহ ও ইসলামের হক আদায় করার দায়িত্ব বর্তাবে। অধিকতর যোগ্য

নির্বাচনে উভয়ে চিন্তা করুন।' তখন উভয়ে (উসমান ও আলি) চুপ থাকলেন।

এরপর আবদুর রহমান বললেন, 'আপনারা কি নির্বাচনের দায়িত্বটি আমাকে ন্যস্ত করবেন? আল্লাহর শপথ! যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্ণয়ে আমি সামান্য ত্রুটি করব না।'

উভয়ে সম্মতি জানালে তিনি তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, 'আল্লাহর রাসুলের সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে এবং ইসলামগ্রহণে আপনার যে অগ্রগামিতা রয়েছে, তা আপনি জানেন। আল্লাহর শপথ! আমি যদি আপনাকে খলিফা মনোনীত করি, তাহলে আপনার কর্তব্য হলো, আপনি অবশ্যই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করবেন; আর যদি উসমানকে মনোনীত করি, তাহলে আপনি তার আনুগত্য করবেন।' এরপর তিনি অপরজনের সঙ্গেও একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। উভয়ের কাছ থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার পর তিনি বললেন, 'হে উসমান, আপনার হাত বাড়িয়ে দিন।' এরপর প্রথমে তিনি ও তারপর আলি রাযি. উসমান রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করলেন। এরপর সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করল।[১৩২]

অন্যান্য বিভিন্ন বর্ণনায় আছে, খলিফা উমর রাযি. পরবর্তী খলিফা নির্বাচনের জন্য পরামর্শ করতে তিন দিনের বেশি সময় না নেওয়ার কথা বলে দিয়েছিলেন। আবদুর রহমান বিন আওফ রাযি. সেই তিন দিন ঘুরে ঘুরে সাহাবায়ে কেরাম ও মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত নিয়েছিলেন। তিনি যাদের কাছেই গিয়েছেন, সকলেই উসমানের নাম প্রস্তাব করেছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. ২৩ হিজরি সনের ২৬ জিলহজ (৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দের ৩ নভেম্বর) তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। হজরত সুহায়ব রাযি. তার জানাজা পড়ান। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবীজির পাশেই তাকে দাফন করা হয়।

* * *

---

১৩২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৭০০।

হজরত উসমান রাযি.-এর খিলাফত

[জিলহজ ২৩ হিজরি—জিলহজ ৩৫ হিজরি]
[নভেম্বর ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ—জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ]

তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর বংশপরিচয়

হজরত উসমান রাযি. হস্তিবাহিনীর ঘটনার ছয় বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তার উপনাম আবু আমর, উপাধি জুননুরাইন। পিতার দিক থেকে তার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ—

> উসমান বিন আফফান বিন আবুল আস বিন উমাইয়া বিন আবদে শামস বিন আবদে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব ...।

কুসাই পর্যন্ত এসে তার বংশপরম্পরা নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশপরম্পরার সঙ্গে মিলে গেছে।

উসমান রাযি. অগ্রবর্তী ইসলামগ্রহণকারীদের একজন। তিনি হাবশা ও মদিনা—উভয় হিজরতে শরিক ছিলেন।

উসমান রাযি.-এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য

- উসমান রাযি. প্রথমে নবী-কন্যা রুকাইয়া রাযি.-কে বিয়ে করেন। বদর যুদ্ধের সময় রুকাইয়া রাযি. ইন্তেকাল করলে পরবর্তী সময়ে নবীজি তার কাছে আরেক কন্যা উম্মে কুলসুম রাযি.-কে বিয়ে দেন। উম্মে কুলসুম রাযি. নবম হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। উসমান রাযি. আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

❖ ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে হজরত আনাস রাযি.-এর সূত্রে উল্লেখ করেন—নবীজি একদিন আবু বকর, উমর ও উসমানকে সঙ্গে নিয়ে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করলেন। (তাদেরকে পেয়ে আনন্দে) পাহাড়টি কেঁপে উঠল। নবীজি বললেন, হে উহুদ, শান্ত হও (আনাস রাযি. বলেন, আমার মনে হয়—নবীজি এ কথা বলার সময় পা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে আঘাত করেছেন); তোমার ওপর তো একজন নবী, একজন সিদ্দিক ও দুজন শহিদ আছেন।[১৩৩]

❖ ইমাম বুখারি রহ. হজরত আবু মুসা আশআরি রাযি.-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন—নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি (প্রাচীরবেষ্টিত) বাগানে প্রবেশ করলেন এবং আমাকে বাগানের প্রাচীরদ্বারে পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক ব্যক্তি এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবীজি বললেন, 'তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' আমি (দরজা খুলে) দেখলাম, তিনি আবু বকর। এরপর আরেকজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবীজি বললেন, 'তাকে অনুমতি দাও এবং জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' আমি (দরজা খুলে) দেখলাম যে, তিনি উমর। তারপর আরেকজন এসে প্রবেশের অনুমতি চাইল। নবীজি অল্প কিছুক্ষণ চুপ থেকে তারপর বললেন, 'তাকেও প্রবেশের অনুমতি দাও এবং অচিরেই তার ওপর আরোপিত এক বিপদের আগমনের সঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদ দাও।' আমি (দরজা খুলে) দেখলাম, তিনি উসমান।[১৩৪]

❖ ইমাম মুসলিম রহ. আপন সনদে আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলেন—রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে শোয়া ছিলেন; তখন তার উরু বা পায়ের গোছা উন্মুক্ত ছিল। আবু বকর এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে ওই অবস্থায়ই তিনি প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। এরপর উমর এসে অনুমতি চাইলে তাকেও ওই অবস্থায়ই প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং কথাবার্তা বললেন। এরপর উসমান অনুমতি চাইলেন। নবীজি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন। উসমান

---

১৩৩. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৯৯।

কথাবার্তা বলে চলে যাওয়ার পর আয়েশা বললেন, 'আবু বকর এলেন; আপনি পরিবর্তিত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। এরপর উমর এলেন; তখনও আপনি পরিবর্তিত হলেন না এবং বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। উসমান আসতেই আপনি উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক করলেন!' নবীজি বললেন, 'আমি কি এমন ব্যক্তির উপস্থিতিতে লজ্জা করব না, ফিরেশতারা যাকে লজ্জা করে থাকেন?'[১৩৫]

❖ হজরত উসমান রাযি. নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একশ ছেচল্লিশটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

দায়িত্বগ্রহণের পর খলিফা উসমান রাযি.-এর প্রথম ভাষণ

উসমান রাযি. তার খিলাফতকাল শুরু করেন মুসলমানদের উদ্দেশে প্রদত্ত এক ভাষণের মাধ্যমে। হামদ ও ছানার পর তিনি বলেন,

লোকসকল, নিঃসন্দেহে প্রতিটি আরোহণের সূচনা কঠিন হয়ে থাকে। আজকের পর আরও দিন আছে। আমি যদি বেঁচে থাকি, তাহলে তোমাদের সামনে যথাযথভাবে আরও ভাষণ আসবে। আমি তো বাগ্মী নই (তিনি স্বভাববক্তা ছিলেন না); শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা আমাকে তা শিখিয়ে দেবেন। আর একজন বাগ্মী শাসকের তুলনায় একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক তোমাদের বেশি প্রয়োজন।

দায়িত্বগ্রহণের পর খলিফা উসমান রাযি. চারটি পত্র লেখেন। প্রথমটি গভর্নরদের উদ্দেশে, দ্বিতীয়টি খারাজ-সদকা উসুলকারীদের উদ্দেশে, তৃতীয়টি সাধারণ জনগণের উদ্দেশে এবং চতুর্থটি যুদ্ধরত বিভিন্ন বাহিনীর সেনাপতিদের উদ্দেশে। প্রতিটি পত্রে তিনি তার স্বরাষ্ট্রনীতি ও প্রশাসননীতি সুনির্ধারিতভাবে উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দেন যে, হক ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তিনি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পূর্ববর্তী খলিফাদ্বয়ের অনুসৃত পথেই চলবেন।

উসমান রাযি. তার পূর্বসূরি উমর রাযি.-এর ন্যায় কঠোর ছিলেন না। আর এতে আপত্তিরও কিছু নেই। প্রত্যেকেরই আছে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও নীতি।

---

[১৩৫]. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ২৪০১।

খলিফা উসমান রাযি.-এর দস্তরখানে পরিবেশিত হতো কচি মেষশাবকের গোশত ও চালনি দিয়ে ছাঁকা সাদা ময়দার রুটি। তাকে যখন বলা হয়, (আপনার পূর্বতন খলিফা) উমর তো শুধু বয়স্ক মেষের গোশতই খেতেন, তখন তিনি উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা উমরের প্রতি রহম করুন; উমরের মতো সংযম ও সহন-ক্ষমতা কার আছে?'

খলিফা হওয়ার পর উসমান রাযি. জনসাধারণের জীবনধারায় ব্যাপকতা আনতে সচেষ্ট হন। আর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও অন্যান্য সম্পদের প্রাচুর্যের বিবেচনায় এটিই ছিল স্বাভাবিক বিষয়।

ইমাম বুখারি রহ. তার ইতিহাসগ্রন্থে হজরত হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—

> মানুষ যেসব বিষয়ে উসমানকে অভিযুক্ত করে; তা আমার জানা আছে। আরে! জনসাধারণের অবস্থা তো এই ছিল যে, তারা সম্পদ-প্রাচুর্যে ডুবে ছিল। প্রায়ই ঘোষণা করা হতো—হে মুসলমানগণ, প্রত্যুষে তোমরা তোমাদের ভাতা ও অনুদান নিয়ে যাও। সকলে তা পরিপূর্ণ নিয়ে নিত। একটু পরেই ঘোষণা করা হতো—তোমাদের জীবিকানির্বাহের জিনিসপত্র নিয়ে যাও। মানুষ তা-ও পরিপূর্ণ নিয়ে নিত। এরপর বলা হতো—ঘি ও মধু নিয়ে যাও। মোটকথা দান-অনুদান ছিল অবারিত, রুজি ও জীবিকা ছিল বহমান আর শত্রুরা ছিল আত্মরক্ষার চিন্তায় হয়রান। মুসলমানদের পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। কল্যাণ ও কল্যাণকামিতার প্রাচুর্য ছিল। মুমিন মুমিনের সাক্ষাতে সন্ত্রস্ত হতো না; বরং পরিচয়ে একে অপরের ভাইয়ে পরিণত হতো। হৃদ্যতা ও ভালোবাসার দাবিতেই এই নসিহত করা হতো যে, অচিরেই হয়তো তোমরা স্বার্থপরতা দেখবে। এরূপ দেখলে তোমরা অবশ্যই ধৈর্য অবলম্বন করবে।
>
> বাস্তবেই সেই পরিস্থিতি যখন এসে গেল, তখন মানুষ যদি ধৈর্যধারণ করত, তাহলে দান-অনুদানের ধারা আরও ব্যাপক ও অবারিত হতো। কিন্তু মানুষ শপথ করে বলা শুরু করল, আমরা ধৈর্য ধরতে রাজি নই। আর তাই আল্লাহর শপথ! তারা দান-অনুদান সবই হারাল, আরও হারাল শান্তি ও নিরাপত্তা। এতদিন

> নিজেদের মধ্যে তরবারি ছিল কোষবদ্ধ। এখন সেই তরবারি উন্মুক্ত হয়ে গেছে। আল্লাহর শপথ! কিয়ামত পর্যন্ত এই তরবারি আর কোষবদ্ধ হবে না।

মূল আলোচনায় ফিরে আসি। খলিফা উমরের নিহত হওয়ার সংবাদ জানামাত্র রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যে আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। পারস্যের যেসব অঞ্চল মুসলিম বাহিনী জয় করেছিল, অধিকাংশ অঞ্চলে চুক্তিভঙ্গ পূর্বক বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে। ওদিকে রোমান শক্তি তাদের অধিকৃত অঞ্চল থেকে মুসলিম বাহিনীকে বিতাড়িত করার চেষ্টা চালায়। তারা শামে হামলা চালায়, মিশর পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করে। দায়িত্ব গ্রহণ করেই খলিফা উসমান এমন এক কঠিন দুর্যোগ-পরীক্ষার সম্মুখীন হন, যাকে তুলনা করা যেতে পারে প্রথম খলিফা আবু বকর রাযি.-এর আমলের ধর্মত্যাগ-ফিতনার সঙ্গে। কিন্তু উসমান রাযি. বিচক্ষণতার সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট হন। পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যে অবস্থানরত মুসলিম অভিযাত্রীগণ শত্রুদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়। মুসলমানরা পুনরায় পারস্যের প্রদেশগুলোতে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। তারা সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি প্রতিশোধমূলক আচরণের পরিবর্তে উদার দৃষ্টিতে সবকিছু উপেক্ষা করে। ফলে এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা পুনরায় ইসলামি রাষ্ট্রের অধীনে নিরাপদে-নিশ্চিন্তে বসবাস করতে শুরু করে। পাশাপাশি মুসলিম বাহিনী রোমান বাহিনীকে পরাজিত করে শামের অধিকৃত অঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

প্রথম ইসলামি নৌবহর প্রতিষ্ঠা

(২৮ হিজরি/৬৪৮ খ্রিষ্টাব্দ)

খলিফা উসমান রাযি.-এর আমলে শামে নিযুক্ত গভর্নর বিশিষ্ট সাহাবি মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. মুসলমানদের জন্য প্রথম নৌবহর প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তিনি ইতিপূর্বে দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযি.-এর কাছেও নৌবহরের পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন; কিন্তু খলিফা উমর মুসলমানদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তিনি খলিফা উসমান রাযি.-এর কাছে একই পরিকল্পনা তুলে ধরেন এবং বারবার তাকে এ বিষয়ে অনুরোধ জানান। অবশেষে ২৮ হিজরিতে খলিফা উসমান রাযি. পরিকল্পনায় সম্মতি দান করেন। নবগঠিত নৌবহর

নিয়ে মুয়াবিয়া রাযি. সমুদ্র পাড়ি দিয়ে সাইপ্রাসে অভিযান পরিচালনা করেন। পরাজিত সাইপ্রাসবাসী মুসলমানদের জিজিয়া প্রদানের শর্তে সন্ধিচুক্তি করে। এ অভিযানে বিশিষ্ট সাহাবি উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর সহধর্মিণী উম্মে হারাম রাযি.-ও অংশগ্রহণ করেন। ফলে নবীজির সেই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত হয় যে, উম্মে হারাম সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনাকারী প্রথম মুসলিম বাহিনীর সদস্য হবেন। উম্মে হারাম রাযি. সাইপ্রাস-অভিযানেই ইন্তেকাল করেন।

সাইপ্রাস বিজয়

ইমাম বুখারি রহ. বুখারি শরিফের জিহাদ অধ্যায়ে হজরত আনাস রাযি.-সূত্রে বর্ণনা করেন—

নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মে হারাম রাযি.-এর ঘরে দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমান। এরপর নবীজি হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় জাগ্রত হন। উম্মে হারাম হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে নবীজি উত্তর দেন, তিনি স্বপ্নে তার উম্মতের একটি দলকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত অবস্থায় দেখেছেন। বাদশা যেভাবে আপন সিংহাসনে আরোহণ করে, তারা সেভাবে সমুদ্রে আরোহী ছিল। এরপর রেখে ঘুমিয়ে পড়েন এবং (কিছুক্ষণ পর) জেগে ওঠেন। এবারও তিনি প্রথমবারের মতো স্বপ্ন দেখেন। উম্মে হারাম নবীজিকে বলেন, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, যেন তিনি আমাকে উক্ত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করেন। নবীজি বলেন, তুমি তো প্রথম দলের মধ্যে আছ। (অর্থাৎ প্রথম যে বাহিনী সমুদ্রপথে অভিযান পরিচালনা করবে, তুমি সে বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হবে।)[১৩৬]

খলিফা উসমান রাযি.-এর খিলাফতকালে মুয়াবিয়া রাযি.-এর নেতৃত্বাধীন সাইপ্রাস-অভিযানে অংশগ্রহণকারী নৌবাহিনীই ছিল সেই প্রতিশ্রুত বাহিনী। মুয়াবিয়া রাযি. ২৮ হিজরিতে সাইপ্রাস জয় করেন। এই অভিযানে উম্মে হারাম রাযি. তার স্বামী উবাদা বিন ছামিত রাযি.-এর সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং (অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গিয়ে) শাহাদাত বরণ করেন। তার কবর আজও সাইপ্রাসে আছে।

---

১৩৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ২৭৮৮।

ঐতিহাসিক ইবনে কাছির রহ. বলেন,

> (নবীজির স্বপ্নে দেখা) দ্বিতীয় বাহিনীর সেনাপতি ছিলেন ইয়াযিদ বিন মুয়াবিয়া। তিনি নৌপথে কনস্টান্টিনোপলে অভিযান পরিচালনা করেন। উক্ত অভিযানে উম্মে হারাম রাযি. শরিক হতে পারেননি। ...এটি নবুওয়তের সত্যতার অন্যতম মহান দলিল।[১৩৭]

৩১ হিজরিতে (৬৫১ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিম বাহিনী আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ[১৩৮]-এর নেতৃত্বে বর্তমান সুদানের অন্তর্ভুক্ত নুবিয়া অঞ্চল জয় করে। এটি ছিল সে যুগের অন্যতম কঠিন অভিযান। অভিযানে মুসলিম বাহিনী এমন এক অভিনব আক্রমণের মুখোমুখি হয়, যা মোকাবিলা করে তারা অভ্যস্ত ছিল না। প্রতিপক্ষের সৈন্যরা মুসলিম সৈন্যদের চোখ লক্ষ্য করে অনবরত তির নিক্ষেপ করতে থাকে। এর ফলে যুদ্ধের সূচনাতেই মুসলিম বাহিনীর একশ পঞ্চাশজন সৈন্য দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে।

আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ নুবিয়াবাসীর সঙ্গে 'বাকত-চুক্তি' নামক একটি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা প্রায় ছয়শ বছর কার্যকর ছিল। চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল— (মুসলিম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত) মিশরের সঙ্গে নুবিয়া পরস্পর রাজস্ব বিনিময় করবে এবং উভয়ের মাঝে সব ধরনের সংঘাত-যুদ্ধ বন্ধ থাকবে।

ততদিনে নবগঠিত মুসলিম নৌবাহিনী (গ্রিসের) রোডস (Rhodes) হতে (লিবিয়ার) বারকা[১৩৯] পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরের সুবিস্তৃত উপকূলীয় অঞ্চলে

---

১৩৭. ইবনে কাছির দিমাশকি, *আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া*, ৮/২২২।

১৩৮. আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ ইসলামগ্রহণ করেন হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে। এরপর মুরতাদ হয়ে গেলেও মক্কাবিজয়ের পর তিনি পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত হন এবং ইসলামের নিবেদিতপ্রাণ সৈনিকে পরিণত হন। তিনি দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, নামাজকেই আমার জীবনের শেষ আমল বানিয়ে দিয়ো।' ভোরে ফজর নামাজ পড়া অবস্থায় দুই সালামের মাঝে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমরা তার জীবনীর সামান্য অংশ এজন্য উল্লেখ করলাম যে, হজরত উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তার মধ্যে একটি হলো, এই তাওবাকারী সাহাবিকে তিনি মিশরের গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। [মূল গ্রন্থের টীকা]
এ তথ্যটিও এখানে প্রাসঙ্গিক যে, উসমান রাযি.-এর পূর্বেই দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ রাযি.-কে মিশরের একটি অঞ্চলের (সাইদে মিশর) প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন।

১৩৯. বারকা : বর্তমান লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটি ঐতিহাসিক অঞ্চলকে বারকা বলা হতো। ইংরেজিতে অঞ্চলটির নাম Cyrenaica।

নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং রোমান উপকূলীয় অঞ্চলেও হুমকি হয়ে দাঁড়াতে শুরু করেছে। ফলে রোমান শক্তি উপলব্ধি করে যে, নবীন মুসলিম নৌবাহিনীকে এখনই ধ্বংস করতে না পারলে পরিণতি মোটেও ভালো হবে না। তাই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের পুত্র তৃতীয় কনস্টান্টাইন (Constantine III) মুসলিম নৌবাহিনীকে চরম শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক হাজার নৌযান নিয়ে অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেন। এটি ৩৫ হিজরি সনের (৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দের) কথা।

রোমান নৌবহরের মোকাবিলা করতে মুসলিম বাহিনীর শাম-নৌবহর বুছর বিন আরতাত-এর নেতৃত্বে এবং মিশরীয় নৌবহর আবদুল্লাহ বিন আবুস সার্হ-এর নেতৃত্বে রওনা হয়। সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব অর্পিত হয় বুছর রাযি.-এর এর কাঁধে। মুসলিম বাহিনীর নৌযানের সংখ্যা ছিল দুইশ।

এ যুদ্ধের নাম যাতুস সাওয়ারির যুদ্ধ (Battle of the Masts)। যদ্দূর মনে হয়, আলেকজান্দ্রিয়ার পশ্চিমে মারসা-মাতরুহ (Mersa Matruh) নগরীর কাছে একটি নৌবন্দরের সন্নিকটে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

মুসলিম বাহিনী প্রথমে কৌশলে রোমান বাহিনীকে স্থলযুদ্ধে টেনে আনার চেষ্টা চালায়। কিন্তু রোমান বাহিনী সমুদ্রেই মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলায় অটল থাকে। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর নেতৃবৃন্দকে নৌযুদ্ধকে স্থলযুদ্ধে রূপান্তর করার পথনির্দেশ দান করেন। আবদুল্লাহ বিন আবু সারহ তার সৈন্যদের নির্দেশ দেন—তারা যেন শত্রুযানগুলোর কাছে চলে যায়। সেনাপতির নির্দেশে তারা তাদের নৌযানগুলো নিয়ে এত কাছে চলে যায় যে, উভয় পক্ষের নৌযানগুলো পরস্পর গা ছুঁয়ে যাচ্ছিল। তখন একদল মুসলিম সৈন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পানিতে নেমে মজবুত রশি দিয়ে রোমান জাহাজগুলোর সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর জাহাজগুলো বেঁধে ফেলে। ফলে সমুদ্রবক্ষে বিদ্যমান বারোশ জাহাজ প্রতি দশ-বিশটি একটি অপরটির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। যেন সমুদ্রবুকে একখণ্ড মাটি, যেখানে সংঘটিত হচ্ছে প্রাণপণ লড়াই!

মুসলিম বাহিনী আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় অসাধারণ দৃঢ়তা ও অবিচলতার পরিচয় দেয়। এমন প্রচণ্ড ও দীর্ঘ লড়াই হয় যে, ঐতিহাসিক তাবারি রহ. লিখেছেন, এ যুদ্ধে (হতাহতদের রক্তে) পানি রক্তবর্ণ ধারণ করেছিল। অবশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীকে বিজয় দান

করেন। কনস্টান্টাইন পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। এই বিজয়ের ফলে ভূমধ্যসাগরে (রোম সাগরে) মুসলিম বাহিনীর কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় হয়।

পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সংকলন

(৩৩ হিজরি/৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দ)

ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে ইবনে শিহাব জুহরি রহ. হতে বর্ণনা করেন যে, হজরত আনাস বিন মালিক রাযি. তাকে বলেন—

> হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাযি. (খলিফা) উসমানের কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান বিজয়ের জন্য শাম-বাহিনী ও ইরাক-বাহিনীর রণ-প্রস্তুতির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কুরআন পাঠে বিভিন্নজনদের মতবিরোধের কারণে হুযায়ফা খুব চিন্তিত হন।
>
> তিনি উসমানকে বললেন, আমিরুল মুমিনিন! ইহুদি-নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাব নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে যাওয়ার পূর্বেই এই উম্মতকে রক্ষা করুন। তখন উসমান রাযি. উম্মুল মুমিনিন হাফসা রাযি.-এর কাছে এই বার্তা পাঠালেন যে, (আপনার কাছে সংরক্ষিত হজরত আবু বকর রাযি.-এর আমলে সংকলিত) সহিফাগুলো আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন; আমরা তা কয়েকটি কপি করে নিয়ে মূল কপি আপনার কাছে ফেরত পাঠাব। হাফসা রাযি. সহিফাগুলো খলিফার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর খলিফা যায়দ বিন ছাবিত, আবদুল্লাহ বিন যুবায়র, সাইদ ইবনুল আস ও আবদুর রহমান বিন হিশামকে নির্দেশ দিলে তারা বিভিন্ন মাসহাফে তা কপি করলেন।
>
> উসমান রাযি. তিন কুরাইশি সদস্যকে বললেন, কুরআনের কোনো বিষয়ে যদি যায়দ বিন ছাবিতের সঙ্গে তোমাদের মতপার্থক্য হয়, তাহলে তা কুরাইশদের ভাষায় লিখবে। কারণ, কুরআন কুরাইশদের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তা-ই করলেন। যখন তারা মূল লিপিটিকে কয়েকটি কপিতে লিপিবদ্ধ করলেন, তখন উসমান রাযি. মূল লিপি হাফসা রাযি.-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তিনি লিপিবদ্ধ কপিগুলোর এক-একটি ইসলামি সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন এবং

> এগুলো ব্যতীত বিভিন্নজনের কাছে সংরক্ষিত একত্র বা বিচ্ছিন্ন কুরআনের যেসব লিপি রয়েছে, তা পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।[১৪০]

ইমাম বুখারি রহ.-এর উল্লিখিত বর্ণনা হতে এই উসমানি সংকলনের কয়েকটি কারণ নির্ণয় করা যায়। যথা—

> “ অব্যাহত বিজয়াভিযান ও প্রচুর সংখ্যক অনারবের ইসলামগ্রহণ। উমর রাযি. অল্পসংখ্যক সাহাবি ব্যতীত অধিকাংশকেই মক্কা-মদিনা ছাড়া থেকে নিবৃত্ত রেখেছিলেন। তিনি রাষ্ট্রপরিচালনায় তাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ফলে সেসব অঞ্চলের লোকেরা কুরআনের পাঠ নিয়ে মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ে এবং ইসলামি সাম্রাজ্যে নতুন এক ফিতনার অভ্যুদয়ের উপক্রম হয়।

> “ উসমান রাযি. চেয়েছিলেন, সাত কেরাতের মধ্য হতে নির্দিষ্ট এক কেরাতে কুরআন লিপিবদ্ধ হোক। আর তাই তিনি কুরআন যে কেরাতে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই কুরাইশ গোত্রের কেরাতেই লিপিবদ্ধ করান। উল্লেখ্য, অন্যান্য কেরাতে কুরআন পাঠের অনুমতি ছিল সাময়িক; উদ্দেশ্য ছিল যেন এ সময়ের মধ্যে সকলে কুরাইশি কেরাতে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

এর একটি দৃষ্টান্ত হলো—কুরআন সংকলনের সময় সংকলনকমিটি সুরা বাকারার ২৪৮ নং আয়াতের التابوت শব্দটির লিখনরীতি নিয়ে মতানৈক্য করে। যায়দ বিন ছাবিত বলেন, التابوة লেখা হবে, আর কুরাইশি তিনজন বলেন, التابوت লেখা হবে। তারা বিষয়টি খলিফার কাছে উপস্থাপন করলে তিনি التابوت লিখতে নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘কুরআন তো কুরাইশদের ভাষায়ই অবতীর্ণ হয়েছে।’

নিঃসন্দেহে খলিফা উসমান রাযি.-এর গৃহীত এ পদক্ষেপকে তার খিলাফতআমলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্ম-অবদানরূপে বিবেচনা করা

---

১৪০. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪৯৮৭।

যেতে পারে। বিদ্যমান সকল সাহাবায়ে কেরাম খলিফার এই পদক্ষেপকে সাদরে গ্রহণ করে নেন।

হজরত আলি রাযি. বলেন, 'লোকসকল, আল্লাহকে ভয় করো। উসমানের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন হতে বিরত থাক। তোমরা বলছ যে, তিনি কুরআন জ্বালিয়ে দিয়েছেন। শোনো, আল্লাহর শপথ! তিনি কুরআন জ্বালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদের (সাহাবায়ে কেরামের) সম্মতিতেই।'

ইসলাম ও মুসলমানদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও উন্নতির কারণে বিদ্বেষ ও ক্রোধের অনল যাদের বুকে দাউ দাউ করে জ্বলছিল এবং কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছিল না, তারা তো পূর্ব থেকেই ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে আসছিল। স্বাভাবিকভাবেই তারা একে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এবং একে কেন্দ্র করে মুসলিম জাহানে ফিতনা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চালায়। ভয়াবহ সেই চক্রান্তের কিছু বিবরণ আমরা সামনে পাঠ করব।

ফিতনার প্রাথমিক আত্মপ্রকাশ

(৩৪ হিজরি/৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দ)

এই ফিতনার আগুন প্রথমে প্রজ্বলিত করে সানআ অঞ্চলের আবদুল্লাহ বিন সাবা নামক জনৈক ইহুদি। ইতিহাসে সে 'ইবনুস সাওদা' নামেও প্রসিদ্ধ। উসমান রাযি.-এর খিলাফত আমলে নিজেকে সে মুসলমান দাবি করে এবং একজন জ্ঞানী-আলিম হিসেবে পরিচয় দেয়। প্রথমদিকে সে গ্রাম ও মরু-অঞ্চলের অধিবাসীসহ শহরাঞ্চলের যেসব মানুষ নতুন ইসলামগ্রহণ করেছে, তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয়।

সে মানুষকে প্রশ্ন করত—'এটা কি প্রমাণিত নয় যে, ঈসা বিন মরিয়ম এই পৃথিবীতে পুনরায় আগমন করবেন?' উত্তরে স্বাভাবিকভাবেই 'হ্যাঁ' বলা হলে সে পুনরায় প্রশ্ন করত, 'রাসুলুল্লাহ তো তার চেয়েও মর্যাদাশীল। তাহলে তার এ পৃথিবীতে পুনরাগমনের বিষয়কে তুমি কীভাবে অস্বীকার করতে পার?!' এরপর সে বলত, 'নবীজি আলি বিন আবু তালিবকে অসিয়ত করেছেন। মুহাম্মাদ হলেন আখেরি নবী আর আলি হলেন আখেরি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সুতরাং উসমানের তুলনায় আলিই খিলাফতের দায়িত্বলাভের অধিক হকদার।'

এরপর আবদুল্লাহ বিন সাবা মিশরে চলে যায় এবং সেখানকার অধিবাসীদের অনেককেই তার আন্দোলনের প্রতি অনুরাগী করে তুলতে

সক্ষম হয়। তার অনুসারীরা কুফা ও বসরার জনসাধারণের কাছে পত্র পাঠিয়ে তাদেরকেও খিলাফতের বিরুদ্ধে খ্যাপিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। তারাও পত্রবিনিময়ের মাধ্যমে আন্দোলনে যুক্ত হয়। এসব অঞ্চলে যেসব লোক নিজেদের বিভিন্ন স্বার্থহানির কারণে খলিফা-কর্তৃক নিযুক্ত গভর্নরদের প্রতি বিক্ষুব্ধ ছিল, তারাও ইবনে সাবার পক্ষে যোগ দেয়।

ইবনে সাবা খলিফা উসমানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন শুরু করে। নিকটাত্মীয়দের গভর্নর-পদে নিয়োগদান, কুরআন পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশদানসহ এমন আরও অনেক জঘন্য অভিযোগ সে উত্থাপন করে, যার অসারতা সম্পর্কে জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইমাম বুখারি রহ. বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইমাম বুখারি রহ. উসমান বিন মাওহিব-এর সূত্রে বর্ণনা করেন—

> মিশরীয় জনৈক ব্যক্তি মক্কায় এসে হজ সম্পাদন করল। এরপর সে কয়েকজন ব্যক্তিকে বসা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, এরা কারা? তাকে জানানো হলো, এরা কুরাইশ গোত্রের লোক। সে জিজ্ঞেস করল, তাদের মাঝে উপবিষ্ট ওই শায়খ কে? লোকেরা বলল, তিনি আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.। এরপর সে ইবনে উমর রাযি.-এর কাছে গিয়ে বলল, ইবনে উমর, আমি আপনাকে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনি আমাকে উত্তর দিন। আপনি কি জানেন যে, উসমান উহুদ যুদ্ধের দিন পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিলেন? ইবনে উমর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। সে প্রশ্ন করল, আপনি কি জানেন যে, তিনি বদর-যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন, অংশগ্রহণ করেননি? ইবনে উমর উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। লোকটি এরপর প্রশ্ন করল, আপনি কি জানেন যে, তিনি বায়আতে রিজওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন, অংশগ্রহণ করেননি? ইবনে উমর এবারও উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন লোকটি বলল, আল্লাহু আকবার!
>
> এবার ইবনে উমর বললেন, এসো, আমি তোমাকে বিষয়গুলো বুঝিয়ে বলছি। উহুদ যুদ্ধের দিন তার পৃষ্ঠপ্রদর্শনের বিষয়ে কথা হলো—আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মার্জনা ও

ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১৪১] আর বদর যুদ্ধে তার অনুপস্থিতির কারণ হলো, নবীকন্যা (রুকাইয়া) তার স্ত্রী ছিলেন এবং তিনি অসুস্থ ছিলেন। তখন নবীজি তাকে বলেছিলেন, বদর-যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করছে, তুমি তাদের সমপরিমাণ সাওয়াব ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভ করবে। আর বায়আতে রিজওয়ানে তার অনুপস্থিতি সম্পর্কে কথা হলো—যদি উসমানের চেয়ে সম্ভ্রান্ত কেউ মক্কার বুকে থাকত, তাহলে নবীজি উসমানের পরিবর্তে তাকেই প্রেরণ করতেন। তাই নবীজি উসমানকেই মক্কায় পাঠান আর বায়আতে রিজওয়ান উসমান মক্কায় যাওয়ার পর অনুষ্ঠিত হয়। তখন নবীজি তার ডান হাতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, এটি উসমানের হাত। এরপর সে হাতটি অপর হাতে রেখে বলেন, এটি উসমানের বায়আত। এরপর ইবনে উমর মিশরীয় লোকটিকে বলেন, এখন এই উত্তরগুলো তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও।[১৪২]

ধীরে ধীরে ইবনুস সাওদার পক্ষে বড় একটি অনুসারী-দল তৈরি হয়ে যায়। বিষয়টি খলিফা উসমান রাযি.-এর কর্ণগোচর হলে তিনি ৩৪ হিজরি সনের হজের মৌসুমে (৬৫৫ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে) বিভিন্ন অঞ্চলের গভর্নরদের সমবেত করেন এবং এ ফিতনার বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে তাদের পরামর্শ জানতে চান। অধিকাংশ গভর্নরের পরামর্শ ছিল—বিদ্রোহীদের উপকূলীয় এলাকায় নির্বাসিত করা হোক এবং তাদের রাষ্ট্রীয় ভাতা বন্ধ রাখা হোক। কিন্তু খলিফা তাদের সঙ্গে কোমল আচরণের এবং তাদের মনস্তুষ্টির মত প্রদান করেন। অবশেষে সকলে তাতে সম্মতি জানায়। কিন্তু এর দ্বারা কার্যকর কোনো পরিবর্তন হয়নি; বরং বিদ্রোহীরা ফিতনা ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় অটল থাকে।

ফিতনার আহ্বায়কদের একটি দল ৩৫ হিজরিতে উমরাকারী সেজে মিশর থেকে হিজাযে আগমন করে। প্রকৃতপক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মক্কা-মদিনার পবিত্র ভূমিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। খলিফার সঙ্গে তারা বিতর্কে

---

১৪১. আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতে উহুদ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারীদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ক্ষমার কথা ঘোষণা করেছেন।

১৪২. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৩৬৯৮।

জড়িয়ে পড়ে। খলিফা তাদের প্রতিটি অভিযোগের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করে তাদেরকে নিরুত্তর করে দেন। ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে দেশে ফিরে যায়।

চিন্তাভাবনা ও যাচাইবাছাই ছাড়াই তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে খলিফা উসমান রাযি.-কে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ-অভিযোগ প্রচার হতে থাকে। খলিফার দয়াসুলভ আচরণ ও স্বভাব-কোমলতাই মূলত যথাযথ মর্যাদাদানের পরিবর্তে খলিফার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে এসব বিদ্রোহীদেরকে দুঃসাহস জোগাচ্ছিল। উসমান রাযি.-এর যেসব কর্মতৎপরতাকে কেন্দ্র করে অভিযোগ আনা হচ্ছিল, দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাযি. যদি সেসব কাজ করতেন (বরং বাস্তব সত্য হলো— খলিফা উমর আরও বড় বড় কাজও করেছেন), তখন কেউ উমরের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উত্থাপনের দুঃসাহস দেখাত না। আমাদের এই মন্তব্যের যথার্থতা উপলব্ধি করতে ইমাম বুখারি বর্ণিত নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি পাঠ করুন।

ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে উবায়দুল্লাহ বিন আদি বিন খিয়ার হতে বর্ণনা করেন—

> মিসওয়ার বিন মিখরামা ও আবদুর রহমান বিন আসওয়াদ বিন ইয়াগুছ[১৪৩] আমাকে বললেন, 'আপনি উসমানের সঙ্গে তার ভাই ওয়ালিদের[১৪৪] বিষয়ে কথা বলছেন না কেন? মানুষ তো এ বিষয়ে প্রচুর সমালোচনা করছে।'

---

১৪৩. তারা দুজন ও বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ বিন আদি বিন খিয়ার—তিনজনই ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠতম আলিম ও ফকিহদের অন্তর্ভুক্ত।

১৪৪. ওয়ালিদ বিন উকবা রাযি. ছিলেন উসমান রাযি.-এর বৈপিত্রেয় ভাই। পূর্বতন খলিফা উমর রাযি.-এর অসিয়ত অনুযায়ী উসমান রাযি. তাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ওয়ালিদ বিন উকবা ছিলেন একজন বিশিষ্ট মুজাহিদ সাহাবি। প্রথম খলিফা আবু বকর রাযি. তাকে বিভিন্ন অভিযানে প্রেরণ করেছেন, দ্বিতীয় খলিফা উমর রাযি. তাকে গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা খলিফা উসমানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগও তোলে যে, তিনি আত্মীয়তার সম্পর্কের কারণে ওয়ালিদকে গভর্নর বানিয়েছেন! বিদ্রোহীরা ওয়ালিদের বিরুদ্ধে মদপানের বানোয়াট অভিযোগ আনে। ওয়ালিদের প্রতি বিদ্বেষী দুজন ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে মদপানের সাক্ষ্যও প্রদান করে। বিষয়টি খলিফা উসমানকে জানানো হলে এবং ওয়ালিদ রাযি.-কে কুফা থেকে নিয়ে আসা হলে তিনি খলিফার সামনে শপথ করে অভিযোগ অস্বীকার করেন এবং প্রকৃত বাস্তবতা তুলে ধরেন। তখন উসমান রাযি. বলেন,=

উবায়দুল্লাহ বলেন, তখন আমি খলিফার কাছে গমনের মনস্থ করলাম। তিনি যখন নামাজের উদ্দেশে বের হলেন, আমি কাছে গিয়ে বললাম, 'আপনার কাছে আমার একটি প্রয়োজন আছে আর তা আপনার জন্য কল্যাণকর।' উসমান বললেন, 'আমি আল্লাহর কাছে তোমার থেকে পানাহ চাচ্ছি।' আমি সেখান থেকে তাদের দুজনের কাছে ফিরে এলাম। একটু পরই উসমান রাযি.-এর জনৈক দূত এসে আমাকে আহ্বান করল। আমি পুনরায় খলিফার কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, 'বলো, তোমার নসিহত (উপদেশ) কী?' আমি বললাম, 'আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং তার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। আপনি তাদের একজন, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ধন্য হয়েছে। আপনি উভয় হিজরতেও অংশ নিয়েছেন। নবীজির সোহবত লাভ করেছেন, তার নির্দেশনা অবলোকন করেছেন। এখন মানুষ ওয়ালিদ-এর বিষয়ে প্রচুর সমালোচনা করছে (খলিফা মদপানের আনিত অভিযোগে ওয়ালিদের ওপর হদ প্রয়োগে বিলম্ব করছিলেন)।'

উসমান বললেন, 'তুমি কি নবীজির সাক্ষাৎ লাভ করেছ?' আমি বললাম, 'না; তবে পর্দানশিন কুমারী নারীর কাছে যখন তার ইলম পৌঁছেছে, আমার কাছেও নিশ্চয়ই পৌঁছেছে।'

তখন উসমান বললেন, 'হামদ ও সালাতের পর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা নবীজিকে সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। আর আমি তাদের একজন ছিলাম, যারা আল্লাহ ও তার রাসুলের আহ্বানে

='আমরা (মদপানের) শাস্তি প্রয়োগ করব আর মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী জাহান্নামে তার শাস্তি ভোগ করবে।'

প্রসঙ্গত এ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য যে, নিকটাত্মীয় যদি দায়িত্বের উপযুক্ত ও নিষ্ঠাবান হয়, তাহলে তাকে দায়িত্বপ্রদান কোনো অপরাধ নয় এবং এর সমালোচনারও সুযোগ নেই। স্বয়ং নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচাতো ভাই আলি রাযি.-কে ইয়ামেনে বিচারকার্যের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বনু উমাইয়ার এমন অনেক সাহাবিকে নবীজি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান করেছিলেন, যারা ছিলেন সম্পর্কে নবীজির নিকটাত্মীয়। [মূল গ্রন্থের টীকা]

ছিল এক হাজারের মতো। নিজেদেরকে তারা কয়েকটি দলে বিভক্ত করেছিল।

মিশর থেকে একদল বিদ্রোহী এসেছিল গাফিকি বিন হারব ও আবদুল্লাহ বিন সাবার নেতৃত্বে।

আমর ইবনুল আছম ও যায়দ বিন ছাওজান আবদির নেতৃত্বে কুফা থেকে এসেছিল একটি দল।

হারকুছ বিন যুহায়র সাদি ও হাকিম বিন জাবালার নেতৃত্বে বসরা থেকে এসেছিল বিদ্রোহীদের তৃতীয় দলটি।

হজের মৌসুমে তারা খলিফা উসমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। খলিফা তাদের মিথ্যা অভিযোগসমূহের প্রকৃত বাস্তবতা তাদের সামনে সুস্পষ্ট করে দেন। বিদ্রোহীরা যখন দেখতে পায় যে, বিশেষ করে সাহাবায়ে কেরাম খলিফার পক্ষে আছেন এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে আছেন, তখন তারা খলিফার প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আপন আপন এলাকায় প্রত্যাবর্তনের ভান করে। সাহাবায়ে কেরামও ফিতনার সংঘাতমুক্ত সমাপ্তিতে আনন্দিত হন।

কিন্তু কিছুদিন না যেতেই হঠাৎ করে বিদ্রোহীরা খলিফাগৃহ অবরোধ করার উদ্দেশ্যে ফিরে আসে। হজরত আলি রাযি. তাদেরকে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাদের কয়েকজন উত্তর দেয়, খলিফা (আমাদের অঞ্চলের গভর্নরের কাছে) একটি বার্তা প্রেরণ করেছেন, যাতে আমাদের কয়েকজনকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে!

আলি রাযি. জিজ্ঞেস করেন—আচ্ছা, মিশরের কাফেলা না হয় এ কারণে ফিরে এসেছে; কুফা ও বসরার কাফেলা কেন ফিরে এলো?

তারা উত্তর দেয়, আমরা এসেছি আমাদের ভাইদের সহায়তা করতে!

তখন আলি রাযি. তাদেরকে বলেন, তোমরা তো কয়েক ক্রোশ পথ অতিক্রম করে ফেলেছিলে! একদলের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়েছে, তা অপর দল জানলে কীভাবে?! নিশ্চয়ই বিষয়টি পরিকল্পিত, মদিনায় থাকতেই এই ষড়যন্ত্র-পরিকল্পনা করা হয়েছে।

যাচাইয়ের পর প্রমাণিত হয় যে, খলিফার নামে দাবিকৃত চিঠিটি জাল। স্বয়ং আলি রাযি.-এর নামেও একটি চিঠি জাল করা হয়েছিল যে, তিনি

তাদেরকে ফিরে আসতে আহ্বান জানিয়েছেন। দুই বিশিষ্ট সাহাবি তালহা রাযি. ও যুবায়র রাযি.-এর নামেও এরূপ জাল পত্র তৈরি করা হয়েছিল যে, তারা কুফা ও বসরার বিদ্রোহীদেরকে ফিরে আসতে বলেছেন।

মদিনাবাসী বিদ্রোহীদেরকে মদিনায় প্রবেশে বাধা প্রদান করে। কিন্তু ইতিমধ্যে মদিনার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও বদলে গিয়েছিল। এবার মদিনার ভেতরেই একদল লোক খলিফার সঙ্গে দুঃসাহসী আচরণ করতে শুরু করে। তারা খলিফাকে নিজ গৃহে আশ্রয় নিতে বাধ্য করে এবং বাড়ি ঘেরাও করে খলিফাকে অবরুদ্ধ করে রাখে। সুযোগ বুঝে বহিরাগত বিদ্রোহীরাও অবরোধকারীদের সঙ্গে মিশে যায়। এ সময় হাসান রাযি., হুসাইন রাযি., আবদুল্লাহ বিন যুবায়র রাযি. ও আবদুল্লাহ বিন উমর রাযি.-সহ সাহাবাপুত্রদের একটি দল আপন আপন পিতার নির্দেশে খলিফার নিরাপত্তারক্ষায় উদ্যোগী হয়।

বিদ্রোহীরা খলিফাগৃহ অবরোধ করে রাখে এবং বাইরে থেকে পানি পৌঁছতে বাধা প্রদান করে। ইবনে উমর রাযি. কোমরে তরবারি বেঁধে উসমান রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হন। উসমান তাকে বলেন, 'দেখো, এরা কী বলছে?! এরা বলছে, আপনি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ত্যাগ করুন, অন্যথায় আমরা আপনাকে হত্যা করব।' ইবনে উমর প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি পৃথিবীতে চিরদিন থাকবেন?' খলিফা উত্তর দেন, 'না।' ইবনে উমর পুনরায় প্রশ্ন করেন, 'তারা কি আপনাকে হত্যা করার চেয়ে বেশি কিছু করতে পারবে?' খলিফা এবারও উত্তর দেন, 'না।' ইবনে উমর জিজ্ঞেস করেন, 'তারা কি আপনার জান্নাত বা জাহান্নামের মালিক?' খলিফা উত্তর দেন, 'না।' ইবনে উমর এবার বলেন, 'তাহলে আপনি কিছুতেই আল্লাহপ্রদত্ত (খিলাফতের) জামা খুলবেন না। এটাই সুন্নাত। যখনই কোনো দল তাদের খলিফাকে অপছন্দ করেছে, হয় তাকে অপসারণ করেছে, নয়তো হত্যা করেছে।'

হজরত আবু হুরায়য়া রাযি. খলিফার কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, 'এখন আপনার সঙ্গে থেকে লড়াই করা আবশ্যক হয়ে গেছে।' উত্তরে খলিফা তাকে বলেন, 'আমি শপথ দিয়ে বলছি, তুমি অবশ্যই চলে যাও।'

যায়দ বিন ছাবিত রাযি. খলিফা উসমান রাযি.-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন, 'এই যে আনসারদের একটি দল দরজায় দণ্ডায়মান আছে। তারা বলছে, আপনি চাইলে আমরা দ্বিতীয়বার আল্লাহর (দ্বীনের)

সাহায্যকারী হব।' যায়দ রাযি.-এর সঙ্গে প্রায় সাতশ মুহাজির ও আনসার ছিল।

কিন্তু উসমান রাযি. উত্তর দেন, 'এসবের প্রয়োজন নেই। যারা বিশ্বাস করে যে, তাদের ওপর আমার আনুগত্যের অধিকার আছে, আমি তাদেরকে শপথ দিয়ে বলছি, তারা যেন নিজেদের হাত নিবৃত্ত রাখে এবং অস্ত্র ত্যাগ করে।' খলিফার নির্দেশে বাধ্য হয়ে তারা অস্ত্র ত্যাগ করে।

উসমান রাযি. (বাড়ির ছাদ থেকে) বিদ্রোহীদের উদ্দেশে বলেন, 'তিনটি কারণ ব্যতিরেকে কোনো মুসলমানের রক্ত প্রবাহিত করা বৈধ নয়—ঈমান আনার পর দ্বীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে গেলে, বিয়ে করার পর ব্যভিচার করলে অথবা কাউকে কিসাস ব্যতীত (অন্যায়ভাবে) হত্যা করলে। বলো, আমি কি এই তিন প্রকারের কোনো প্রকারের অন্তর্ভুক্ত?' বিদ্রোহীরা নিশ্চুপ-নিরুত্তর থাকে।

এরপর খলিফা উসমান রাযি. তার কাছে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দেন।

খলিফা উসমান রাযি. নিজের প্রতিরক্ষার জন্যও রক্তপাতকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং আলোচনা ও সদুপদেশের মাধ্যমে বিদ্রোহীদেরকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা চরম দুঃসাহস প্রদর্শন করে। অবরোধের চল্লিশতম দিন তারা খলিফার বাড়ির অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে এবং বিদ্রোহীদের কয়েকজন মিলে কুরআন তেলাওয়াতরত খলিফাকে নির্মমভাবে শহিদ করে। খলিফা উসমান রাযি. তখন কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন—

﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ...﴾

সুতরাং এখন তাদের জন্য আপনার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট ...।

[সুরা বাকারা : ১৩৭]

হত্যাকারীদের আঘাতে প্রবাহিত উসমান রাযি.-এর প্রথম রক্তফোঁটা তার সামনে থাকা কুরআনের এই আয়াতের ওপর পড়ে। খলিফা তখন রোজা অবস্থায় ছিলেন। প্রিয়নবীজির ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য প্রমাণিত করে তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-এর শহিদি আত্মা ছুটে চলে পরম প্রভুর পানে।

মা'বাদ আল-খুযায়ি রাযি. আলি রাযি.-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাকে বলুন, উসমান রাযি.-কে যখন হত্যা করা হয়, তখন কোন যুক্তিতে আপনি তাকে সাহায্য করা হতে বিরত ছিলেন? আলি রাযি. উত্তর দেন, উসমান ছিলেন (উম্মাহর) ইমাম। তিনি আমাদেরকে লড়াই করতে নিষেধ করে বলেছিলেন, যে আপন তরবারি কোষমুক্ত করবে, সে আমার আনুগত্যভুক্ত নয়। তার এ কথার পরও যদি আমরা লড়াই করতাম, তাহলে আমরা ইমামের অবাধ্য হতাম।

এরপর মা'বাদ জিজ্ঞেস করেন, তাহলে কোন যুক্তিতে উসমান এ অবস্থান গ্রহণ করলেন? কেন তিনি সংযত থেকে শেষ পর্যন্ত শহিদই হয়ে গেলেন?

আলি রাযি. উত্তর দেন, যে যুক্তিতে ইবনে আদম (হাবিল) আপন অবস্থান নির্ধারণ করেছিলেন। তিনি তার ভাইকে বলেছিলেন—

﴿لَئِنْ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَآ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

তুমি যদি আমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমার দিকে হাত বাড়াও, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তোমার দিকে হাত বাড়াব না। আমি তো জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। [সুরা মায়িদা : ২৮]

—দ্রষ্টব্য—

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর

কারও মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে যে, মদিনায় সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপক উপস্থিতি সত্ত্বেও কীভাবে এই বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হলো? এর উত্তর হচ্ছে—

- মদিনায় উপস্থিত অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ধারণা করতে পারেননি যে, বিষয়টি খলিফা-হত্যা পর্যন্ত গড়াবে।
- সাহাবায়ে কেরাম খলিফার প্রতিরক্ষায় দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিলেন। কিন্তু যখন বিদ্রোহীদের চাপ কঠিন আকার ধারণ

করে, তখন খলিফা সকলকে শপথ দিয়ে নিবৃত্ত হতে এবং তরবারি কোষবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দেন। ফলে সবাই বাধ্য হয়ে খলিফার নির্দেশ মান্য করে।

- বিদ্রোহীরা হজের মৌসুমে অনেক সাহাবির (হজ আদায় করতে যাওয়ায়) অনুপস্থিতির বিষয়টিকেও কাজে লাগিয়েছিল। তারা জানত, খলিফার সহায়তায় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বাহিনী নিকটে চলে এসেছে। তাই তারা বিলম্ব না করে খলিফাকে হত্যা করে।
- বিদ্রোহী অবরোধকারীদের সংখ্যা ছিল দুই হাজারের কাছাকাছি। এমনও হতে পারে যে, মদিনায় এ পরিমাণ যোদ্ধা-পুরুষের উপস্থিতিও ছিল না। কারণ, যোদ্ধাপুরুষগণ অধিকাংশই বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও সীমান্ত অঞ্চলে যুদ্ধাভিযানে শরিক ছিলেন।
- সাহাবায়ে কেরামের অনেকে এই বিদ্রোহ-ফিতনার সময় ফিতনা হতে দূরে থেকে নিজ নিজ বাড়িতে অবস্থান করছিলেন। আর যারা মসজিদে উপস্থিত হতেন, তারাও তরবারি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

—o—

খলিফা উসমান রাযি.-এর শাহাদাত-ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদল বিরুদ্ধবাদী এই অপপ্রচার চালায় যে, সাহাবা-জামাতের কেউ কেউ এই বিদ্রোহের পক্ষে ছিলেন এবং তারা খলিফার হত্যাকাণ্ডে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এটি সম্পূর্ণই মিথ্যা ও বানোয়াট একটি অভিযোগ। সাহাবায়ে কেরামের মহান কাফেলার কোনো সদস্যের এই বিদ্রোহে সামান্য সমর্থনও ছিল না এবং তারা কেউই এই ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্টও ছিলেন না। বরং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই এর বিরোধী ছিলেন। তারা বিদ্রোহীদের ঘৃণা করতেন এবং যারা এই জঘন্য কাজ করেছে, তাদের কঠোর নিন্দা করতেন। হ্যাঁ, আম্মার বিন ইয়াসির, মুহাম্মাদ বিন আবু বকরসহ কতক সাহাবি মনে করতেন যে, (ফিতনা নিরসনে) উসমান রাযি. যদি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব ত্যাগ করতেন, তাহলে ভালো হতো।

সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো—সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাতের চরিত্র বিকৃত করার উদ্দেশ্যে উসমান-হত্যাকে কেন্দ্র করে যেসব জাল-মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা তৈরি করা হয়েছে, আমরা সেগুলোকে পরিহার করব এবং সাহাবায়ে কেরামের প্রতি স্বচ্ছ-সঠিক ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ধারণা পোষণ করব।

৩৫ হিজরি সনের ১৮ জিলহজ (৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ জুন) শুক্রবার তৃতীয় খলিফা উসমান রাযি.-কে শহিদ করা হয়। এ সময় খলিফার বয়স হয়েছিল বিরাশি বছর। বিশিষ্ট সাহাবি যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি. তার জানাজা পড়ান। এরপর তাকে জান্নাতুল বাকির পূর্ব অংশে দাফন করা হয়। তার খিলাফতকাল ছিল বারো দিন কম বারো বছর।

* * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হজরত আলি রাযি.-এর খিলাফত

[জিলহজ ৩৫ হিজরি—রমজান ৪০ হিজরি]
[জুন ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ—জানুয়ারি ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ]

চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি.-এর কিছু গুণ-বৈশিষ্ট্য

❖ হজরত আলি রাযি. নবীজির আপন চাচাতো ভাই ছিলেন। তার উপনাম ছিল আবুল হাসান ও আবু তুরাব। নবীজি তার কাছে নিজ ছোট কন্যা ফাতিমা রাযি.-কে বিয়ে দেন। তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রবর্তী ইসলামগ্রহণকারী। বরং ইবনে আব্বাস রাযি., আনাস রাযি., যায়দ বিন আরকাম রাযি. ও সালমান ফারসি রাযি.-এর মতে তিনিই সবার আগে ইসলামগ্রহণ করেন। আলি রাযি. আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অগ্রগণ্য মতানুসারে হস্তিবাহিনীর ঘটনার ত্রিশ বছর পর তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

❖ আলি রাযি. নবীজির সঙ্গে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। একমাত্র তাবুকের যুদ্ধের সময় নবীজি তাকে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন যুদ্ধে নবীজি তাকে মুসলিম বাহিনীর মূল ঝান্ডাও প্রদান করেন। প্রতিটি যুদ্ধে তার বীরত্ব ও রণকুশলতার বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে। নবীজি হতে তিনি পাঁচশ সাতাশিটি হাদিস বর্ণনা করেছেন।

❖ ইমাম বুখারি রহ. আপন সনদে সালামা বিন আকওয়া' রাযি. হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন—

আলি রাযি. খায়বার যুদ্ধে নবীজির সঙ্গে যাননি। কেননা, তখন তার চোখের অসুস্থতা ছিল। তিনি (মনে মনে) বললেন, আমি রাসুলের সঙ্গে জিহাদে যাব না?! এরপর তিনি বেরিয়ে পড়লেন এবং নবীজির কাফেলার সঙ্গে মিলিত হলেন। যেদিন সকালে আল্লাহ তাআলা খায়বার বিজয় দান করেন, তার পূর্বের রাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আগামীকাল আমি অবশ্যই এমন একজনকে ঝান্ডা প্রদান করব (অথবা বলেছেন, আগামীকাল অবশ্যই এমন একজন ঝান্ডা গ্রহণ করবে), যাকে আল্লাহ ও তার রাসুল ভালোবাসেন (অথবা বলেছেন, যে আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসে)। তার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিজয় দান করবেন। সকালে দেখা গেল, তিনি হলেন আলি; অথচ (তার অসুস্থতাজনিত কারণে) আমরা তার বিষয়ে ধারণাই করিনি। সকলেই (অবাক হয়ে) বলতে লাগল, এ যে আলি! আল্লাহর রাসুল তাকেই ঝান্ডা প্রদান করলেন এবং আল্লাহ তাআলা তার হাতেই বিজয় দান করলেন।[১৪৬]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন—

হাদিসের ভাষ্য 'আলি আল্লাহ ও তার রাসুলকে ভালোবাসেন এবং আল্লাহ ও তার রাসুলও তাকে ভালোবাসেন'-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ভালোবাসার অস্তিত্ব; অন্যথায় ব্যাপকার্থে আল্লাহ ও রাসুলের ভালোবাসা তো প্রতিটি মুসলমানের হৃদয়েই বিদ্যমান আছে। হাদিসটিতে যেন কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের মর্মার্থের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

(হে নবী,) মানুষকে বলে দিন—তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো, তবে আমার অনুসরণ করো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন। [সুরা আলে-ইমরান : ৩১]

হাদিসে যেন এ মর্মে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আলি রাযি. আল্লাহর রাসুলের পূর্ণ অনুগত ও পূর্ণ অনুসারী। তাই তাকে 'আল্লাহর

---

১৪৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং ৪২০৯।

ভালোবাসা'র গুণ-বৈশিষ্ট্যে ভূষিত করা হয়েছে। এ কারণেই বিভিন্ন হাদিসে আলি রাযি.-এর প্রতি ভালোবাসা রাখাকে ঈমানের আলামত এবং তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করাকে নিফাক ও কপটতার নিদর্শন ঘোষণা করা হয়েছে।[১৪৭]

❖ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. বলেছেন—

আলি বিন আবু তালিব রাযি. (এর গুণ-বৈশিষ্ট্য ও চারিত্রিক প্রশংসা) সম্পর্কে আমরা যে পরিমাণ বিবরণ লাভ করেছি, অন্য কোনো সাহাবির ক্ষেত্রে সে পরিমাণ লাভ করিনি।

খলিফা হিসেবে আলি রাযি.-এর দায়িত্বগ্রহণ

উসমান রাযি. নিহত হওয়ার পর মদিনা খিলাফতশূন্য হয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের মিশরীয় নেতা গাফিকি বিন হারব-ই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল। মদিনাবাসী এ সময় কার্যত অসহায় হয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহীরা যদিও খলিফা উসমান রাযি.-কে হত্যার প্রশ্নে একজোট ছিল; কিন্তু নতুন খলিফা নির্বাচনের বিষয়ে তারা মতবিভক্ত ছিল। মিশরীয় বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল আলি রাযি.-এর প্রতি, বসরার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি.-এর প্রতি আর কুফার বিদ্রোহীদের আগ্রহ ছিল যুবায়র ইবনুল আওয়াম রাযি.-এর প্রতি। কিন্তু তারা তিনজনই বিদ্রোহীদের প্রত্যাখ্যান করায় বিদ্রোহীরা এরপর সাদ বিন আবু ওয়াককাস রাযি.-কে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি আরও কঠোর ভাষায় বিদ্রোহীদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এদিকে ইসলামি রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খলিফার সহায়তায় আগত বাহিনীগুলো মদিনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। অবস্থা বেগতিক দেখে বিদ্রোহীরা মদিনাবাসীকে হুমকি প্রদান করে এবং দুদিন সময় দিয়ে বলে যে, এরমধ্যে মদিনাবাসী নতুন খলিফা নির্বাচিত করতে না পারলে তারা আলি ও যুবায়র রাযি.-সহ অনেককে হত্যা করবে।

এরপর মদিনায় উপস্থিত বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম সর্বদিক বিবেচনা করে হজরত আলি রাযি.-কেই সবচেয়ে উপযুক্ত বিবেচনা করে তাকে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানান। আলি রাযি. তা প্রত্যাখ্যান করলেও সকলে

---

১৪৭. ইবনে হাজার আসকালানি, *ফাতহুল বারি*, ৭/৭২।

তাকে উম্মাহর এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের দিকে তাকিয়ে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকে। অবশেষে ২৫ জিলহজ সকলে তার হাতে বায়আত গ্রহণ করে। তার বায়আতের সংবাদ সমকালীন ইসলামি বিশ্বের সকল প্রান্তে বার্তা প্রেরণের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলে শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. ব্যতীত সকলে তার প্রতি আনুগত্যের ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে মুয়াবিয়া রাযি.-এর সঙ্গে তার যে বিরোধ সংঘটিত হয়, তার বিবরণ সামনে আসছে।

ফিতনা ও ষড়যন্ত্র এবার নতুন রূপে

দায়িত্ব গ্রহণের পর হজরত আলি রাযি. প্রথমেই ইসলামি রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মনোযোগী হন। তিনি বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন গভর্নর প্রেরণ করেন এবং তাদের মাধ্যমে সকল স্থান থেকে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেন। আলি রাযি. শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে বায়আতের আহ্বান জানিয়ে বার্তা পাঠালে মুয়াবিয়া রাযি. উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। মুয়াবিয়া রাযি. পরিস্থিতি কোন দিকে গড়ায় এবং বিদ্রোহীরা সামনে কী পদক্ষেপ নেয়, তার অপেক্ষা করছিলেন।

এদিকে খলিফা উসমান রাযি.-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীরা তার হত্যাকাণ্ডের পরপরই নিজেদের রূপ বদলে ফেলে। এবার তারা উসমান-হত্যার প্রতিশোধের দাবি তোলে। মদিনার আকাশে-বাতাসে তখন একটাই আওয়াজ—দ্রুত উসমান-হত্যার প্রতিশোধ চাই। দুই বিশিষ্ট সাহাবি তালহা বিন উবায়দুল্লাহ রাযি. ও যুবায়র বিন আওয়াম রাযি. নিষ্ঠাপূর্ণ আবেগের ভিত্তিতে মদিনাবাসীকে উসমান হত্যাকারীদের ওপর কিসাস প্রয়োগের দাবি তুলতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই দুই মহান ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেননি যে, ষড়যন্ত্রকারীদের দাবির আড়ালে প্রকৃতপক্ষে মুসলিম উম্মাহকে এক দীর্ঘমেয়াদি ফিতনায় জড়িয়ে ফেলার দুরভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। দুই মহান সাহাবির আহ্বানে মক্কা-মদিনায় শত শত মানুষ আন্দোলনে প্রস্তুত হয়ে যায়। যেহেতু তখনও মদিনার পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়নি, তাই উসমান-হত্যার প্রতিশোধ ও বিদ্রোহীদের বিচারের দাবিতে আন্দোলনকারীরা বসরায় সমবেত হয়। আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা রাযি.-ও তাদের সঙ্গে ছিলেন।

বসরার গভর্নর উসমান বিন হানিফ আন্দোলনকারীদের বাধা প্রদানে অগ্রসর হলে আন্দোলনকারীরা তাকে অবরুদ্ধ ও বন্দি করে। বসরায় তালহা রাযি., যুবায়র রাযি. ও আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

খলিফা আলি রাযি. বিদ্রোহীদের সঙ্গে সমঝোতার উদ্দেশ্যে তার সমর্থকদের নিয়ে বসরায় গমন করেন। খলিফা কা'কা' বিন আমর রাযি.-কে আম্মাজান আয়েশা রাযি. ও সাহাবিদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য প্রেরণ করলে তার নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা ও পরিশুদ্ধির বাতাস বইতে শুরু করে। এ সময় আলি রাযি. যুবায়র রাযি.-কে নবীজির ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেন—

«لَتُقَاتِلَنَّه ؛ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَه»

> অচিরেই এমন এক সময় আসবে, যখন তুমি আলির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামবে, আর সেদিন তুমিই থাকবে অন্যায়ের ওপর।[১৪৮]

আলি রাযি.-এর কথা শুনে যুবায়র রাযি. বলেন, আমার মনে পড়েছে। যদি আপনি আমাকে (আগেই) স্মরণ করিয়ে দিতেন, তাহলে আমি (আন্দোলনে) বের হতাম না। এরপর তিনি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মনস্থ করেন এবং প্রত্যাবর্তনের জন্য মদিনার উদ্দেশে রওনা হন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে শহিদ করে দেওয়া হয়।

ষড়যন্ত্রকারীরা যখন দেখতে পায় যে, তাদের সাজানো পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে এবং বিবাদমান উভয় পক্ষ সন্ধি ও সমঝোতার প্রতি অগ্রসর হচ্ছে, তখন তারা নতুন এক কৌশল অবলম্বন করে। ইবনে সাবার পরামর্শে তারা উভয় পক্ষের সমর্থকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে সমঝোতা হওয়ার পূর্বেই উভয় পক্ষকে উত্তেজিত করে যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

---

১৪৮. আবু আবদুল্লাহ হাকিম, *আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন*, হাদিস নং ৫৫৭৫।

উটের যুদ্ধ

[জুমাদাল উখরা ৩৬ হিজরি]
[ডিসেম্বর ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ]

অবশেষে ইসলামের শত্রু সাবায়ি চক্রের ষড়যন্ত্র সফল হয়। তারা দুদিক থেকে তির ছুড়তে থাকায় উভয় পক্ষই মনে করছিল যে, অপর পক্ষ সমঝোতার পরিবর্তে যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছে। শুরু হয় উত্তেজিত দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই। আম্মাজান আয়েশা রাযি.-এর হাওদা বহনকারী উটের সামনে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে। সাবায়ি চক্র যেকোনো মূল্যে আম্মাজানকে বহনকারী উটটিকে হত্যা করার চেষ্টা করছিল। তাদের আক্রমণে সেখানেই নিহত হয় সত্তরজন ব্যক্তি, যারা প্রত্যেকে উটের রাশ (নাসিকা বন্ধনী) ধরে ছিল।

হজরত আলি রাযি. বিষয়টি অবগত হয়ে উটের পায়ে আঘাত করেন এবং আম্মাজান বিপদমুক্ত হন। তিনি তার সঙ্গীদেরকে আয়েশা রাযি.-কে পাহারা দেওয়ার নির্দেশ দেন। অবশেষে আম্মাজান নিরাপদে মদিনায় ফিরে যান। এভাবে দুষ্ট সাবায়ি চক্রের ষড়যন্ত্রে সংঘটিত এ যুদ্ধে বসরায় গমনকারী বাহিনীর দশ হাজার এবং আলি রাযি.-এর বাহিনীর পাঁচ হাজার সৈন্য নিহত হয়।

যুদ্ধ শুরু হলে হজরত তালহা রাযি. চিৎকার করে উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করছিলেন। এরই মধ্যে তিনি তিরবিদ্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন। তালহা ও যুবায়র রাযি. ছিলেন আশারায়ে মুবাশশারার অন্তর্ভুক্ত দুই মহান সাহাবি। তারা দুজন খলিফা উমর রাযি.-এর নির্বাচিত শুরারও সদস্য ছিলেন। ইসলামের একেবারে সূচনালগ্ন থেকে নবীজির সঙ্গী হয়ে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য অনন্যসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন। হজরত আলি রাযি.-এর সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ ছিল না; বরং তালহা রাযি.-ই প্রথম আলি রাযি.-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন। আলি রাযি. যেমন সমঝোতা ও শান্তি কামনা করছিলেন, তারা দুজনও তেমনই শান্তি ও সমঝোতার জন্যই চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দুষ্ট সাবায়ি চক্রের ষড়যন্ত্রে উসমান রাযি.-এর পর এই দুই মহান সাহাবিও নিহত হন।

সিফফিনের যুদ্ধ

[সফর, ৩৭ হিজরি]
[জুলাই, ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দ]

হজরত মুয়াবিয়া রাযি. খলিফা উমর রাযি.-এর শাসনামল হতেই শামের গভর্নর ছিলেন। তিনি যখন দেখতে পান যে, একদিকে উসমান-হত্যার বিচারের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হচ্ছে না, অপরদিকে বিচারের দাবিদার আন্দোলনকারীগণ বসরায় সমবেত হওয়ার পর উটের যুদ্ধের ন্যায় বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তখন তিনি বায়আতের বিষয়ে আরও বিলম্ব করার সিদ্ধান্ত নেন। অপরদিকে আলি রাযি.-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল—যেহেতু তিনি এখন ইসলামি রাষ্ট্রের বৈধ খলিফা এবং অন্যান্য অঞ্চলের প্রশাসন ও জনগণ ইতিমধ্যে তার খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করেছে, তাই ইসলামি খিলাফতের অধীনস্থ একটি অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কর্তব্য তার বায়আত গ্রহণ করা।

অবশেষে ৩৭ হিজরি সনের মুহাররম মাসে খলিফা আলি রাযি. শামের গভর্নর-পদ হতে মুয়াবিয়া রাযি.-কে অপসারণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি. খলিফার নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন। বাধ্য হয়ে খলিফা আলি রাযি. তার বাহিনী নিয়ে কুফা থেকে[১৪৯] মুয়াবিয়া রাযি.-এর মোকাবিলায় রওনা হন। মুয়াবিয়া রাযি.-ও নিজ বাহিনী নিয়ে শাম থেকে বের হয়ে আসেন। ষড়যন্ত্রকারীদের একটি দলও তার বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

যুদ্ধের পূর্বে আলি রাযি. নিজ অবস্থানের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ উল্লেখ করে মুয়াবিয়া রাযি.-এর কাছে বার্তাবাহক প্রেরণ করেন। কিন্তু মুয়াবিয়া রাযি.

---

১৪৯. উটের যুদ্ধের পর হজরত আলি রাযি. বসরা থেকে কুফায় চলে যান এবং কুফাকেই দারুল খিলাফাহ নির্ধারণ করেন। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হলো—১. ইসলামি রাষ্ট্র ততদিনে যথেষ্ট বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল। তাই ইসলামি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল কেন্দ্র এমন কোথাও হওয়া প্রয়োজন ছিল, যেখান থেকে রাষ্ট্রের যেকোনো প্রান্তে সহজে পৌঁছা সম্ভব। এ ক্ষেত্রে কৌশলগত দিক থেকে কুফাই ছিল সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। ২. একমাত্র শাম অঞ্চলই আলি রাযি.-এর খিলাফত মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। যেহেতু কুফার অবস্থান ছিল শামের সন্নিকটে, তাই খলিফা আলি রাযি. শাম থেকে আগত সম্ভাব্য যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য কুফায় অবস্থান করা শ্রেয়তর মনে করেছিলেন।

তা মেনে না নেওয়ায় সমঝোতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সিফফিনের[১৫০] কাছে উভয় বাহিনী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। বিশিষ্ট সাহাবি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি. মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর হাতে নিহত হন। নবীজি আম্মার বিন ইয়াসির রাযি.-কে বলেছিলেন—

«تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

তোমাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।[১৫১]

একপর্যায়ে জয়ের পাল্লা আলি রাযি.-এর দিকে হেলে পড়ে এবং মুয়াবিয়া-বাহিনী পরাজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এ সময় মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীতে থাকা আমর ইবনুল আস রাযি. যুদ্ধ বন্ধ করে সালিশ ও মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের দাবি তোলেন। তখন মুয়াবিয়া রাযি.-এর বাহিনীর সৈন্যরা কুরআন উঁচু করে ধরে এবং মধ্যস্থতার দাবি জানায়।

আলি রাযি. বুঝতে পারেন—প্রকৃতপক্ষে এটি পরাজয় এড়ানোর একটি কৌশলমাত্র। কিন্তু আলি রাযি.-এর বাহিনীর অধিকাংশ সাহাবিগণ মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা মেনে নিতে বাধ্য হন।

সালিশ ও মধ্যস্থতা

ইতিহাসের এই অংশটি অত্যন্ত জটিল। সালিশ ও সালিশের ফলাফল নিয়ে নানা ধরনের কথা প্রচলিত আছে। যেমন—আমর ইবনুল আস রাযি. আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে ধোঁকা দিয়েছিলেন, তিনি আমিরুল মুমিনিন হজরত আলি রাযি.-এর বরখাস্তের ঘোষণা দিতে আবু মুসা আশআরিকে বাধ্য করেন, এরপর নিজে দাঁড়িয়ে আবু মুসার ঘোষণাকে সমর্থন করেন এবং উভয়ের সিদ্ধান্তের বিপরীতে মুয়াবিয়া রাযি.-এর নামে খিলাফতের ঘোষণা দেন ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে এগুলো সব মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা, যার একটিও প্রমাণিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো—প্রাচীন ও আধুনিক যেসব লেখক এসব বর্ণনা

---

১৫০. **সিফফিন** : রোমান আমলে প্রতিষ্ঠিত সুপ্রাচীন একটি জনপদ। আধুনিক সিরিয়ার রাক্কা নগরীতে ফুরাত নদীর পশ্চিম তীরে ছোট্ট এই জনপদটির অবস্থান।

১৫১. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং ৩৮০০।

উল্লেখ করেছেন, তারা সকলেই কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় এ কথা স্বীকার করেন যে, মুয়াবিয়া রাযি. কখনোই আলি রাযি.-এর খিলাফত নিয়ে আপত্তি বা বিতর্ক করেননি এবং নিজে খলিফা হওয়ার দাবিও করেননি; তিনি কেবল উসমান-হত্যাকারীদের কিসাসের দাবি জানিয়েছেন। তার যুক্তি ছিল, নিহত ব্যক্তির শরয়ি অভিভাবক হিসেবে রক্তপণ দাবি করার অধিকার তার আছে। এটি ভিন্ন প্রসঙ্গ যে, তৎক্ষণাৎ কিসাস প্রয়োগের দাবির ক্ষেত্রে তিনি ইজতিহাদি ভুল করেছিলেন। কারণ, সকলেই এ কথা স্বীকার করে যে, আলি রাযি. কখনোই কিসাস কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানাননি, শিথিলতা বা অবহেলাও প্রদর্শন করেননি। আলি রাযি.-এর যুক্তি ছিল—সমস্যা তো এখন আরও প্রকট আকার ধারণ করেছে। খোদ ইসলামি রাষ্ট্রের রাজধানী মদিনাই এখন বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। এ কারণেই আমিরুল মুমিনিন আলি রাযি. তালহা রাযি. ও যুবায়র রাযি.-কে বলেছিলেন, 'আমরা এমন একদল লোকের বিরুদ্ধে কীভাবে (এখনই) পদক্ষেপ গ্রহণ করব, যারা আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে; অথচ তাদের ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই?' এরপর তিনি বলেন, 'এভাবে খুনের বদলার দাবিতে আন্দোলন করা একটি জাহিলি রীতি। আপনারা শান্ত হোন; ধীরে ধীরে সকলে শান্ত হয়ে যাবে এবং সবার হৃদয়-অবস্থান স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তখন হত্যার কিসাস গ্রহণ করা হবে।'

মূল বর্ণনায় ফিরে আসি। হজরত আমর ইবনুল আস রাযি. ও আবু মুসা আশআরি রাযি.-কে মধ্যস্থতাকারী নির্ণয় করা হয়। উভয়ে সিদ্ধান্ত জানান—আলি রাযি.-কে খিলাফতের দায়িত্ব হতে বরখাস্ত করে বিষয়টি মুসলিম উম্মাহর হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক; তারা যাকে ইচ্ছা, নিজেদের খলিফা নির্বাচন করবে। বাকি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক-ব্যবস্থাপনা পূর্বের ন্যায় উভয় নেতার হাতেই থাকবে। আলি রাযি. তার অধীনস্থ অঞ্চলের দেখাশোনা করবেন আর শামের দায়িত্ব থাকবে মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে।

আলি রাযি. সালিশের ফয়সালা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি এ ফয়সালাকে মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তিদ্বয়ের অনধিকার চর্চা হিসেবে বিবেচনা

করেন। কারণ, বিরোধ তো খলিফা নির্বাচন নিয়ে ছিল না; বিরোধ ছিল উসমান রাযি.-এর হত্যাকারীদের বিচার কার্যকর করা নিয়ে।[১৫২]

এরপর খলিফা আলি রাযি. তার অনুসারীদের নতুন করে মুয়াবিয়া রাযি.-এর বিরুদ্ধে সংগঠিত হওয়ার আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া দূরে থাক; এর পরিবর্তে ঘটে এক বিস্ময়কর বিভক্তি।

খারিজি সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশ

আলি রাযি.-এর বাহিনীর বারো হাজার সৈন্যের একটি দল মধ্যস্থতার মূল প্রক্রিয়াকেই প্রত্যাখ্যান করে বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ ইতিপূর্বে তারাই আলি রাযি.-কে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। তারা দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ক্ষান্ত না হয়ে মধ্যস্থতার প্রস্তাব মেনে নেওয়ায় হজরত আলিকে কাফির সাব্যস্ত করে।

বিচ্ছিন্ন বাহিনী কুফায় পৌঁছে হারুরা নামক গ্রামে অবতরণ করে। এ কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী এ দলটিকে হারুরিয়া নামে অভিহিত করা হয়। তবে তাদের প্রসিদ্ধ নাম হলো খারিজি সম্প্রদায়।

হজরত আলি রাযি. ও অন্যান্য ফকিহ সাহাবিগণ তাদেরকে এ বিষয়ে শরিয়তের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝানোর চেষ্টা করেন; কিন্তু তারা ছিল চরম নির্বোধ প্রকৃতির বেদুইন গোষ্ঠী। নিজেদের মাথায় যা ধরত, তারা কেবল তা-ই বুঝত; কোনো যুক্তিতর্ক মানার মনোভাব তাদের মধ্যে ছিল না। তারা মানুষকে সালিশের বিষয়ে জিজ্ঞেস করত; যে এর পক্ষে বলত, তাকেই তারা মুরতাদ ও কাফির গণ্য করে হত্যা করত।

দলিলপ্রমাণ ও যুক্তিতর্কের মাধ্যমে খারিজি সম্প্রদায়কে সুপথে আনার প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হয়ে হজরত আলি রাযি. ৩৮ হিজরি সনে তাদের দমনে যুদ্ধ শুরু করেন। বহু খারিজি নিহত হয়, অনেকে পালিয়ে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীকালে খারিজিরা বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন বিশটি উপদলে পরিণত হয়।

---

১৫২. সালিশ ও মধ্যস্থতার বিষয়সহ উসমান রাযি. ও আলি রাযি.-এর খিলাফত আমলের ফিতনা পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারসাম্যপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন : মাকতাবাতুল হাসান থেকে প্রকাশিত ড. রাগিব সারজানির *'ফিতনার ইতিহাস'*।

৩৯ হিজরি সনে আলি রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি. পরস্পর যুদ্ধবিরতির সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন। উভয়ের ঐকমত্যে সিদ্ধান্ত হয়, মুয়াবিয়া রাযি.-ই শামের গভর্নর থাকবেন, আমিরুল মুমিনিন শামে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবেন না।

৪০ হিজরিতে খারিজিরা আমিরুল মুমিনিন আলি রাযি., শামের গভর্নর মুয়াবিয়া রাযি. ও (তাদের দৃষ্টিতে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে অপরাধী) আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা উল্লিখিত তিন মহান সাহাবিকে হত্যা করার জন্য তিনজন গুপ্তঘাতককে দায়িত্ব দেয়। আলি রাযি.-কে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয় আবদুর রহমান বিন মুলজিমকে, মুয়াবিয়া রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় বুরাক বিন আবদুল্লাহকে আর আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় আমর বিন বকর তামিমিকে। সিদ্ধান্ত হয়, তিন গুপ্তঘাতক ১৭ রমজান ফজর নামাজের সময় তাদেরকে হত্যা করবে। কিন্তু তিন গুপ্তঘাতকের মধ্যে কেবল একজনই তার দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হয়।

৪০ হিজরি সনের ১৭ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি)। প্রতিদিনের অভ্যাসমতো খলিফা আলি রাযি. ফজরের পূর্বে সকলকে জাগ্রত করতে ঘর থেকে বের হন। কুফার মসজিদের দরজায় ওত পেতে ছিল খারিজি গুপ্তঘাতক। আলি রাযি. মসজিদের কাছে পৌঁছতেই গুপ্তঘাতক তার ওপর হামলা চালায়। আহত খলিফা চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'কাবার রবের শপথ! আমি তো সফলকাম!'

লোকজন দ্রুত ছুটে এসে ঘাতককে ধরে ফেলে। খলিফার তখন অন্তিম মুহূর্ত সন্নিকটে। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, ঘাতককে কী করা হবে? আলি রাযি. উত্তর দেন, 'যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে করণীয় আমিই নির্ধারণ করব। আর যদি আমি মারা যাই, তাহলে করণীয় নির্ণয়ের অধিকার তোমাদের। তোমরা যদি কিসাস গ্রহণেরই সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে এক আঘাতের পরিবর্তে এক আঘাতই করবে; আর যদি তাকে ক্ষমা করে দাও, তাহলে তা-ই তাকওয়ার নিকটতর দাবি।'

একই সময় শামে বুরাক বিন আবদুল্লাহ মুয়াবিয়া রাযি.-এর ওপর আক্রমণ চালায়। তার লক্ষ্যভ্রষ্ট আঘাতে মুয়াবিয়া রাযি. আহত হলেও পরে সুস্থ হয়ে যান। অপরদিকে আমর ইবনুল আস রাযি.-কে হত্যা করার জন্য

ঘাতক আমর বিন বকর ওত পেতে থাকলেও তিনি সেদিন অসুস্থতার কারণে নিজে মসজিদে না গিয়ে খারিজা বিন হুযাফা রাযি.-কে ইমামতি করার জন্য পাঠান। ঘাতক তাকেই আমর মনে করে হত্যা করে।

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হজরত আলি রাযি. তেষট্টি বছর বয়সে ৪০ হিজরির ২১ রমজান (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি) কুফায় ইন্তেকাল করেন।

৪০ হিজরির শাওয়াল মাসে (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে) মদিনাবাসী হজরত হাসান বিন আলি রাযি.-এর হাতে খিলাফতের বায়আত গ্রহণ করে।

এর মাত্র ছয় মাস পর ৪১ হিজরি সনের ২৫ রবিউল আউয়াল (৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ জুলাই) হজরত হাসান রাযি. উম্মাহর ঐক্য ও সম্প্রীতির বৃহত্তর স্বার্থে হজরত মুয়াবিয়া রাযি.-এর হাতে খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এ কারণেই ৪১ হিজরি সনকে ঐক্য ও সম্প্রীতির বছর বলে নামকরণ করা হয়। হাসান রাযি.-এর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয় তার সম্পর্কে সত্যনবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কৃত এই ভবিষ্যদ্বাণী—

«إِنَّ ابْنِيْ هٰذَا سَيِّدٌ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِه بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ»

আমার এই দৌহিত্র একজন সর্দার। সম্ভবত আল্লাহ তাআলা তার মাধ্যমে মুসলিম জাতির বড় দুটি দলের মাঝে মীমাংসা করবেন।[১৫৩]

৪০—দ্রষ্টব্য—৫২

সাহাবা-অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে বিশুদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম কুরতুবি রহ. তার তাফসির গ্রন্থে সুরা হুজুরাত-এর ৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে বড় মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। আমরা তা এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি।

ইমাম কুরতুবি রহ. লিখেছেন—

ইবনুল আরাবি রহ. বলেন, এই আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহের ক্ষেত্রে এক কুরআনি মূলনীতি এবং শরিয়তের কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যাগত ভুলের শিকার দলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে মূল নির্ভরনীতি। (সাহাবা অন্তর্বিরোধের ক্ষেত্রে) সাহাবায়ে কেরাম এ আয়াতের ওপরই নির্ভর করেছেন, মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিবর্গ এ আয়াতেরই আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীদ্বয়েও যেন উক্ত আয়াতের মর্মবাণী ফুটে উঠেছে।

নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ»

আম্মারকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে।[১৫৪]

খারিজিদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

«يَخْرُجُوْنَ عَلٰى خَيْرِ فِرْقَةٍ»

তারা উম্মাহর শ্রেষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধাচরণ করবে।[১৫৫]

অথবা নবীজি বলেছেন—

«يَخْرُجُوْنَ عَلٰى حِيْنِ فُرْقَةٍ»

---

১৫৪. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-২৯১৬।

১৫৫. *সুনানে নাসায়ি*, হাদিস নং-৮৫০৭।

তারা লোকদের মধ্যে বিরোধকালে আত্মপ্রকাশ করবে।[১৫৬]

প্রথম বর্ণনাটি তুলনামূলক অধিক বিশুদ্ধ। কারণ, অন্য এক হাদিসে নবীজি ইরশাদ করেছেন—

«يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ»

তাদেরকে হত্যা করবে দু-দলের মধ্যে হকের অধিক নিকটবর্তী দলটি।[১৫৭]

খারিজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন হজরত আলি রাযি. ও তার সঙ্গীরা। আর তাই শরয়ি দলিলের আলোকে উম্মাহর উলামায়ে কেরামের নিকট এ বিষয়টি স্বীকৃত ও সুপ্রমাণিত যে, হজরত আলি রাযি.-ই ছিলেন (সাহাবা অন্তর্বিরোধের সময়) মুসলিম উম্মাহর ইমাম আর যারা তার বিরুদ্ধাচরণ করেছে, তারা সকলে ছিল ইসলামি খিলাফতের বিরুদ্ধাচরণকারী। আর শরিয়তের বিধান হলো, বিদ্রোহীদের সঙ্গে ততক্ষণ লড়াই চালিয়ে যেতে হবে, যতক্ষণ না তারা সত্যের পথে ফিরে আসে এবং মীমাংসা মেনে নেয়।

উসমান রাযি.-এর হত্যাকাণ্ডে সাহাবায়ে কেরাম সকলে পূর্ণ দায়মুক্ত ছিলেন। কারণ, স্বয়ং খলিফা উসমান রাযি. বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে নিষেধ করে বলেছিলেন, (হত্যার ক্ষেত্রে) আমিই উম্মাহর মধ্যে নবীজির নির্দেশনা অমান্যকারী প্রথম ব্যক্তি হতে চাই না। এ কারণেই এই মজলুম সাহাবি দুর্যোগে সবর করেছেন, কষ্টকে বরণ করে নিয়েছেন এবং উম্মাহর কল্যাণে আত্মত্যাগের এক বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নিজের জান কুরবানি করেছেন। কিন্তু এরপর জাতিকে নেতৃত্বহীন রাখাও তো সম্ভব নয়। তাই ইতিপূর্বে উমর রাযি. খলিফা নির্বাচনের জন্য যাদের নাম ঘোষণা করেছিলেন, তাদের অবশিষ্টদেরকে দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। নিঃস্বার্থ এই জামাতের প্রত্যেকে নিজে পদ গ্রহণ না করে অন্যকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। হজরত আলি রাযি.

---

১৫৬. *সহিহ বুখারি*, হাদিস নং-৩৬১০।

১৫৭. *সহিহ মুসলিম*, হাদিস নং-১০৬৪।

ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক উপযুক্ত। ফিতনা ও বিশৃঙ্খলার কারণে উম্মাহর মাঝে রক্তপাত ও ভয়াবহ দুর্যোগ সংঘটিত হবে এবং জাতি এক অনিঃশেষ বিভক্তির শিকার হবে—এই আশঙ্কায় সতর্কতার দাবিতে তিনি খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কারণ, খিলাফতশূন্যতার পরিণতি তো আরও ভয়াবহ। খিলাফত না থাকলে দ্বীনের মধ্যেই পরিবর্তন ও ইসলামের ভিত্তিমূলেই ভাঙনসৃষ্টির ভয় থাকে।

কিন্তু যখন তার নামে বায়আত গ্রহণ শুরু হলো, তখন শামবাসী বায়আত গ্রহণের জন্য উসমান-হত্যাকারীদের পাকড়াও করা এবং তাদের বিরুদ্ধে কিসাস-শাস্তি কার্যকর করার শর্তারোপ করল। আলি রাযি. তাদেরকে বললেন, 'তোমরা প্রথমে বায়আত গ্রহণ করো, তারপর হক দাবি করো; তাহলেই তা লাভ করবে।' উত্তরে তারা বলল, 'উসমানের হত্যাকারীরা আপনার সঙ্গেই আছে, সকাল-সন্ধ্যা আপনি তাদেরকে দেখেন, এ অবস্থায় তো আপনি বায়আতের উপযুক্ত নন।' এ ক্ষেত্রে আলি রাযি. তুলনামূলক সঠিক কথা বলেছেন এবং সঠিকতর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কারণ, হজরত আলি রাযি. যদি (সেই চরম সঙ্গিন মুহূর্তে) অপরাধীদের দণ্ড কার্যকর করতেন, তাহলে বিভিন্ন গোত্র তার বিরুদ্ধাচরণ করত এবং নতুন আরেকটি যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। তাই তিনি পরিস্থিতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসার এবং বায়আত সম্পন্ন হওয়ার অপেক্ষা করছিলেন। তার ইচ্ছা ছিল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলে নিহত খলিফার নিকটাত্মীয়দের পক্ষ থেকে বিচার মজলিসে অভিযোগ উত্থাপিত হবে এবং তখন তিনি ন্যায়ানুগ বিচার কার্যকর করবেন। আর এটি উম্মাহর একটি সর্বসম্মত নীতি যে, ফিতনা বা বিভক্তির আশঙ্কা থাকলে শাসকের জন্য কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে বিলম্ব করার বৈধতা আছে।

একই কথা প্রযোজ্য তালহা রাযি. ও যুবায়র রাযি.-এর ক্ষেত্রেও। কারণ, তারা হজরত আলি রাযি.-কে খলিফাপদ হতে অপসারণের দাবিও করেননি, তার ধার্মিকতা নিয়ে কোনো অভিযোগও করেননি। তাদের মত ছিল, প্রথমে উসমান-হত্যাকারীদের ওপর কিসাস কার্যকর করাই শ্রেয়তর।

(ইমাম কুরতুবি রহ. ইবনুল আরাবির উদ্ধৃতি শেষ করার পর বলেন,) আমার কথা হলো—এ তো গেল তাদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে আলোচনা। উলামায়ে কেরামের বড় এক অংশের মত হলো, বসরায় সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তা মূলত তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের দৃঢ় ইচ্ছা ব্যতিরেকে আকস্মিক ঘটে গেছে। কারণ, যুদ্ধের পূর্বেই তাদের মধ্যে সমঝোতা ও মীমাংসা হয়ে গিয়েছিল। এর ফলে উসমান-হত্যাকারীরা ভয় পেয়ে যায় যে, এবার হয়তো তাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি প্রদান করা হবে। তাই তারা একত্র হয়ে পরামর্শ করে। প্রথমে তাদের মাঝে বাদানুবাদ হলেও শেষ পর্যন্ত তারা একমত হয় যে, তারা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে দু-পক্ষের সঙ্গে মিশে যাবে এবং উভয় দলের সৈন্যদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নিজেরাই যুদ্ধের সূচনা করে পরস্পর তির ছুড়তে থাকবে। তখন আলি রাযি.-এর বাহিনীর সঙ্গে মিশে যাওয়া অংশ চিৎকার করে বলতে থাকবে, তালহা ও যুবায়র প্রতারণা করেছেন আর তালহা ও যুবায়রের বাহিনীর সঙ্গে মিশে যাওয়া অংশ চিৎকার করে বলতে থাকবে, আলি প্রতারণা করেছেন। তাদের এই কূটকৌশল সফল হয় এবং উভয় পক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক পক্ষই ছিল নিজেদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষের ধোঁকা-প্রতিরোধকারী এবং প্রতিপক্ষের হত্যাপ্রচেষ্টায় বাধাপ্রদানকারী; ভিন্নভাবে বললে, উভয় পক্ষই আত্মরক্ষার চেষ্টা করছিল। এ বিবেচনায় উভয় পক্ষের নীতিই ছিল সঠিক এবং আল্লাহর আনুগত্যই ছিল উভয় পক্ষের লক্ষ্য। উভয় পক্ষের যুদ্ধ-চেষ্টা ও প্রতিরোধ-প্রচেষ্টার সূচনা মূলত এভাবেই হয়েছিল। এটিই হলো উক্ত নাজুক ও সংবেদনশীল ঘটনার বিশুদ্ধ-সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

এরপর ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন—

সাহাবায়ে কেরামের মহান জামাতের কোনো সদস্য সম্পর্কে 'নিশ্চিত ভুল করেছেন' বলা বৈধ নয়। কারণ, তারা যা কিছু করেছেন, ইজতিহাদের আলোকে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করেছেন। তারা সকলে আমাদের মাননীয় ও অনুসরণীয়। আমাদের প্রতি শরিয়তের নির্দেশনা হলো, তাদের অন্তর্বিরোধ

বিষয়ে কলম ও কালামকে সংযত রাখা এবং কেবল তাদের সদ্‌গুণসমূহ নিয়ে আলোচনা করা। কারণ, তারা নবীসংস্পর্শের অত্যুচ্চ মর্যাদার অধিকারী। নবীজি তাদের নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন আর আল্লাহ তাআলা তাদের যাবতীয় ত্রুটি ক্ষমা করে দিয়ে তাদের প্রতি আপন সন্তুষ্টি ঘোষণা করেছেন। অধিকন্তু নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে যে, তালহা হলো ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী একজন শহিদ। সুতরাং তিনি যদি যুদ্ধে অবাধ্য অবস্থায় বের হতেন, তাহলে নিহত হওয়ার কারণে তিনি কিছুতেই শহিদ হতেন না। তদ্রূপ তিনি যদি ব্যাখ্যায় ভুল করে এবং আপন ওয়াজিব দায়িত্বে অবহেলা করে যুদ্ধে বের হতেন, তাহলেও তিনি শহিদ হতেন না। কারণ, শহিদ কেবল তাকেই গণ্য করা হয়, যে ন্যায়ের পথে নিহত হয়। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের এই অন্তর্বিরোধকে উল্লিখিত ব্যাখ্যায়ই প্রয়োগ করা উচিত।

আর এই যখন ঘটনার প্রকৃত বিশ্লেষণ, সুতরাং অন্তর্বিরোধের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাহাবায়ে কেরামকে অভিসম্পাত করা, নিজেদেরকে সাহাবায়ে কেরাম হতে দায়মুক্ত ঘোষণা করা, তাদের ফাসেক ও অপরাধী গণ্য করা, তাদের কীর্তি ও অবদান এবং দ্বীনের জন্য তাদের ত্যাগ ও কুরবানিকে অস্বীকার করা কিছুতেই বৈধ হতে পারে না।

জনৈক প্রাজ্ঞ মনীষীকে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্বিরোধকালে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি শুধু এ আয়াত পড়ে শোনান—

﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

তারা ছিল একটি সম্প্রদায়, যা গত হয়েছে। তারা যা কিছু অর্জন করেছে, তা তাদেরই আর তোমরা যা কিছু অর্জন করেছ, তা তোমাদেরই। তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না যে, তারা কী কাজ করত। [সুরা বাকারা : ১৩৪]

একই প্রশ্নের জবাবে অন্য এক আলিম অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন,

'আল্লাহ তাআলা আমার হাতকে সেই রক্ত হতে পবিত্র রেখেছেন। সুতরাং আমি তা দ্বারা আমার জবানকে রঞ্জিত করতে চাই না।'

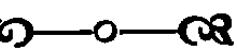
বক্তার উদ্দেশ্য হলো—এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হয়তো ভুল ব্যাখ্যা হতে পারে; কারও প্রতি তিনি যা করেননি, তা আরোপ করা হতে পারে।

বিশিষ্ট তাবেয়ি হাসান বসরি রহ.-কে সাহাবায়ে কেরামের পারস্পরিক বিরোধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন—

'সেটি এমন একটি লড়াই, যাতে সাহাবায়ে কেরাম অংশ নিয়েছেন আর আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবগতি ছিল, অথচ আমাদের তা নেই। সুতরাং তারা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, আমরা তার অনুসরণ করব, আর যে বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন, সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করব।'

ইমাম মুহাসিবি রহ. বলেন,

'হাসান যা বলেছেন, আমরাও তাই বলি। কেননা, এ সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তারা যে বিষয়ে বিরোধ করেছেন, তা সম্পর্কে আমাদের চেয়ে তারাই অধিক জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং তাদের সর্বসম্মত বিষয়ে অনুসরণ এবং দ্বিধাবিভক্ত বিষয়ে নীরবতা অবলম্বনই হলো আমাদের অবশ্য কর্তব্য। নিজেদের পক্ষ থেকে আমরা কোনো ব্যাখ্যা সৃষ্টি করব না। আমাদের নিষ্কম্প বিশ্বাস এই যে, তারা যা করেছেন, ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় করেছেন। কারণ, দ্বীনের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে। আল্লাহর কাছেই তাওফিক প্রার্থনা করছি।'[১৫৮]



১৫৮. শামসুদ্দিন কুরতুবি, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন [তাফসিরে কুরতুবি]*, সুরা হুজুরাত, আয়াত নং ০৯।

সাহাবা অন্তর্বিরোধ বিষয়ে ইতিহাস অধ্যয়নের মূলনীতি[১৫৯]

ইতিহাস মানে বিগত যুগের মানবসমাজের সুন্দর-অসুন্দর উভয় দিক তুলে ধরা এবং 'অনুপাত' বিচারে কাউকে নন্দিত, কাউকে নিন্দিত এবং কাউকে সাধু, কাউকে অসাধুরূপে চিহ্নিত করা। 'অনুপাত' বিচারের প্রয়োজন এজন্য যে, পৃথিবীতে নবী-রাসুলগণের পরে এমন বিশুদ্ধতম মানুষের অস্তিত্ব নেই, যার জীবন ও চরিত্রে সামান্যতম খুঁত নেই, অসুন্দরের ক্ষীণতম ছায়াপাত নেই। তদ্রূপ এমন নিকৃষ্টতম মানুষও নেই, যার জীবন ও চরিত্রে পুণ্যের কোনো স্পর্শ নেই, সুন্দরের কোনো ছাপ নেই। সুতরাং 'অনুপাত' বিচারই হবে ভালো মানুষ ও মন্দ মানুষ নির্ণয়ের মাপকাঠি। অর্থাৎ গোটা জীবন যার কেটেছে সুন্দর কর্ম ও উত্তম চিন্তার মাঝে, কল্যাণ ও পুণ্যের সুস্নিগ্ধ পরশে, যার সকল 'আচরণ ও উচ্চারণে' ঘটেছে ইখলাস ও আল্লাহপ্রেমের সাবলীল প্রকাশ, জীবনের দু-একটি পদস্খলন বা দুর্ঘটনা সত্ত্বেও অবশ্যই তিনি শামিল হবেন উম্মতের নেক ও সৎ লোকদের কাতারে। তদ্রূপ যার জীবনের সকাল-সন্ধ্যা কেটেছে পাপের অন্ধকারে, শরিয়তের আহকাম ও বিধান লঙ্ঘন করে করে, একটি বা দশটি পুণ্যকর্মের সুবাদে কিছুতেই সে পেতে পারে না ওলি-বুজুর্গের স্বীকৃতি।

তবে মনে রাখতে হবে যে, পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে ঘটনাবলির নিরপেক্ষ বিবরণ দিয়ে যাওয়াই হলো ইতিহাসের ইতিকর্তব্য। সেই ঘটনাবলির বিচারবিশ্লেষণ এবং লব্ধ ফলাফলের আলোকে ব্যক্তি ও শ্রেণির ধর্মীয় বা জাগতিক মর্যাদার স্তর নির্ধারণ কিন্তু ইতিহাসের দায়িত্ব নয়। এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিষয়; যাকে ইতিহাসতত্ত্ব বলা যেতে পারে, ইতিহাস নয়।

পৃথিবীর সাধারণ মানুষ বা সাধারণ শ্রেণির বেলায় অবশ্য ইতিহাসতত্ত্ব ইতিহাসের সাধারণ ঘটনাবিবরণীকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। সে ক্ষেত্রে ইতিহাস জানেন-বোঝেন এমন যেকোনো ব্যক্তি নিজস্ব চিন্তা ও দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ও মুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু উম্মতের সকল

---

১৫৯. 'সাহাবা অন্তর্বিরোধ বিষয়ে ইতিহাস অধ্যয়নের মূলনীতি' শিরোনামের লেখাটি (হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ শফি রহ. রচিত) '*মাকামে সাহাবা*' গ্রন্থের মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা.-কৃত বাংলা অনুবাদ থেকে চয়ন করে অনুবাদক কর্তৃক সংযোজন করা হয়েছে। ইতিহাসঅনুরাগী প্রত্যেক পাঠকের '*মাকামে সাহাবা*' গ্রন্থটি অধ্যয়ন করা উচিত।

যুগের সকল মানুষের অখণ্ড শ্রদ্ধার পাত্র সাহাবায়ে কেরামের বিষয়টি পৃথিবীর অন্য দশজন সাধারণ মানুষের মতো নয়।

সাধারণ জীবনচরিত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইতিহাসের বিচার গ্রহণযোগ্য হলেও সাহাবায়ে কেরামের স্থান ও মর্যাদার পরিমাপ কিন্তু ইতিহাসের দাঁড়িপাল্লায় করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় নিছক ঐতিহাসিক ঘটনাবিবরণীর আলোকে সাহাবা-চরিত্রের রূপ ও স্বরূপ নির্ণয় করা। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম হলেন আল্লাহর রাসুল ও তার সাধারণ উম্মতের মাঝে আল্লাহপ্রদত্ত এক মজবুত যোগসূত্র। এই যোগসূত্র ছাড়া কুরআনের 'শব্দ-পঠন' লাভ করা যেমন উম্মতের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনই সম্ভব ছিল না কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্মজ্ঞান অর্জন। অদ্রূপ 'রিসালাত' তথা রাসুলের বাণী ও শিক্ষার সম্পদভান্ডারও এই যোগসূত্র ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে।

সাহাবায়ে কেরাম হলেন রাসুল-জীবনের সার্বক্ষণিক সহচর। স্বয়ং আল্লাহ তাদেরকে নির্বাচন করেছিলেন এই পবিত্র সাহচর্যের জন্য। তাদের কাছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, শিক্ষা ও আদর্শ ছিল স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও আপন প্রাণের চেয়েও প্রিয়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদভান্ডারও ছিল তার তুলনায় তুচ্ছ। তাই তারা জানমাল কোরবান করে রাসুলের পয়গাম ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর প্রান্ত থেকে প্রান্তে। ফলে তাদের জীবনচরিত হয়ে উঠেছে নববি সিরাত ও জীবনচরিতেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। সুতরাং তাদের স্থান ও মর্যাদার নির্ভুল পরিচয় পেতে হলে কুরআন, সুন্নাহ ও সিরাতুন নবীর দর্পণেই তাদেরকে অবলোকন করতে হবে। ইতিহাসগ্রন্থের ছেঁড়া পাতায় পাওয়া যাবে না তাদের জীবন ও চরিত্রের আসল ছবি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ নামে পরিচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মতের সাধারণ পরিচয়-বৈশিষ্ট্যই হলো সাহাবাপ্রেম ও সাহাবা-মর্যাদার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি। তাদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামের আদব-ইহতেরাম রক্ষা করা যেমন অপরিহার্য, তেমনই তাদের সুমহান ব্যক্তিত্বের সামান্যতম সমালোচনাও অমার্জনীয়। এ বিষয়ে তাদের কলম ও কালাম আশ্চর্যরকম সংযত। অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ে সাহাবিদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে বলাই বাহুল্য যে, যুগপৎ দুটি পরস্পরবিরোধী মত অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সবার প্রতি সমান শ্রদ্ধা রেখে শরিয়তি ইজতিহাদের আলোকে একটি মত গ্রহণ আর কোনো

না কোনো অজুহাতে সাহাবা-চরিত্রে কলঙ্কলেপন ও ছিদ্রান্বেষণ এক কথা নয়। প্রথমটি প্রশংসনীয় আর দ্বিতীয়টি অমার্জনীয়।

যেহেতু মহান সাহাবায়ে কেরাম রাসুল ও তার উম্মতের মাঝে অপরিহার্য যোগসূত্র হিসেবে কুরআন-সুন্নাহর দৃষ্টিতে এক অত্যুচ্চ স্থান, অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী, সেহেতু তাদের সুমহান ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন নিছক ইতিহাস বা ঐতিহাসিক বর্ণনার মাপকাঠিতে হতে পারে না। এমন বিচারকের মর্যাদা ইতিহাসের প্রাপ্য নয়। তবে এর অর্থ কিন্তু ইতিহাসশাস্ত্রের আস্থাযোগ্যতা অস্বীকার করা নয়। ইসলাম বরং বলিষ্ঠ কণ্ঠেই ইতিহাসের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে।

ইতিহাসশাস্ত্রের ইসলামি গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, অতীতের বিভিন্ন জাতির ঘটনাবলি কুরআনের প্রধান পাঁচটি আলোচ্য বিষয়ের অন্যতম। তবে আল-কুরআনের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপনশৈলী অত্যন্ত অভিনব ও স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। যেমন কুরআনে অনেক ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণের পরিবর্তে খণ্ড খণ্ড অংশ বিভিন্ন কুরআনি বক্তব্যের অনুবর্তীরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। বস্তুত এই অভিনব উপস্থাপনশৈলীর মাধ্যমে কুরআন আমাদেরকে ইতিহাসের আসল গুরুত্ব ও সার্থকতা কী—তা বুঝিয়ে দিয়েছে। আল-কুরআন বলতে চায়—ইসলাম ও মানবজাতির কাছে নিছক কাহিনি হিসাবে বিগত জাতির ঘটনাবলির কোনোই আবেদন ও গুরুত্ব নেই; বরং চিন্তার মাধ্যমে পরিণাম ও পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও উপদেশ লাভই হলো ইতিহাসের আসল উদ্দেশ্য ও মূল সার্থকতা। বিগত জাতির সৎকর্মের শুভ পরিণাম দেখে মানুষ অনুপ্রাণিত হবে এবং মন্দের মন্দ পরিণাম দেখে সতর্ক হবে; সেই সঙ্গে যুগের আবর্তন-বিবর্তন এবং উত্থান-পতন দেখে মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহর অসীম কুদরতে বিশ্বাসী হবে। তাহলেই সার্থক হবে ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

ইতিহাস শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যেমন একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা, ঠিক তেমনই আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার স্তর তারতম্যও একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা।

ইসলামি শরিয়তে কুরআনুল কারিম ও হাদিসে মুতাওয়াতির আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার যে শীর্ষ স্তরের অধিকারী, কোনোক্রমেই তা সাধারণ হাদিসের প্রাপ্য নয়। তদ্রূপ হাদিসে রাসুলের যে স্তর, তা সাহাবায়ে

কেরামের বাণী ও বক্তব্যের প্রাপ্য নয়। একইভাবে ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলোও কুরআন, হাদিস ও বিশুদ্ধ সনদে সুপ্রমাণিত সাহাবা-বাণীর সমতুল্য ও নির্ভরযোগ্যতা দাবি করতে পারে না কোনো যুক্তিতেই। বরং কুরআনি আয়াতের দৃশ্যত বিপরীত বক্তব্যের সাধারণ হাদিসকে যেমন গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সম্ভব না হলে কুরআনের মোকাবিলায় প্রত্যাহার করা আবশ্যক, তদ্রূপ কুরআন-সুন্নাহর সুপ্রমাণিত বক্তব্যের সঙ্গে ঐতিহাসিক বর্ণনার বিরোধ দেখা দিলে সরাসরি তা বর্জন করা কিংবা সমন্বয়মূলক ব্যাখ্যাসহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। কোনো বর্ণনার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রামাণ্যতা যত অকাট্যই হোক, কুরআন-সুন্নাহর মোকাবিলায় তার বিন্দুমাত্র ধর্মীয় মূল্য নেই। আস্থা ও নির্ভরযোগ্যতার এই যে স্তরবিন্যাস ও শ্রেণিক্রম, কোনো শাস্ত্রের জন্য তা কিন্তু মোটেও মর্যাদাহানিকর নয়। কেননা, এটাই যুক্তি, স্বভাব ও ফিতরতের দাবি।

এ প্রসঙ্গে হাদিস ও ইতিহাসশাস্ত্রের ব্যাপক গুণগত পার্থক্যও আলোচনার দাবি রাখে।

হাদিসে রাসুলকে প্রাণপ্রিয় সম্পদরূপে সংরক্ষণ ও প্রচারে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহাবায়ে কেরামের অভাবনীয় নবীপ্রেমই ছিল যথেষ্ট। এর সঙ্গে আবার যুক্ত হয়েছিল এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নববি নির্দেশ। আর তাই লক্ষ সাহাবির ফিরেশতাতুল্য জামাআত 'একজনমাত্র মানবের' বাণী ও কর্ম সংরক্ষণ ও প্রচারকল্পে নজিরবিহীন ত্যাগ, সাধনা ও কোরবানি পেশ করেছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অন্য কোনো মানবসন্তানের জন্য—তিনি যত বিশাল প্রতিভা ও আদর্শ ব্যক্তিত্বের অধিকারীই হোন না কেন—এমন ব্যবস্থা কল্পনা করাই সম্ভব নয় যে, নিবেদিতপ্রাণ অনুসারীরা তার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ সুগভীর প্রেম ও ভক্তির সাথে গ্রহণ, সংরক্ষণ ও আগামী প্রজন্মের হাতে অর্পণের মহাসাধনায় জানমাল কোরবানি করে দেবে। জাতিবর্গের উত্থান-পতন, মহামানবদের জীবনচরিত এবং কালের দুর্যোগ মহা-দুর্যোগের ঘটনাবলিতে মানুষের চিত্তাকর্ষণের খোরাক আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার এত 'গরজ' হবে যে, তার সংরক্ষণ ও প্রচারকর্মে জীবন-যৌবন উৎসর্গ করে সকল স্বপ্ন-সাধ বিসর্জন দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে?! প্রেম ও পুণ্যের অনন্ত আকর্ষণ ছাড়া এমনটি অসম্ভব, অকল্পনীয়।

মোটকথা, যেহেতু আল্লাহর এটাই মঞ্জুর ছিল যে, আহকাম ও আকায়িদের ক্ষেত্রে হাদিসে রাসুল হবে শরিয়তের দলিল ও প্রমাণ এবং হাদিসে রাসুলই হবে কুরআনের বাস্তব রূপ, সেহেতু তা সংরক্ষণের প্রথম উপায় হিসাবে সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে তিনি ঢেলে দিয়েছিলেন নবীপ্রেম ও নবী-আনুগত্যের অকল্পনীয় আবেগ ও জযবা; যা পৃথিবীর অপর কোনো ব্যক্তিত্বের প্রতি হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ইতিহাস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা কোনোক্রমেই হাদিস বর্ণনার সমতুল্য মর্যাদা ও অবস্থান দাবি করতে পারে না।

দ্বিতীয়ত সূক্ষ্মতম বিচারবিশ্লেষণের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হাদিস বর্ণনার সময়ও হাদিস সংকলকগণ ভয়ে কম্পমান হতেন। পরবর্তী যুগে অধ্যায় ও শিরোনামভিত্তিক হাদিস সংকলনকালে মুহাদ্দিসগণ লিপি ও স্মৃতিতে সংরক্ষিত লক্ষ লক্ষ হাদিস থেকে মাত্র কয়েক হাজার হাদিস নিজ নিজ সংকলনে স্থান দিয়েছিলেন। এমনই সুকঠিন ছিল তাদের বিচারবিশ্লেষণের মানদণ্ড। ইমাম বুখারি রহ. তার স্মৃতিস্থ দুই লক্ষ অশুদ্ধ ও এক লক্ষ বিশুদ্ধ হাদিস থেকে পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে মাত্র চার হাজার হাদিস সহিহ বুখারিতে স্থান দিয়েছেন। ইমাম মুসলিম রহ. তার সংগৃহীত তিন লক্ষ হাদিস থেকে বাছাইপূর্বক চার হাজার হাদিস দিয়ে তার সহিহ সংকলন তৈরি করেছেন। ইমাম আবু দাউদ রহ. পাঁচ লক্ষ হাদিস সংগ্রহ করে যাচাইবাছাইয়ের পর মাত্র চার হাজার হাদিসের সুনান সংকলন তৈরি করেছেন। ইমাম আহমাদ রহ. তার সুবিখ্যাত মুসনাদ সংকলন তৈরি করেছেন সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার হাদিস থেকে বাছাই করে।

এভাবে কুদরতি ব্যবস্থা এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ নববি ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় অনন্যসাধারণ সতর্কতায় প্রস্তুত হাদিস সংকলন আল-কুরআনের পর শরিয়তের দ্বিতীয় হুজ্জত ও প্রমাণ-উৎসের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে।

পক্ষান্তরে পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসের ক্ষেত্রে মর্যাদার এ অত্যুচ্চ আসন কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কেননা, প্রথমত সাধারণ ঘটনাবলি সংরক্ষণ ও প্রচারের সাধনায় উদ্বুদ্ধ করার মতো কোনো 'মহাউদ্দীপক' শক্তি বিদ্যমান নেই। দ্বিতীয়ত হাদিস সংকলনের সুকঠিন মানদণ্ড ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রেও যদি গ্রহণ করা হতো, তাহলে হাদিস সংকলনের তিন লাখে চার হাজারের অনুপাত ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে নির্ঘাত তিন লাখে চারশ-তে নেমে আসত। এভাবে ইতিহাসের শতকরা নিরানব্বই ভাগ বর্ণনাই

ধুয়ে-মুছে বিলীন হয়ে যেত এবং ইতিহাসের পূর্ব বর্ণিত কল্যাণ ও উপকারিতা থেকে মানবজাতি বঞ্চিত হতো।

এ কারণেই আমরা দেখি, হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সকল বর্ণনাকারী দুর্বল ও মিথ্যাবাদী বলে হাদিসশাস্ত্রের ইমামদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন, ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারাই আবার তাদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছেন। হাদিসের ইমামগণ ওয়াকিদি, সাইফ বিন আমর প্রমুখের নাম শুনতে পর্যন্ত রাজি নন। অথচ গাযওয়া ও সিরাত বিষয়ক ইতিহাস বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা নিঃসংকোচে তাদের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন।

সারকথা এই যে, ইতিহাস যেহেতু আহকাম ও আকায়িদ জাতীয় শরিয়তসংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্র নয়; সেহেতু নির্বিচারে রুগ্ন-দুর্বল ও সুস্থ-সবল সকল বর্ণনা গ্রহণ সেখানে দূষণীয় নয়। এ কথা সত্য যে, রিজালশাস্ত্রের বরেণ্য ইমামগণ ইতিহাস সংকলনের ক্ষেত্রে ইসলামপূর্ব যুগের ভিত্তিহীন গল্প-কাহিনির পরিবর্তে ইসলামি বর্ণনারীতির আলোকে 'সনদ ও সূত্র' অনুসরণ করে থাকেন। এর ফলে বিশুদ্ধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার বিচারে বিশ্ব ইতিহাসের মাঝে ইসলামি ইতিহাস এক বিশিষ্ট মর্যাদার অধিকারী। তবে এটাও বাস্তব সত্য যে, ইতিহাসের সনদের ক্ষেত্রে তারা হাদিসশাস্ত্রের ন্যায় কঠিন বিচারবিশ্লেষণ প্রয়োগ করেননি। কেননা, আগেই বলে এসেছি, এ ধরনের কঠিন বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করলে ইতিহাসের সিংহভাগই মুছে যেত দুনিয়ার বুক থেকে এবং ইতিহাস থেকে শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা আহরণের মূল্য উদ্দেশ্য থেকেই মানবসভ্যতা বঞ্চিত হতো। তা ছাড়া ইসলামি আহকাম ও আকায়িদের কোনো সম্পর্ক নেই বিধায় এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও ছিল না। ইতিহাস সংকলনে এসে হাদিস ও রিজালশাস্ত্রের বরেণ্য ইমামদের ব্যতিক্রমধর্মী উদারনীতি গ্রহণের এটাই হলো মূল রহস্য।

এখানে আল্লামা ইবনে কাছিরের উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। হাদিস ও তাফসিরশাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ এই ইমাম রিজাল সমালোচক হিসাবেও সমান খ্যাতির অধিকারী। সনদের বিচার-পর্যালোচনা ও বাছাই-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এত নামডাক সত্ত্বেও জগদ্বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ *'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'*-এর সংকলনের ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু তা ধরে রাখতে পারেননি। আল-বিদায়ার কোনো কোনো বর্ণনার ক্ষেত্রে তার নিজেরই মন্তব্য হলো—

'এ বর্ণনার বিশুদ্ধতায় আমি সন্দিহান; তবে আমার পূর্বসূরি ইবনে জারির ও অন্যান্যরা তা গ্রহণ করে আসছেন বলে আমিও গ্রহণ করলাম। তারা যদি এড়িয়ে যেতেন, তাহলে আমিও এড়িয়ে যেতাম।'

বলাই বাহুল্য যে, হাদিস সংকলনের ক্ষেত্রে কিন্তু 'অমুক পূর্ববর্তী বুজুর্গ গ্রহণ করেছেন বলে সন্দিহান অবস্থায়ও আমাকে গ্রহণ করতে হলো'—এ ধরনের উদার নীতি অনুসরণ করা তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হতো না। ইতিহাসের নিজস্ব প্রকৃতি ও স্বভাবধারার কারণেই ইবনে কাছির এমন উদার নীতি গ্রহণ করতে পেরেছিরেন।

এটা কিন্তু 'একজন ইবনে কাছির'-এর অজানিত ভুল নয়; বরং সকল শাস্ত্রীয় ইমামের সচেতন ও সজ্ঞান আচরণ। দোষ বা গুণ যা-ই বলুন, নির্বিচারে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনার অবাধ সংকলন ইতিহাসের অবকাঠামো রক্ষার জন্যই জরুরি ছিল। ইতিহাসের এটা বিকৃতি নয়; প্রকৃতি।

কেননা, তাদের ভালো করেই জানা ছিল যে, সাধারণ ইতিহাস শরিয়তের আহকাম ও আকায়িদ প্রমাণের জন্য নয়; বরং শিক্ষা, উপদেশ ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য। আর সেটা সনদের বিচারবিশ্লেষণ ও সমালোচনা-পর্যালোচনা ছাড়াই হতে পারে। তবে কেউ যদি আহকাম ও আকায়িদ সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে ইতিহাসের বর্ণনাকে প্রমাণস্বরূপ ব্যবহার করতে চান, তাহলে নিজ দায়িত্বেই তাকে সেখানেও হাদিসশাস্ত্রের অনুসৃত 'বিচারপদ্ধতি' প্রয়োগ করতে হবে।

উদাহরণস্বরূপ ইমাম শাফেয়িসহ ফিকহশাস্ত্রের বহু ইমাম চিকিৎসাশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এমনকি চিকিৎসা বিষয়ক মূল্যবান রচনাকর্মও তাদের কারও কারও রয়েছে। এখন কোনো ভদ্রলোক যদি দাবি করে বসে যে, 'অমুক ইমামের মতে শরাব ও শূকর-মাংস হালাল। কেননা, অমুক চিকিৎসাগ্রন্থে তিনি শরাব ও শূকর-মাংসের কিছু গুণ ও উপকারিতার কথা আলোচনা করেছেন; নিষিদ্ধতা সম্পর্কে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলেননি।' তাহলে ভদ্রলোকের এই অভিনব প্রমাণ-পদ্ধতি সম্পর্কে কী মন্তব্য করা চলে?!

এই দীর্ঘ ভূমিকার পর আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে, সাহাবিদের পারস্পরিক বিরোধ প্রসঙ্গকে যারা ইতিহাসের আলোকে বিচার করেছেন

এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকেই সিদ্ধান্ত আহরণ করেছেন, মূলত গোড়াতেই তারা গলদ করে বসে আছেন। তথ্যপ্রমাণগুলো হাদিস, তাফসির ও রিজালশাস্ত্রের সর্বজনমান্য ইমামদের ইতিহাস সংকলন থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে—এই আত্মতৃপ্তির কারণে তাদের ভেবে দেখার সুযোগ হয়নি যে, শরিয়তের আহকাম ও আকায়িদের আলোচনা নয়; বরং শুধু ইতিহাস সংকলনই ছিল ইমামদের উদ্দেশ্য। তাই ইতিহাস সংকলনের প্রচলিত রীতি অনুসারে তারা সনদের বিচার-বিশ্লেষণে না গিয়ে সবল-দুর্বল সকল বর্ণনার একত্র সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেগুলো দ্বারা আহকাম ও আকায়িদ বিষয়ক কোনো মাসআলা প্রমাণ করতে হলে সনদ বিশ্লেষণের রিজালশাস্ত্রীয় পদ্ধতি প্রয়োগ করে বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে।

সুতরাং এখন আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, সাহাবাবিরোধ কি সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু, না আহকাম ও আকায়িদের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

এ প্রসঙ্গে কথা হলো—ইসলামি উম্মাহর সর্বসম্মত ফয়সালা এই যে, সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়, মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ এবং সাহাবাবিরোধের দুঃখজনক ঘটনার প্রকৃতি নিরূপণ সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু নয়। *'আল-ইসাবা'*-এর ভূমিকায় হাফেজ ইবনে হাজার এবং *'আল-ইসতিআব'*-এর ভূমিকায় হাফেজ ইবনে আবদুল বার পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, সাহাবায়ে কেরামের পরিচয়প্রসঙ্গ ইলমুল হাদিসের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা। তদ্রূপ সাহাবায়ে কেরামের স্থান, অবস্থান ও মর্যাদাগত স্তর-তারতম্য এবং সাহাবাবিরোধ প্রসঙ্গকে উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মতভাবে আকিদার অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এ কারণেই ইসলামি আকিদার সকল প্রামাণ্য গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায়রূপে তা সংযোজিত হয়ে এসেছে।

বস্তুত সাহাবা ও সাহাবাবিরোধ প্রসঙ্গ এমন এক আকিদাভিত্তিক মাসআলা, যাকে কেন্দ্র করে বহু ফেরকার উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং বলাই বাহুল্য যে, এ প্রশ্নে মীমাংসা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমার অকাট্য প্রমাণ অপরিহার্য। হাদিস ও রিজালশাস্ত্রীয় মানদণ্ডে যাচাই না করে ইতিহাস-আশ্রয়ী কোনো বর্ণনা এ প্রশ্নে প্রমাণরূপে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আকায়িদজাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে ইতিহাসনির্ভরতা চরম আত্মঘাতী ভুল। ইতিহাস যত নির্ভরযোগ্য হাদিসশাস্ত্র-বিশারদই সংকলন করুন, তাতে তার ইতিহাসধর্মিতা মোটেই বিলুপ্ত হয় না।

এ কারণেই সাহাবা-পরিচয় বিষয়ে ইবনে আবদুল বার রচিত *'আল-ইসতিআব ফি মারিফাতিল আসহাব'* গ্রন্থটি প্রামাণিকতা ও তথ্যসমৃদ্ধির কারণে বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও সাহাবাবিরোধ প্রসঙ্গে ইতিহাসনির্ভরতার কারণেই তা বিদগ্ধ শাস্ত্রবিদগণ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে।

কুরআনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আয়াতে এবং বিভিন্ন হাদিসে সাহাবায়ে কেরামের প্রশংসা ও ফজিলত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতপ্রাপ্তির সুসংবাদের পাশাপাশি উম্মতকে তাদের অনুসৃত পথে চলার জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। সেই সাথে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে কোনো সাহাবির সমালোচনার কঠিন পরিণতি সম্পর্কেও। সর্বোপরি সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভালোবাসাকে আল্লাহর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা এবং তাদের প্রতি বিদ্বেষকে তার প্রতি বিদ্বেষের পরিচায়ক ঘোষণা করা হয়েছে। আর কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবায়ে কেরামের জন্য নির্ধারিত এই মর্যাদা সম্পর্কে সর্বযুগের উম্মতে মুহাম্মাদি ঐকমত্য পোষণ করে এসেছে। দু-একটি ভ্রষ্ট দল অবশ্য সর্বযুগেই ব্যতিক্রম ছিল।

এবার মূল প্রসঙ্গ। মজলুম খলিফা হজরত উসমান রাযি.-এর শাহাদাতের স্বাভাবিক পরিণতিতে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে সৃষ্ট মতবিরোধ পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রবল স্রোতপ্রবাহে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু উলামায়ে উম্মত আদবের খাতিরে সে যুদ্ধকে 'মুশাজারাত' নামে অভিহিত করেছেন। বাতাসের দোলায় গাছের শাখাপ্রশাখার পারস্পরিক সংঘর্ষকে আরবিতে মুশাজারাত বলে। আলিমগণ বোঝাতে চেয়েছেন যে, শাখাপ্রশাখার পরস্পর সংঘর্ষ যেমন সামগ্রিক বিচারে বৃক্ষের জন্য দূষণীয় নয়; বরং জীবন ও সজীবতার লক্ষণ, তদ্রূপ জটিল পরিস্থিতিতে বিপরীতমুখী ইজতিহাদের ফল হিসাবে সাহাবা অন্তর্বিরোধও সামগ্রিক বিচারে দোষের বা কলঙ্কের কিছু নয়; বরং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শবাদিতা ও জানবাজিরই জ্বলন্ত প্রমাণ।

এখানে এসব প্রশ্ন আসতে পারে যে, সকল সাহাবির আদালত ও ন্যায়পরতা, ইখলাস ও নিঃস্বার্থতা এবং তাকওয়া ও ধার্মিকতা প্রশ্নাতীত।

সুতরাং সকলেই তারা সমান শ্রদ্ধার পাত্র। এমতাবস্থায় কোনো বিষয়ে তাদের মতবিরোধের ক্ষেত্রে আমাদের নীতি ও অবস্থান কী হবে? দুটি বিপরীত মতামতকে যুগপৎ নির্ভুল মনে করা যেহেতু সম্ভব নয়, সেহেতু অবধারিতভাবেই গ্রহণ ও বর্জনের পথে আমাদের এগুতে হবে। কিন্তু এই গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি কী হবে? সর্বোপরি উভয় পক্ষের প্রতি সমান ভক্তি-শ্রদ্ধাই বা কীভাবে বজায় রাখা হবে?

এসব প্রশ্নের জবাবে আমাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তির বিচারে কোনো পক্ষের নীতি ও অবস্থানকে ভুলরূপে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা পোষণ মোটেই জরুরি নয়। এ বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরিগণ যে বাস্তব আদর্শ রেখে গেছেন, তা অনুসরণের মাধ্যমেই আমরা এই নাজুক সমস্যার কাঙ্ক্ষিত সমাধান পেতে পারি। আমাদের পূর্বসূরি মনীষীগণ শরিয়তসম্মত ইজতিহাদের মাধ্যমে একপক্ষের মতামতকে হয়তো অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমল ও আকিদা গ্রহণ করেছেন; কিন্তু তাই বলে অপরপক্ষের শানে সামান্যতম অশ্রদ্ধামূলক শব্দ কখনো উচ্চারিত হয়নি তাদের মুখে। বিশেষত মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে উলামায়ে উম্মত একদিকে যেমন হজরত আলি রাযি.-এর পদক্ষেপকে নির্ভুল ও প্রতিপক্ষের অবস্থানকে ভুল বলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, তেমনই অন্যদিকে আলি রাযি.-এর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী তালহা রাযি., যুবায়র রাযি. ও মুয়াবিয়া রাযি.-এর প্রতিও সমান আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে আলি রাযি.-এর পদক্ষেপ যেমন নির্ভুল ছিল, তেমনই তার প্রতিপক্ষের ভুল পদক্ষেপও অন্যায় স্বার্থপ্রসূত ছিল না; ছিল শরিয়তসম্মত ইজতিহাদপ্রসূত। আর উসুলশাস্ত্রের সাধারণ ছাত্রও এ কথা জানে যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুল ইজতিহাদ কোনো অপরাধ নয়। বরং সঠিক সিদ্ধান্ত লাভের শুভ উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মূলনীতি অনুসারে ইজতিহাদ প্রয়োগের পরও ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হলে শরিয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যই তিনি সাওয়াব ও পুরস্কারের হকদার হবেন।

সাহাবায়ে কেরামের রাজনৈতিক বিরোধকেও উলামায়ে উম্মত সর্বসম্মতিক্রমে ইজতিহাদপ্রসূত বিরোধ বলে স্বীকার করেছেন। সুতরাং কোনো পক্ষের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকেই খাটো করে দেখার উপায় নেই।

মোটকথা, মুশাজারাতে সাহাবার ক্ষেত্রে উলামায়ে উম্মত ভুল ও নির্ভুলের ফয়সালা যেমন করেছেন, তেমনই সকল সাহাবির শান ও মান পূর্ণমাত্রায়

বজায় রেখে পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, এ বিষয়ে জবান সংযত রাখাই অধিক নিরাপদ। যুদ্ধকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণনা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা মোটেই উচিত নয়।

মুশাজারাতে সাহাবার ঘটনার ক্ষেত্রে বস্তুত ঘটনা ও পরিস্থিতির মারাত্মক জটিলতা ও অস্পষ্টতাই ছিল সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্বিরোধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষের মূল কারণ। এর ফলে তাদের ইজতিহাদি সিদ্ধান্ত হয়ে পড়েছিল ত্রিমুখী। একদলের ইজতিহাদ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে, অমুক ইমাম বৈধ। সুতরাং তার প্রতিপক্ষ বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী আর শরিয়তের বিধান মোতাবেক বৈধ ইমামের আনুগত্য গ্রহণ এবং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হলো অপরিহার্য কর্তব্য। ইজতিহাদকারী দ্বিতীয় পক্ষ সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সংখ্যায় সাহাবায়ে কেরামের তৃতীয় পক্ষটিও কম বড় ছিল না। পরিস্থিতি এত জটিল ও গুরুতর ছিল যে, তাদের পক্ষে নির্দ্বিধ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই সম্ভবপর হয়নি। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত হক ও না-হক তাদের সামনে পরিষ্কার না হওয়ায় শরিয়তের নির্দেশ হিসেবেই পূর্ণ নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছিল তাদের। মোটকথা, গৃহীত পদক্ষেপের অনুকূলে ইজতিহাদের কৈফিয়ত ছিল বিধায় তারা প্রত্যেকেই আজর ও সাওয়াবের হকদার।

এ বাস্তবতাও এখানে অস্বীকার করা উচিত নয় যে, বিগত যুগের সাধারণ ঘটনাবলি এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনায় ইতিহাসের ওপর যতটা নির্ভর করা সম্ভব, সাহাবা-অন্তর্বিরোধ সংক্রান্ত আলোচনায় এসে ইতিহাসের ওপর সে পরিমাণ নির্ভরতাও বজায় রাখা সম্ভব নয়। কেননা, সাহাবা-অন্তর্বিরোধ যেভাবে যুদ্ধ ও রক্তপাত পর্যন্ত গড়িয়েছিল, তাতে মুনাফিক সাবায়ি চক্রের কুটিল চক্রান্তই ছিল মূলত দায়ী। এই সাবায়ি চক্রান্তের ফলে এমনকি সাহাবাযুগেই রাফিজি ও খারিজি ফিরকাদুটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। বস্তুত সাহাবাবিদ্বেষই ছিল ফিরকাদুটির উৎপত্তির বুনিয়াদ। নবীযুগে যেমন মুনাফিকরা সকল কাজে-কর্মে, আচরণ-উচ্চারণে ও সাজপোশাকে মুসলমানদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত, তেমনই সাহাবাযুগেও সাহাবাবিদ্বেষী চক্র সাধারণ মুসলমানের মাঝেই মিলেমিশে থাকত। বর্তমান যুগে প্রত্যেক ফিরকার যেমন স্বতন্ত্র পরিচয় রয়েছে এবং প্রতিটি কর্মে ও পর্বে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর সঙ্গে দৃশ্যমান পার্থক্য রয়েছে, যে যুগে অবস্থা তেমন ছিল না। মুসলিম উম্মাহর সকল

শ্রেণি ও স্তরে তারা এমনভাবে মিশে ছিল যে, তাদের চিহ্নিত করার কোনো উপায় ছিল না। ফলে দৃশ্যত ধার্মিকতা ও আস্থাযোগ্যতার কারণে খুব সহজেই তাদের বর্ণনা সত্য বলে গ্রহণ করে নেওয়া হতো। এভাবে মুনাফিক, রাফিজি ও খারিজিদের বিভিন্ন জাল বর্ণনা বহু নির্ভরযোগ্য মুসলমানের মুখেও আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে আলোচিত হতে শুরু করেছিল। যেহেতু ব্যাপার হাদিসে রাসুলের ছিল না, তাই কোনো বর্ণনা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন এবং সনদের চূড়ান্ত বিচারবিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করা হয়নি। ফলে রাফিজি-খারিজিদের বহু জাল বর্ণনা ইতিহাসগ্রন্থগুলোতে এমনভাবে মিশে গেছে যে, সেগুলোকে চিহ্নিত করার এখন আর কোনোই উপায় নেই।

ফিতনা ও গোলযোগের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ে গুজব ও অপপ্রচার সম্পর্কে যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে, তারা অবশ্যই জানেন যে, কোনো শহরে সৃষ্ট গোলযোগ সম্পর্কে খোদ শহরের নির্ভরযোগ্য লোকদের বর্ণনার ওপরও নির্ভর করার উপায় থাকে না। গুজব ও অপপ্রচারের ক্ষমতা তখন এমনই অপ্রতিহত হয়ে ওঠে, যা কল্পনা করাও কষ্টকর। ফলে এমনও হয় যে, কথিত নির্ভরযোগ্য লোকটি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন না; বরং কোনো লোককে নির্ভরযোগ্য মনে করে তার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে বর্ণনা পরম্পরায় একটি ভিত্তিহীন ঘটনাও মজবুত ভিত্তি পেয়ে যায়। এটা হলো যেকোনো ফিতনা ও গোলযোগের নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির স্বাভাবিক চিত্র। সুতরাং সাহাবা-অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়খণ্ডটি উপরিউক্ত স্বভাবধারার ব্যতিক্রম কীভাবে হতে পারে! বিশেষত সাবায়ি চক্রের রাফিজি ও খারিজি সদস্যরা যেখানে ছিল অতিমাত্রায় তৎপর।

সাহাবাযুগের ইসলামি ইতিহাস যে সকল নেতৃস্থানীয় ও নির্ভরযোগ্য আলিম-মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন, তারা ইতিহাস সংকলনের স্বীকৃত রীতি মোতাবেক কোনো ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত সকল বর্ণনাই আনুপূর্বিক লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুতরাং বুঝে দেখুন, নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংকলকের গ্রন্থে স্থান পেয়েছে বলেই ইতিহাসের এই বর্ণনাসম্ভার কতটা নির্ভরযোগ্যতা দাবি করতে পারে? পৃথিবীর আর দশটা ক্ষেত্রে কোনো সাধারণ ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সংকলিত ইতিহাসের বেলায় সাধারণত এ ধরনের বিকৃতির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু সাহাবা-

অন্তর্বিরোধের নৈরাজ্যপূর্ণ সময়ের ঘটনাবলির ক্ষেত্রে এ কথা মোটেই খাটে না।

বস্তুত বিখ্যাত তাবেয়ি হজরত হাসান বসরি রহ. এ সম্পর্কে যা বলেছেন, তা-ই হচ্ছে আলোচ্য প্রসঙ্গে শেষ কথা। তিনি বলেছেন,

«قتال شهده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا».

সেটি এমন একটি লড়াই, যাতে সাহাবায়ে কেরাম অংশ নিয়েছেন; আর আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের অবগতি ছিল, অথচ আমাদের তা নেই। সুতরাং তারা যে বিষয়ে একমত হয়েছেন, আমরা তার অনুসরণ করেছি, আর যে বিষয়ে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছেন, আমরা সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করেছি।[১৬০]

সাহাবায়ে কেরামের নিকট সান্নিধ্য লাভকারী নেতৃস্থানীয় তাবেয়ি হাসান বসরি রহ. যেখানে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্বিরোধকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করছেন যে, প্রকৃত অবস্থা আমাদের জানা নেই, সেখানে পরবর্তী ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস বর্ণনার ভিত্তিতে কীভাবে কোনো ব্যক্তির জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতে পারে!

ইমাম চতুষ্টয়ের অন্যতম ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল রহ. কত কঠিন উক্তি করেছেন,

«إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء فاتهمه على الإسلام»

কাউকে যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবিদের সমালোচনা করতে দেখো, তাহলে তার ঈমানকে সন্দেহের চোখে দেখবে।[১৬১]

।। প্রথম খণ্ড সমাপ্ত ।।

---

১৬০. শামসুদ্দিন কুরতুবি, *আল-জামে লি আহকামিল কুরআন [তাফসিরে কুরতুবি]*, সুরা হুজুরাত, আয়াত নং ০৯।

১৬১. ইমাম ইবনে তাইমিয়া, *আস-সারিমুল মাসলুল*, পৃষ্ঠা : ৫৬৮।

কেন পড়বেন 'ইসলামি ইতিহাস'

এক অমূল্য জ্ঞানসম্পদ বিশ্ব মানবতার ইতিহাস। মানব-ইতিহাসে আছে অনন্যসাধারণ অভিজ্ঞতার নির্যাস। একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির জন্য এমন ভুলে জড়িয়ে পড়া মোটেও সমীচীন নয়, যা পূর্ববর্তী কেউ করেছে। নিষ্কৃতির উপায় সামনে থাকা সত্ত্বেও জীবনে চলার পথে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হওয়া বিবেচিত হয় মহা অন্যায় হিসেবে।

আপন ইতিহাস ও মানবেতিহাসকে তুচ্ছজ্ঞান করার কারণে মুসলিম উম্মাহ যুগে যুগে বহুবার পথ হারিয়েছে। আরও অনুতাপের বিষয় হলো, জাতির কোমলমতি সন্তানরা যখন আপন জাতির ইতিহাস পাঠের মনস্থ করে, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ইতিহাস বিকৃতকারী লেখকদের রচিত ইতিহাস; যাতে তারা যুক্ত করেছে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জাল-বানোয়াট গল্প-কাহিনি, বিকৃত করেছে তথ্য-উপাত্ত, বদলে দিয়েছে প্রকৃত ঘটনা ও ঘটনাপ্রবাহ। ফলে ঘটনা ও ইতিহাসের শিক্ষা ও মর্ম বদলে গেছে, হারিয়ে গেছে মূল উপদেশ ও দীক্ষার মর্মবাণী; মুসলিম উম্মাহ হারিয়ে ফেলেছে তাদের অতি মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ।

আমাদের কর্তব্য—আমরা ইসলামি ইতিহাসের প্রতিটি দিক নিয়ে সমৃদ্ধ অধ্যয়নের এক প্রচারণা ও আন্দোলন শুরু করব। এর মাধ্যমে আমরা উল্লিখিত সীমালঙ্ঘনসমূহের সংশোধন ও প্রতিকারবিধান করতে পারব এবং প্রতিটি বিষয়ে সঠিকভাবে জানতে পারব। ইনশাআল্লাহ এ পথ ধরেই আমরা এই সুসমৃদ্ধ জ্ঞানসম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারব।

—ড. রাগিব সারজানি

ISBN
B0070
9 789848 012604

মাকতাবাতুল হাসান